প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

:: সূচীপত্র ::

প্রথম অধ্যায়

রামায়ণ পরিচয়

রামায়ণ ভারতের জাতীয় মহাকাব্য। একাধারে সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ বলতে যা বোঝায় রামায়ণে রয়েছে তারই পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। কিন্তু রামায়ণকে এর কোন একটি বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না। রামায়ণ ভারতবর্ষীয় গৃহ ও পরিবার জীবনের একটি আদর্শায়িত সহস্রদল কাব্য-কুসুম। যে অপরিসীম দুঃখ, যে মহৎ বেদনা মানুষকে মনুষ্যত্বের উন্নত স্তরে উন্নীত করে যুগ-যুগ ধরে রামায়ণ তারই বিজয়বার্তা ঘোষণা করে আসছে। বিশ্রুতপূর্ব সুদূর অতীতে তমসার পুণ্যতীরে ক্রৌঞ্চ-বধূর শোক-কাতর কবিকণ্ঠে নিঃসৃত হল শ্লোকবন্ধ পদ শোক-গাথা,

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ, শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতম্[১]।।"

রে নিষাদ, তুই এই ক্রৌঞ্চমিথুনের কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করেছিস সুতরাং কোন দিনই তুই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবিনা।

অনন্যপূর্ব এই শোকসঙ্গীত শুনে কবি নিজেও হলেন বিস্মিত। বিস্ময় বিমুগ্ধ কবিকণ্ঠে বাণীর বরমাল্য অর্পিত হল। তাঁর অমর লেখনীতে সৃষ্টি হল রামায়ণ মহাকাব্য। এই কাব্যের নায়ক দেবতা নন, দৈত্যদানবও নয়। কবি তাঁর কাব্যের নায়ক করলেন সুখে-দুঃখে কাতর মর্ত্য মানবকে। তিনি শ্রীরামচন্দ্র। তিনি মানবশ্রেষ্ঠ নরচন্দ্রমা। রামায়ণ এই নরচন্দ্রমারই কাহিনী। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর কাব্যে মানবজীবনের ও মানবের গৃহধর্মের বিজয়বার্তা ঘোষণা করলেন। রামায়ণে মানবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
আদিকাণ্ড, ১২।১৫, পৃঃ ৭।

করেন নাই। মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।...রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে।"[১]

রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য। ভারতীয় আর্য সমাজের মূল ভিত্তি এই গৃহাশ্রম। চারটি আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রমকেই আর্য ঋষিরা শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। ঋগ্বেদের ১।১৭৯ সূক্তে ৭।৮৭।৪ ঋকে ও ১।১০১।৩ ঋকে গৃহাশ্রমের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক যুগে গৃহাশ্রমের ঋষিদের কাছে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ঋষিকুমারেরা শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হতেন। ঋগ্বেদের ১।১৭৯ সূক্তটিতে ঋষি অগস্ত্যের গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ব্রহ্মর্ষি হয়েও গৃহী ছিলেন। ঋকটিতে গুরু অগস্ত্য ও গুরু পত্নী লোপামুদ্রার কথোপকথনের মধ্যে শিষ্য যোগ দিয়েছিলেন এবং সোমদেবতার নিকট গুরু ও গুরু পত্নীর জন্য ধনসম্পদ, পুত্র, ও সুখ সম্ভোগ প্রার্থনা করেছিলেন।

মনুসংহিতায়ও দেখা যায় ভগবান মনু ভারতীয় গার্হস্থ্য আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে বলেছেন—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্যাং বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ।।
যস্মাত্রয়োহপ্যাশ্রমিনো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমোগৃহী[২]।।

যেমন বায়ুকে আশ্রয় করে সমস্ত জীব জীবিত থাকে তেমন গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করে সকল আশ্রমবাসীরা জীবিত থাকেন। যেমন ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থব্রতী, ও ভিক্ষু এই আশ্রম ত্রয়ীরাই প্রত্যহ জ্ঞান ও অন্নদ্বারা গৃহী কর্তৃক উপকৃত হন। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমই বরিষ্ঠ।

ব্রহ্মচর্য বানপ্রস্থ ও যতি এই তিনটি আশ্রমের উপর গার্হস্থ্য আশ্রমের স্থান নির্দেশ করা হল।

মহাভারতের বনপর্বে ব্রাহ্মণ কৌশিক ও ধর্মব্যাধের উপাখ্যানের মধ্যে সর্ব ধর্মের উপর নিষ্কাম গৃহ ধর্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে।[৩] ব্রাহ্মণ সেবা

১। প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৫।
২। মনু সংহিতা, প্রসন্ন কুমার শর্মা সম্পাদিত, ৩।৭৭-৭৮, পৃঃ ১৩।
৩। মহাভারতম্, হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রণীত, বনপর্বাণি।

অপেক্ষাও গৃহীর কাছে গৃহধর্মই বড়। যিনি অপ্রমত্তভাবে গৃহধর্ম পালন করেন ও স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দেন, তিনি অক্লেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। ভারতীয় নিষ্কাম গৃহধর্মের আরও উন্নত পরিচ্ছন্নরূপ রামায়ণ মহাকাব্য। ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার জীবনের যা উন্নত উচ্চ আদর্শ রামায়ণ তারই পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি। যুগ-যুগ ধরে রামায়ণের অমৃত প্রবাহ ভারতীয় পারিবারিক জীবনকে পবিত্র পুণ্যময় করে তুলেছে। সত্যনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য, পত্নীপ্রেম, সৌভ্রাত্র, প্রভুভক্তি, আশ্রিতরক্ষা, প্রজানুকূল্য প্রভৃতি যে সমস্ত গুণে মানুষ দেবতার পদে উন্নীত হতে পারে মহর্ষি বাল্মীকি নিখিল মানবচিত্ত মন্থনকারী উপাখ্যানের মাধ্যমে ভারতীয় জনচিত্তে তা তুলে ধরেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা ও পত্নীপ্রেম, রামচন্দ্রের অযোধ্যা বাস বা দণ্ডকারণ্যে বাস, ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, লক্ষ্মণের রামের প্রতি আনুগত্য, বিমাতা কৈকেয়ীর সপত্নী পুত্রের পতি আচরণ, সন্তান স্নেহকাতরা জননী কৌশল্যার মাতৃহৃদয়ের বেদনা, মহীয়সী জননী সুমিত্রার কর্তব্যবোধে পুত্রের প্রতি উপদেশ দান, দশরথের রামের প্রতি অন্ধ স্নেহ, ভরতের অনুপস্থিতিতে দশরথ কর্তৃক রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার চেষ্টা, পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের বনগমন, সীতার বনবাস, পাতাল প্রবেশ, সীতার জন্য রামচন্দ্রের ব্যাকুলতা প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে মহর্ষি বাল্মীকি মানব সম্পর্কের উপর এক বিচিত্র বর্ণসম্পাত করেছেন। এককথায় দেবত্বে নহে—মানবিক অনুভূতির সত্যতম প্রকাশেই রাম চরিত্রের সার্থকতা। সীতা হরণ, রামের সঙ্গে সুগ্রীবের সখ্যতা, রাম-রাবণের মহাসমর, রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার এগুলি রামায়ণের বড় কথা নহে এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ মহাকাব্যে গার্হস্থ্য জীবনের এক সুমহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। রামায়ণ যেন ভারতীয় গার্হস্থ্য জীবনের একটি প্রস্ফুটিত শতদল। রামায়ণের আলোচনা প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না—গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থ মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রমধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে।

কৈকেয়ী মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এই গৃহধর্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে শান্ত রসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহান বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে"।[১]

রামায়ণকে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য যাই বলা হোকনা কেন রামায়ণ ভারত আত্মার বিমুগ্ধ বাণী। রামায়ণে ভারতবর্ষ স্বপ্রকাশিত, ভারতবর্ষকে জানতে হলে রামায়ণ পাঠ অত্যাবশ্যক। আবার রামায়ণকে জানতে হলে ভারতবর্ষকেও জানতে হবে। রামায়ণের দ্বারা কবি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রকাশ করেছেন। ভারতবাসীর কাছে রামায়ণ চির নূতন। কোনদিন পুরাতন হয়নি—হবেও না। মহাকবির ভাষায় রামায়ণ সম্বন্ধে বলা যায়,

"কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ॥
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্রামস্যচ কথা ত্বৎ কৃতা প্রচরিষ্যতি ॥
তাবদূর্দ্ধমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।[২]

যতদিন পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসকল বর্তমান থাকবে ততদিন তোমার প্রণীত রামকথা সমগ্র জগতে প্রচলিত থাকবে। ততকাল তুমি আমার জগতের ঊর্ধ্ব ও অধঃলোকে বাস করবে।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুই জাতীয় মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্যের মাধ্যমে ভারতবাসী যুগ-যুগ ধরে নিজেকে প্রকাশ করে আসছে। ভারতবাসীর যা চিন্তা, যা ভাবনা, যা ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ রামায়ণ ও মহাভারত যেন তারই বাঙ্ময় মূর্তি। রামায়ণকে আখ্যান কাব্য, মহাকাব্য, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ যাই আখ্যা দেওয়া হোকনা কেন রামায়ণের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। রামায়ণ ভারতবর্ষের যুগধর্মের ইতিহাস। দুটি যুযুধমান জাতির মহাসগরের কথা বা কোন প্রবল পরাক্রান্ত রাজার বংশ

১। প্রাচীন সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫-৬।

২। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, আদিকাণ্ড, পৃঃ ৮।

পরিচয় ও তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী এই ইতিহাসের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করে না। রামায়ণ এমন একটা ইতিহাস যা একটি দেশ, একটি যুগ ও একটি জাতির পরিচয় বহন করে। কিন্তু সে পরিচয় একটি কালের সীমায় আবদ্ধ নহে। সে কালের ইতিহাস, সে যুগের জীবন যাত্রার আদর্শ ভারতবাসীকে আজও এক উচ্চতর, উন্নততর আদর্শের দিকে অহরহ অনুপ্রাণিত করে আসছে। রামায়ণের রামচরিত্র দেবচরিত্র নহে, নর চন্দ্রমা রাম মানব শ্রেষ্ঠ। রামায়ণের পুণ্যজীবন ধারা আজও ভারতবাসীকে প্রভাবিত করছে, তাই বিংশ শতাব্দীতেও মহাত্মা গান্ধী স্বাধীন ভারতে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করতেন ; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

"রাময়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু এই ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্য হর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান"[১]

স্বর্গতঃ কেদারনাথ মজুমদারও রামায়ণকে যুগধর্ম্মের ইতিহাস বলে অভিহিত করে বলেছেন—"রামায়ণ কাব্য হইলেও তাহা ইতিহাস। বিরাট হিন্দু জাতির সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রাচীনতম ইতিকথা। রামায়ণ ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ মহাকাব্য, রামায়ণ ইতিহাস। রামায়ণ হিন্দুর চক্ষে কল্পতরু সদৃশ।[২] কবিগুরু বাল্মীকি আদিকবি। রামায়ণ আদিকাব্য। কাব্য হয়েও রামায়ণে ভারতীয় আর্য ও অনার্য জাতির সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, তাদের জীবন যাত্রা, দক্ষিণ ভারতে আর্যদের বসতি বিস্তার, আর্য-অনার্য জাতির সংঘর্ষ এবং সর্বশেষে এই দু'টি জাতির সভ্যতার মিলনের ইতিহাস মহাকাব্যের কাহিনীর পটভূমিকায় বর্ণিত হয়েছে।

রামায়ণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একখানা অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। যুগে-যুগে ভারতীয় চিন্তা ও চরিত্রকে ইহা রূপদান করেছে। আবার ভারতীয় চিত্তও কালে-কালে একে নূতন করে গড়ে তুলেছে। তাই সুদূর অতীতকাল থেকে রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে একটা বিবর্তন ও পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। অথচ এই পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে একটা অখণ্ড যোগসূত্র

১। প্রাচীন সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

২। রামায়ণের সমাজ, শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, পৃঃ ৩-৪।

রয়েছে। পণ্ডিতপ্রবর প্রবোধচন্দ্র সেন রামায়ণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'সব বিবর্তনের ন্যায় এই বিবর্তনের মধ্যেও একটি ঐক্য অপরিবর্তিত রূপে নিত্য বিরাজমান আছে। এই সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্রই ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার বর্তমানকে অচ্ছেদ্যরূপে গেঁথে রেখেছে। এই-রূপেই রামায়ণ কাব্যখানি ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। তথ্যগত ইতিহাস নয়, সত্যগত ইতিহাস, নিছক তথ্যগত হলে রামায়ণের প্রভাব কখনো এমন গভীর হতে পারতোনা। কেননা তথ্য হচ্ছে বাইরের জিনিস, জাতির অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার নেই, এবং আপনার কালের সীমাকে অতিক্রম করে নিত্যকালকে সে অধিকার করতে পারে না'।...[১]

এইচ জি ওয়েলস, টয়েন বি, কান, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের সংজ্ঞানুযায়ী কেবল ঘটনা পঞ্জীর ইতিহাসই ইতিহাস নহে। সন তারিখ সহ কোন রাজা রাজরার কাহিনীকেই কেবলমাত্র ইতিহাস বলতে পারিনা, যুগ ধর্মের ইতিহাস ও প্রাচীন সমাজ জীবনের চিত্রপটকেও ইতিহাসের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।[২] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তও এই অভিমত সমর্থন করেছেন—

"The two together present us with the most graphic and life-like picture that exists of the civilisation and culture the political and social life, the religion and thought of ancient India"[৩].

অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারত এই দু'খানা মহাকাব্য আমাদের কাছে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সমাজ জীবনের যেরূপ সত্য ও বিস্তৃত চিত্র প্রদান করে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তার ইতিহাসের এমন গৌরবময় চিত্র রেখে যেতে পারেনি।

১। রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃঃ ৩৩।

২। A History of Indian Literature, M. Winternitz. Vol. 1., Part—II, Second Edition.

৩। Ramayana. The Epic of Rama, Prince of India, R. C, Datta, P, 181.

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণকে সুপ্রাচীন মহাকাব্য বলা যেতে পারে। রামায়ণের কাহিনী যখন পরিপূর্ণ মহাকাব্যের রূপ লাভ করেছে, তখনও মহাভারতের কাহিনী বিভিন্ন গল্পাংশের মধ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিল, অবশ্য রামায়ণের সাতটি কাণ্ডই আদি কবি বাল্মীকির রচনা নহে। রামায়ণের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠাংশ প্রাচীনতম, প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড পরবর্তী সংযোজনা।[১] কাব্যের ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পূর্ব ও পরবর্তী কবির রচনা সহজেই চেনা যায়। রামায়ণের সুপ্রাচীন প্রচলিত কাহিনী সূত, মাগধ ও চারণগণ রাজসভায় ও পথে-পথে গান করত। এই সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলির সমন্বয়ে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। রামায়ণের প্রাচীতম অংশ মহাভারতের পূর্ববর্তী। রামায়ণের কাহিনী যখন মহাকাব্যের রূপ লাভ করেছে মহাভারতের কাহিনী তখন কোনও নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে পারেনি, রামায়ণে মহাভারতের বিশেষ কোন চরিত্রের উল্লেখ নেই। অথচ রামায়ণের অনেক ঘটনা ও চরিত্র মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে, কাজেই বাল্মীকির রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ববর্তী রচনা বলা যেতে পারে। মহাভারতের বন পর্ব, দ্রোণ পর্ব ও শান্তি পর্বে রামোপাখ্যানের উল্লেখ আছে। এ, এ, ম্যাক্‌ডোনাল এই মতের সমর্থন করে বলেন—"The original part of the Ramayana appears to have been completed at a time when the epic kernel of the Mahabharata had not as yet assumed definite shape. For while the heroes of the latter are not mentioned in the Ramayana the story of Rāma is often referred to in the longer epic,"[২] কিন্তু অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর 'Inter-Relation of the two Epics of Ancient India' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন রামায়ণের কয়েকটি অধ্যায়ে মহাভারতের অনেক চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ আছে।[৩]

১। "Whose genuine parts are to be found in Books II-VI and the two added Books I and VII," p 440

২। A History of Sanskrit Literature, A. A. Macdonell, Third Indian edition, p. 306.

৩। Studies In Indian Antiquities, Hemchandra Roy, Chaudhuri, 2nd ed. pp. 20-27.

রামায়ণ ও মহাভারতের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে অধ্যাপক ভিণ্টারনিসও মহাভারতে রামোপাখ্যানের ও রামায়ণ রচয়িতা ঋষি বাল্মীকির উল্লেখ থাকায় রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ববর্তী রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। "A definite answer could be given, namely that our present Rāmāyana is older than the Mahabharata in its present form. As regards the second question, we may answer that the Ramāyāna being so much shorter, required a shorter time for its gradual growth than the Mahābhārata"[১].

রামায়ণ যে আদিকাব্য তার আর একটি প্রমাণ রামায়ণের প্রত্যেকটি কাণ্ড বিভক্ত হয়েছে সর্গে। সর্গ বিভাগ কাব্যের মুখ্য লক্ষণ। রামায়ণের প্রতি কাণ্ডের সর্গ বিভাগ ও রামায়ণ বর্ণিত অনুষ্টুপ ছন্দের প্রাচীনত্বের জন্য হপ্‌কিনস্ মনে করেন রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী রচনা। তাঁর মতে বাল্মীকির মহাকাব্যের পূর্বে ভারত-কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মহাভারতের পাণ্ডবদের কাহিনীর বহুপূর্বে রাম কথা লোক মুখে প্রচার লাভ করেছিল।[২]

রামায়ণ আর্য প্রভাবিত ভারতের প্রথম মহাকাব্য। কৃষি-বিস্তার উপলক্ষ্যে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সংঘাত হল রামায়ণ বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধের মূলকথা। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা হলেন কৃষি সভ্যতার প্রতিভূ। বিশ্বামিত্র ও জনক হলেন তাঁদের সহায়ক। রাবণ ও তার স্বর্ণলংকা হল শিল্প সভ্যতার প্রতীক। দক্ষিণ ভারত থেকে শিল্প সভ্যতার প্রাধান্য হ্রাস করে কৃষি সভ্যতার বিস্তার করতে গিয়ে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। পরিণামে বিজয়ী আর্যরা দক্ষিণ ভারতে কৃষি নির্ভর নব সভ্যতার প্রসার করে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনও রামায়ণের রূপকার্থ নির্ণয় করে বলেছেন—"আর্যরা প্রথমে পূর্বভারতে ও পরে দক্ষিণ ভারতে অনার্য শক্তিকে প্রতিহত করে কৃষিনির্ভর নব সভ্যতার বিস্তার করেন।[১]

ভারতের অতীত ইতিহাসের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে আর্য ও অনার্য শক্তির সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন—"রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহুদিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন, এই কারণেই তাঁহার গৌরব গান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। যেমন শকদের উপদ্রব হইতে হিন্দুদিগকে উদ্ধার করিয়া বিক্রমাদিত্য যশস্বী হইয়াছিলেন তেমনি অনার্যদের প্রভাব খর্ব করিয়া যিনি আর্যদিগকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন তিনিও সাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পূজ্য হইয়াছিলেন"।[২] বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও জনক প্রভৃতি ঋষিরা কৃষি নির্ভর আর্য সভ্যতা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার করার প্রয়োজনে শক্তি-ধর পুরুষ হিসাবে রামচন্দ্রকে নির্বাচিত করলেন, রাজর্ষি জনক নিজের কন্যাকে বীর্য শুল্কা করে একজন শ্রেষ্ঠ বীরের আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং মেয়েরও নাম দেন সীতা, যার আক্ষরিক অর্থ হলচালন রেখা।

বেবর, ল্যাসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীরা মনে করেন রামায়ণ দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলে আর্য সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে কৃষি সভ্যতা প্রসারের সময় বিজয়ী আর্যরা ক্রমশঃ বিজিত

অনার্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং বিজয়ী ও বিজিত জাতির সভ্যতার মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলতে থাকে। আর্যদের পরবর্তী সাহিত্য মহাভারত এই সমন্বয়ের যুগে রচিত হয়। তাই অনার্য জাতির অনেক আচার ব্যবহারও সামাজিক রীতিনীতি মহাভারতে বর্ণিত আর্য জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু রামায়ণে এরূপ কোন সংমিশ্রণ ঘটেনি। ব্রাহ্মণ প্রধান আর্য সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ এবং নারীর এক বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু মহাভারতে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী। ইহা অনার্য প্রভাবের ফল। অধ্যাপক মোক্ষমূলারও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহাভারতকে রামায়ণের পরবর্তী মহাকাব্য বলেছেন।

"But the original traditions of the Pāndavas break through now and then, and we can clearly discern that the races among whom the five principal heroes of the Mahābhārata were born and fostered, were by no means completely under the sway of the Brahmanical law. How is it, for instance, that the five Pāndava Princes, who are at first represented as receiving so strictly Brahmanical cduea-tion—who if we are to believe the poet, were versed in all the sacred literature grammar, Metre, astronomy, and law of the Brahmanas—could afterwards have been married to one wife. This is in plain opposition to the Brahmanic law, where it is said, "they are many, wives of one man not many husbands of one wife". Such a contradiction can only be accounted for by the admission, that in this case, epic tradition in the mouth of the people was too strong to allow this essential and curious feature in the life of its heroes to be changed"[১].

১। A History of Ancient Sanskrit Literature, Max Muller. p, 43.

বেদে ও রামায়ণে কোথাও সহমরণ প্রথা নেই। মহাভারতের আদি পর্বে মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গমণ করেন। রামায়ণের সমাজে আর্য অনার্যদের মধ্যে বিবাহ প্রথা ছিল না। মহাভারতের যুগ থেকে এই দুই জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মহাভারতে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম অনার্য দুহিতা হিড়িম্বাকে এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাগকন্যা উলুপীকে বিবাহ করেন। এসব দৃষ্টান্ত থেকে মনে করা যেতে পারে যে মহাভারত রামায়ণের পরবর্তীযুগে রচিত এবং অনার্য প্রভাবিত মহাকাব্য। আর্য ও অনার্য জাতির ব্যাপক মিশ্রণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের ঘটনা। ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারের প্রথম দিকে আর্যরা সযত্নে অনার্যদের প্রভাব এড়িয়ে চলেছিলেন। এ বিষয়ে ই· বি, হ্যাভেলের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"Though for many centuries holding themselves proudly aloof from the non-Aryan races and jealously guarding their spiritual inheritance from profanation by uninitiated, their laws political institutions and religious ideas gradually became for the vast majority of the people, the warp and wept of Indian life. even for the millions in whose veins no trace of Aryan blood can now be found."[১]

রচনা রীতির উৎকর্ষের দিক দিয়ে অনেকে রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে করেন। প্রফেসার ভিণ্টারনিস্ রামায়ণকে কোর্ট এপিক বা রাজসভার কাব্য বলেছেন। তাঁর মতে মহাভারত রামায়ণ অপেক্ষা অসংস্কৃত এবং যুদ্ধ ভাবাপন্ন মহাকাব্য। মহাভারতের সভ্যতা অপরিমার্জিত ও অসংস্কৃত আর রামায়ণের সভ্যতা পরিমার্জিত ও সুসভ্য এবং এজন্যই প্রাচীন মহাভারতে প্রচলিত গল্পাংশ প্রাচীন রামায়ণিক কাহিনীর পূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন—

"The older nucleus of the Mahabharata however is probably older than the ancient Ramayana"[২].

১। The History of Aryan Rule In India, E. B. Havell p, 9.

২। A History of Indian Literature, M Winternitz, ibid, p 453.

ভিণ্টারনিসে্র এই মত সমর্থন করে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন—

"When the first Kurus and Panchalas settled in Doab, they gave indication of a vigorus national life and their internecine war from the subject of the first national epic of India, Mahābhārata."[১]

রামায়ণের পূর্ববর্তী রচনা বেদ উপনিষদের কোন কোন অংশের চেয়ে উৎকৃষ্ট। রচনারীতির এই উৎকর্ষের জন্য বেদ উপনিষদকে যদি রামায়ণের পরবর্তী কালের রচনা বলা না যায়, তবে সমভাবে রচনা রীতির উৎকর্ষের জন্য রামায়ণের রচনাকালও মহাভারতের পরবর্তী যুগে স্থাপন করা যায় না।

সম্প্রতিকালে ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাভারতের রচনাকাল রামায়ণের পূর্ববর্তী বলে ঘোষণা করেছেন।[২]

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনও রামায়ণে মহাভারতের কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী যুগে স্থাপন করেছেন। "রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডে বাসুদেব কৃষ্ণ, নরনারায়ণ, শ্যাম, পুরুষোত্তম, শার্ঙ্গধর, হৃষিকেশ প্রভৃতি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি বিষ্ণুর অবতার হিসাবে, রাম ও কৃষ্ণের এবং সীতা ও লক্ষ্মীর অভিন্নতার কথাও রামায়ণে আছে। তাছাড়া পাণ্ডবদের পুরোহিত ধৌম্য ও পাণ্ডব বংশীয় রাজা জন্মেজয়ের কথা এবং মহাভারতোক্ত সাবিত্রী সত্যবাণ ও নলদময়ন্তী উপাখ্যানেরও উল্লেখ রয়েছে রামায়ণে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকেই জানা যায় জনক রাজার কালেই পরীক্ষিৎ পুত্র রাজা জন্মেজয় যে একজন প্রাচীন অশ্বমেধ যাত্রী নৃপতি বলে

১। A History of Civilization In Ancient India, Ramech Ch. Datta, p, 7,

২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪।২।৭৬, পরবর্তীকালে ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জী তাঁর "The Rāmāyaṇa its character, Genisis, History, Expansion and exodus a Resume" গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

গণ্য হতেন। সুতরাং মহাভারত বর্ণিত রাজন্যবর্গ ও ঘটনাবলী যে রামায়ণের রাজন্যবর্গের পূর্ববর্তী তাতে সন্দেহ থাকতে পারেনা।[১]

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের ঘটনার গতি ও বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে মহাকাব্যদ্বয়ের কাল নির্ণয় কিছুটা সহজে হয়ে আসে। আর্যজাতি ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করার পর দুইটি বিরাট যুদ্ধের সম্মুখীন হন। একটি আর্য ও অনার্যদের সংগ্রাম যা রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের রূপ লাভ করেছে। আর্যজাতির দুই গোষ্ঠির যে সংগ্রাম তা মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতে আর্যজাতির আগমনের প্রথম পর্ব বসতি স্থাপন ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তারের যুগ। দ্বিতীয় পর্ব গোষ্টি প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আত্ম কলহের যুগ। সম্ভবতঃ রাজ্যবিস্তার করেই আর্যরা আত্ম কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় সমসাময়িক যুগে মহাকাব্য দু'টি রচিত হয়েছিল, এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল। প্রফেসর ভিণ্টারনিস্ মহাকাব্যদ্বয়কে দুই ভিন্ন সময়ের রচনা বলে মনে করেন না। তিনি রামায়ণে উত্তর ভারতের এবং মহাভারতে দক্ষিণ ভারতের সভ্যতার নিদর্শন লক্ষ্য করেছেন—

"We assume that the Mahabharata reflects a regular civllization of western India, while the Ramayana refelcts a more refined civillization of Eastern india, and that the two epics do not represent the poetry of different periods, but a different region of India. even from this point of view, however it is difficult to conceive that the Mahabharata should only have become an epic under the influence of valmiki's poetic art".[২]

রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপত্তি যখনই হোকনা কেন উভয়ের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে একই পরিবেশ ও একই সঙ্গে পরিবর্তন ও বিবর্তন চলছিল। এই পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারায় উভয় গ্রন্থ পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল,

১। রামায়ণ সমস্যা, প্রবোধচন্দ্র সেন, দেশ.

২। History of Indian Literaturc, M, Winternitz, Ibid, p, 445.

এবং উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক আদান-প্রদানও ঘটেছিল। তাই রামায়ণের ঘটনা মহাভারতে ও মহাভারতের ঘটনা রামায়ণে দেখা যায়।

ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদের সঙ্গে রামায়ণের অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। রামায়ণে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে, বেদেও ব্রাহ্মণ প্রভাবিত সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মহাভারত ক্ষত্রিয় প্রভাবিত মহাকাব্য। মহাভারতের যুগে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। মহাভারতের প্রধান বিষয় কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। বেদে কুরু ও ভরতের নাম উল্লেখ থাকলেও পাণ্ডবদের নাম কোথাও দেখা যায় না। রাম কাহিনীতে যে সব কাহিনী অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন আকারে ছিল মহর্ষি বাল্মীকির হাতে তা পত্র-পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত হয়ে মহাকাব্যের রূপ ধারণ করেছে। রামায়ণের বহু চরিত্র ও কাহিনী বেদে অস্পষ্ট আকারে ছিল। রামায়ণে তা বিশাল ও পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করেছে। বেদোক্ত জনক রাজা রামায়ণে সীতার পিতা। জনক রাজার হলরেখায় সীতার জন্ম। আবার ভূগর্ভেই তিনি শেষ আশ্রয় লাভ করেন। ঋগ্বেদে এই সীতা ভূমিলক্ষ্মী বা কৃষির দেবী। আর্য ঋষিরা তাঁকে ইন্দ্র হস্তে সমর্পণ করেছেন। অর্থাৎ বেদে সীতাকে ইন্দ্রের পত্নী হিসাবে দেখান হয়েছে। ধনসম্পদ ও শস্য কামনা করে বৈদিক ঋষি সীতার বন্দনা করেছেন,

"অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি, যথা নং সুফলাসসি ॥৬
ইন্দ্র সীতাং নি গৃহ্লাতু তাং পূষামানু যচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহাম্, ওরামুওরাং সমাম্[১] ॥৭

অনুবাদ—হে সৌভাগ্যবতী সীতা! ভূমি অভিমুখী হও। আমরা তোমাকে বন্দনা করছি। তুমি আমাদের সুন্দর ধন প্রদান করো। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন। তিনি জলবতী হয়ে বৎসরের পর বৎসর শস্য দোহন করুন।

১। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম, আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, ৪।৫৭।৬৭ ঋক, পৃঃ ৪৫২।

ঋগ্বেদের ন্যায় শুক্ল যজুর্বেদেও সীতার জন্ম কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়,

"ঘৃতেন সীতা মধুনা সমজ্যতাং,
বিশ্বে দেবৈর নুমতা মরুদ্ভিঃ।
উর্জস্বতী পয়সা পিন্বমানাস্মান্।
সীতে পয়সাহভ্যা ববৃৎস্ব...১ ॥৭০

হে সীতা, বিশ্বদেব ও মরুৎগণের অনুমতিক্রমে সীতা মধুর জলের দ্বারা শিক্ত হোক। হে সীতা তুমি অন্নযুক্তা দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা সকল দিক পূর্ণ করে দুগ্ধাদির সাথে আমাদের কাছে এস।

বেদের সঙ্গে রামায়ণের সম্পর্ক নির্ণয় করে এ, এ, ম্যাক্‌ডোনাল্‌ও বলেন—

Sitā can be traced to the Rigved where she appears as the Furrow personfied and invoked as a Goddess. In some of the Grihya Sutras she again appears as a genius of the ploughed field, is praised as a being of great beauty and is accounted the wife of Indra· or parjanya, the rain God"[২]

বেদের দেবতা ইন্দ্রের সঙ্গে রামায়ণের নিকটতম সাদৃশ্য রয়েছে। বেদোক্ত-ইন্দ্র রামায়ণে সীতাপতি রামচন্দ্রে পরিণত হয়েছেন। বৃত্র রামায়ণে রাক্ষসরাজ রাবণের রূপ লাভ করেছে। রাবণের সীতাহরণ বৃত্রের ইন্দ্রের গাভী চুরির অনুরূপ। রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ বর্ণনায় বাল্মীকি ইন্দ্র ও বৃত্র যুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রাবণের পুত্রের নামও ইন্দ্রজিৎ। রামভক্ত হনুমান ইন্দ্রের সহকারী মারুতিপুত্র। সীতার সহচরী বিভীষণ পত্নী সরমার নামও বেদে পাওয়া যায়। অবশ্য এই সরমা মানবী বা দেবী নহেন—একটি দেব-কুকুরী মাত্র। পনি নামক অসুরেরা ইন্দ্রের গাভী চুরি করে অন্ধকারে লুকিয়ে রাখলে ইন্দ্র সরমা নাম্নী দেব কুক্কুরীকে গাভীর অন্বেষণে

১। যজুর্বেদ সংহিতা, আবদুল আজীজ আল আমন প্রাগুক্ত পৃঃ ৯১।

২। History of Sanskrit Literatue, A A. Macdonell. Ibid, p. 312.

নিযুক্ত করেন। সরমা অসুরদের সাথে বন্ধুত্ব করে ইন্দ্রকে গাভীর সন্ধান দিয়েছিলেন। বেদে দেব-কুক্কুরী সরমার মত রামায়ণে বিভীষণ পত্নী সরমাও সীতার নিকট রাম-রাবণের যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করতেন। বেদের কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীর ক্ষীণ যোগসূত্র লক্ষ্য করে প্রফেসর ভিণ্টারনিসও বলেন—

"As an epic the Rāmāyana is very far removed from the Veda and even the Rama legend is only found to Vedic literature by very slender threads"[১]

অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনও বেদে রামায়ণ কাহিনীর অস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করে বলেছেন—"ঋকবেদের একটা ঋক থেকে মনে হয় যেন ঋগ্বেদীয় ভাবনায় রামকথার তিনজনের—ভাই, বোন ও বাপের আবছা ছবি জেগেছে। দশরথ যেন ছেলে মেয়েদের বনে পাঠাচ্ছেন।

"ভদ্রো ভদ্রয়া সচমান আগাৎ
স্বসারং জারো অভ্যেতি পশ্চাৎ।
সুপ্রকেতৈর দ্যুভির্ অগ্নির বিতিষ্ঠন্
রুশদ্ভির্ বর্ণৈর অভি রামমর্ণ অস্থাৎ[২]॥

এখানে "ভদ্র (=দুস্র অশ্বী / রাম) ভদ্রার (=উষা / সীতার) পাশাপাশি এগিয়ে গেলেন। ভগিনীর (=উষার / সীতার) পিছনে প্রেমিক (=নাসত্য অশ্বী / লক্ষ্মণ) চলেছে। সমুজ্জ্বল জ্যোতি নিয়ে স্থির হয়ে অগ্নি (=দশরথ) জ্যোতির্ময় আভানিয়ে রামকে বিদায় দিলেন"।

রামায়ণের ১ম ও ৪র্থ কাণ্ডে যবন শব্দটির উল্লেখ থাকায় এবং রামায়ণে রামের হরধনু ভঙ্গ, রাবণের সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে হোমারের ইলিয়াড্ মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অধ্যাপক ওয়েবার রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কথা বলেছেন। অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ও খুব জোরের সঙ্গে রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কথা ঘোষণা করেছেন। রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়াডের এই সামান্যতম সাদৃশ্যটুকুর জন্য

১। A History of Indian Literature, M. Winternitz, Ibid p 452,

২। রামকথার প্রাক্ কথা, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪।

রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কথা বলা যায় না। গ্রীসের বাইরে এই ধরনের কাহিনী স্বাধীনভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করেছিল এমন ভাবনার কোন কারণ নেই। ম্যাক্‌ডোনাল এই মতের সমর্থনে বলেন—

"Stories of similar feats of strength for a like object are to be found in the poetry of other nations, besides the Greeks. and could easily have arisen independently"[১]

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদারও রামায়ণে গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করে বলেন – "আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমনের (৩২৪—২৬৫ খ্রী পূর্ব অব্দ) আগে ভারতের সঙ্গে গ্রীসের এমন কোন.ঘনিষ্ট সংযোগ ছিল না যে তাদের পুরাণ ও কাব্যের প্রভাব পড়বে তৎপূর্বে রচিত রামায়ণের সীতা হরণ পর্বে"[২]।

রামায়ণের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন পন্থী পণ্ডিতেরা মনে করেন রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী রচনা এবং গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণ রামায়ণের এই প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। প্রফেসর ল্যাসেন, ওয়েবার ভিণ্টারনিস্ প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ রামায়ণকে বৌদ্ধযুগের পরে স্থাপন করেছেন।[৩] আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ও রামায়ণকে বৌদ্ধযুগের পরবর্তী রচনা বলে প্রমাণ করেছেন।[৪]

দশরথ জাতকে রামসীতার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হওয়ার পর জাতককারগণ মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনার এরূপ অপকর্ম বা বিকৃতি ঘটানোর সাহস পেতেন না। সুতরাং প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে জাতকের কাহিনী রামায়ণ মহাকাব্যের পূর্ববর্তী মনে করে ভিণ্টারনিস্ বলেন—

১। History of Sanskrit Literature, Ibid, p. 308.

২। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪।১।৭৬।

৩। A History of Indian Literature, M. Winternitz. Ibid p.p, 446, 447.

৪। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪।১।৭৬।

"All this makes it seem likely that, at a time when the Tipitaka came into being (in the fourth and third centuries B.C) there were ballads dealing with Rama perhaps a cycle of such ballads, but no Rama epic as yet."[১]

বেবরের মতে—

'Tha Ramayana, was based on ancient Buddhist legend of the pious prince Rama, in whom the legend glorified the ideal of Buddhist equanimity.[২]

দশরথ জাতক, শ্যাম জাতক, বিশ্বন্তব জাতক, নলিনীকা জাতক, মহাসুত সোম জাতক প্রভৃতি বহু জাতক কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীর মিল দেখে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেন বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করার বহু পূর্ব থেকেই জাতকে বিভিন্ন রামকাহিনী প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ কাব্যে এসব কাহিনীর সংহত রূপ দান করেছেন[৩]। রামায়ণের রাজনৈতিক অবস্থা রামায়ণের কাল নির্ণয়ে কিছুটা আলোকপাত করে। পাটলিপুত্র বিজেতা কালাশোক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮০ অব্দে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহা-সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু রামায়ণে এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানটির উল্লেখ নেই। রামায়ণে কৌশাম্বী, কান্যকুব্জ, কোশল, কাম্পিল্য প্রভৃতি। উত্তর ভারতের রাজাগুলির নাম উল্লেখ আছে। অথচ পাটলিপুত্রের নাম উল্লেখ করা হয়নি। রামায়ণে কোশলের রাজধানীর নাম অযোধ্যা।

১, ২। A History of Indian Literature, M. Winternitze Ibid, 447-48

৩। "We find that many passages of the birth-stories, written in verse, show a close and unmistakable affinity with thereof the Epic, and on an examination and analysis of both these monuments of Indian Literature the Jatakas and the Epic, I have arrived at the conclusion that the Epic belongs to a later age" —The Bengali Ramayana, Dr. Dinesh Chandra Sen, University of Calcutta, 1920, p, Preface, vii.

(২) পাতঞ্জল এবং বৌদ্ধ, জৈন ও গ্রীক লেখকগণ রাজধানীর আর একটি নাম দিয়েছেন সাকেত। রামায়ণে সাকেত নাম পাওয়া যায়না। সুতরাং বৌদ্ধযুগের বহুপূর্বে রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলা যেতে পারে।

(৩) রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ সপ্তম কাণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে রামচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র লবকে শ্রাবস্তি রাজ্য দান করেন। রামায়ণের প্রাচীনতম অংশে (২য়—৬ষ্ঠ কাণ্ডে) শ্রাবস্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি। বুদ্ধের সময়ে কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তিতে রাজত্ব করতেন। সুতরাং বৌদ্ধযুগের বহুপূর্বে রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। অবশ্য রামায়ণের ১ম ও ৭ম কাণ্ডটি বৌদ্ধ সমসাময়িক বা তার পরবর্তী সংযোজন হতে পারে।

(৪) রামায়ণে মিথিলা ও বিশালা নামে দু'টি পৃথক নগরী ছিল। বুদ্ধের সময়ে এই দু'টি নগরী মিলিত হয়ে এক শাসনতন্ত্রের অধীনে এসে বৈশালী নাম নিয়েছিল। এর থেকে প্রমাণ হয় যে রামায়ণ বৌদ্ধযুগের পূর্বে রচিত হয়েছিল।

(৫) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ লেখকগণ সাহিত্যের ভাষা রূপে সংস্কৃত ব্যবহার করতেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' সংস্কৃত সাহিত্যে একখানা সুসমৃদ্ধ গ্রন্থ। এই পুস্তক রচনায় তিনি বাল্মীকিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রামায়ণ বৌদ্ধ ভারতে সুপরিচিত সংস্কৃত সাহিত্য। জৈন কবি বিমলসূরী রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে 'পদুম চরিত' রচনা করেন। সুতরাং রামায়ণ বৌদ্ধ পরবর্তী সাহিত্য নহে, বরং সমসাময়িক বা প্রাক্‌ বৌদ্ধযুগের রচনা। রামায়ণ বৌদ্ধযুগের পরবর্তী রচনা হলে বৌদ্ধযুগের স্থান-কাল, পাত্রপাত্রীদের কথা এতে উল্লেখ করা হত। কিন্তু রামায়ণে বৌদ্ধ যুগের সেরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। রামায়ণে 'বৌদ্ধ' শব্দ মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা পরবর্তী অনুপ্রবেশ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

(৬) উত্তর ভারতের কোশল রাজ্যের একটি সুসমৃদ্ধ মনোরম নগরী অযোধ্যা। এই অত্যুত্তম নগরীতে ইক্ষ্বাকু বংশে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম এবং এই অযোধ্যা নগরীকে কেন্দ্র করে রামায়ণ কাহিনীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ কোশল রাজ্যের নিকটবর্তী মগধে। রামায়ণ বৌদ্ধযুগের পরবর্তী রচনা হলে মগধ ও সমসাময়িক রাজ্যগুলির

নাম রামায়ণে উল্লেখ করা হত। কিন্তু রামায়ণে বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত কোন জনপদের নাম পাওয়া যায়না। সুতরাং রামায়ণ বৌদ্ধযুগের পরবর্তী একথা নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যায়না।

বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে 'দশরথ জাতক, 'লঙকাবতার সূত্র', 'শামাজাতক' প্রভৃতিতে যে বৌদ্ধ গাথাকাব্যের নমুনা রয়েছে তাকেই মহাকাব্যের পূর্বাভাস বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ রামায়ণ মহাকাব্য বৌদ্ধ গাথা সাহিত্যের পূর্বে রচিত হয়নি, প্রাচীন গাথাকাব্যের মধ্যেই বর্তমান মহাকাব্যের রূপ সুপ্ত ছিল। রামায়ণ রচিত হওয়ার পূর্বে রামগাথা জাতকে বর্ণিত হয়েছিল। শ্যামাজাতকে দশরথের সিন্ধু বধের অনুরূপ কাহিনীর পূর্বাভাস মেলে।[১] লঙকাবতার সূত্রে ভগবান বুদ্ধদেব লঙকাধিপতি রাবণের অনুরোধে লঙকাদ্বীপে আগমন করেন। সপারিষদ রাবণ তথাগতের উপদেশ গ্রহণ করে তাঁর শিষ্য হন।[২] রামায়ণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ দশরথ জাতক। দশরথ জাতকে ভগবান বুদ্ধদেব বারানসীর রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অপর দুই ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভরতকুমার এবং ভগিনী সীতাদেবী। রামায়ণ কাহিনীর শ্রীরামচন্দ্রের মত জাতকের রামপণ্ডিতও বিমাতার প্ররোচনায় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভগিনী সীতার সঙ্গে বনগমণ করেন। রামের বনগমণের নবম বর্ষে পুত্র-শোকাতুর রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করলেন। এবার ভরতের রাজছত্র গ্রহণের পালা। কিন্তু ভরতকুমার সিংহাসনে আরোহণ না করে অগ্রজ রামকে বারাণসীতে ফিরিয়ে আনার জন্য মহাবনে উপস্থিত হলেন। ভরতের কাছে পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী শোকে কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু রামপণ্ডিত স্থির, প্রশান্ত ও বিগতশোক। ভরত রামপণ্ডিতকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু তিনি দ্বাদশ বৎসর বনবাস যাপনে কৃতসংকল্প। অবশেষে রামের তৃণ নির্মিত পাদুকা বহন করে ভরত, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ স্বদেশে ফিরে এলেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে রামপণ্ডিত বারাণসী ধামে ফিরে এসে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সীতাদেবী অগ্র মহিষী পদে অধিষ্ঠিতা হলেন।

১। জাতক (ষষ্ঠ খণ্ড), ঈশান ঘোষ, পৃঃ ৪৯-৬৯।

২। লঙকাবতার সূত্র, নবনালন্দা মহাবিহার।

সুদীর্ঘ ষোড়শ সহস্র বৎসর যথারীতি রাজধর্ম পালন করে তিনি সুরলোকে প্রস্থান করলেন।[১] রামায়ণের সঙ্গে দশরথ জাতকের এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে দশরথ জাতককে একখানি ছোটখাট রামায়ণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[২]

রামায়ণের সঙ্গে দশরথ জাতকের অনেক বিষয়ে পার্থক্যও আছে। একটি মহাকাব্য, অপরটি গাথাকাব্য। রামায়ণে দশরথ অযোধ্যার নৃপতি। জাতকে তিনি বারাণসীর রাজা। রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চার ভ্রাতা। জাতকে তিন ভ্রাতা ও এক ভগিনী। সীতা জনক-নন্দিনী নন, দশরথসুতা। দশরথ জাতকে রাম সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ভগিনী বিবাহের আরও নজির আছে। উদয় জাতকে[৩] ও দীর্ঘনিকায়ে[৪] শাক্য বংশের উৎপত্তি বর্ণনায় ভগিনী বিবাহের উল্লেখ আছে। চীনা রামায়ণেও সীতা রামের ভগিনী ও মহিষী দুই-ই। জাতকে রাম বনবাস যাপন করেন হিমাচলের অরণ্য প্রদেশে। আর রামায়ণে দক্ষিণ ভারতের দণ্ডকারণ্যে। রাক্ষসরাজ রাবণের সীতাহরণ যা রামায়ণের অন্যতম ঘটনা জাতকে তা অনুপস্থিত। জাতকে বহু ইতর প্রাণী ও বহু জাতের উল্লেখ আছে কিন্তু রামভক্ত হনুমান সুগ্রীব, বানর ও রাক্ষসদের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এখন প্রশ্ন আসে দশরথ জাতক ও রামায়ণের মধ্যে কোনটা পূর্ববর্তী, কে কাকে প্রভাবিত করেছে। এই সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। অত্যাধুনিক কালের পণ্ডিতগণ এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছেন।

রামায়ণের অর্বাচীনত্বে বিশ্বাসীদের মতে রামায়ণ-মহাভারত বুদ্ধদেবের বহু পরে রচিত হয়েছিল। অন্ততঃ দশরথ জাতকের পূর্বে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ বর্তমান আকার লাভ করেনি। গৌতম বুদ্ধের বহুপূর্ব থেকেই জাতকের আখ্যান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং রামায়ণের যে সমস্ত আখ্যানের সঙ্গে দশরথ জাতকের সাদৃশ্য রয়েছে তা জাতক থেকেই রামায়ণে প্রবেশ করেছে। এই মতের সমর্থকদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে

১। Fausbøll, Jataka, Vol, IV, No, 461.
২। জাতক মঞ্জরী, ঈশান চন্দ্র ঘোষ (১ম খণ্ড) ১৯৩৪, উপক্রমণিকা
৩। Fausbøll, Jataka, Vol IV, No, 458,
৪। দীর্ঘনিকায়, ১ম খণ্ড, অম্বট্‌ঠ সুত্ত,

রামায়ণের উৎস সন্ধানে নামক বক্তৃতায় তিনি বলেন—"দশরথ জাতকে বর্ণিত উপাখ্যান ধার করে বাল্মীকি এই মহাকাব্য রচনা করেন।[১]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ও ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার আচার্য সুনীতি কুমারের বিপরীত মত পোষণ করে বলেন রামায়ণ ও মহাভারত বুদ্ধদেবের বহুপূর্বে রচিত হয়েছিল। জাতককারগণ মহাকাব্যের কাহিনীকে বৌদ্ধ মতবাদ প্রচারের উপযোগী করে কাহিনীর বিকৃতি ঘটিয়েছেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন—'রামায়ণ জাতকের পরবর্তী হলে কনিষ্কের সময়ে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বাল্মীকির নাম উল্লেখ না করে জাতকের নাম উল্লেখ করা হতো।"[২] ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও রামায়ণ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন—"বাল্মীকিই রামায়ণের জনক, আর জাতকে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা থেকে এরকম প্রমাণিত হয় যে রামচরিত্র বা কাহিনী তখন বহুল প্রচলিত ছিল। কারণ জাতকগুলির অধিকাংশই প্রচলিত কাহিনীর রূপান্তর। ভগবান বুদ্ধের বহু পূর্ব জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনের জন্য রচিত জাতকগুলি রামায়ণের অনেক পরবর্তীকালের।[৩]

বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার পরও রাম-কাহিনী যাত্রা, কথকথা ও পালাগানের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করা হত। লোকশ্রুতির এই রামগাথা সব সময় বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণ করে চলত না। গায়েনেরা গান করার সময় মূলে কাহিনীর সঙ্গে অনেক নতুন নতুন কাহিনীর সংযোজন করতেন। ফলে লোকসমাজে প্রচলিত রামগাথা ও মূল রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনীর মধ্যে অনেকটা পার্থক্য দেখা দিল। লোকসমাজে প্রচলিত রামায়ণ কাহিনী থেকে জাতক রচয়িতারা তাঁদের কাব্য সৃষ্টির উপাদান গ্রহণ করতেন। বিশেষতঃ জাতক রচয়িতারা ছিলেন লোক সাহিত্যের কবি। তাঁরা লোক গীতির রামগাথাকে বৌদ্ধ সাহিত্যের ও বৌদ্ধ ট্র্যাডিশনের (ভ্রাতাভগিনীর বিবাহ) উপযোগী করে দশরথ জাতকে গ্রহণ করলেন।

রাম চরিত্রের করুণা ও মহানুভবতার জন্য রামায়ণে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা বলা হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেও প্রাচীন ভারতীয় আর্যঋষির কণ্ঠ বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় স্বেচ্ছার হয়ে উঠেছিল।

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭।১।৭৬।
২,৩। ঐ , ১৪।২৭৬

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
— ....
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ[১]

করুণা, প্রেম, মৈত্রী যা কিছু বিশ্বমানবের কল্যাণকামী ভাবনা তা যে বৌদ্ধযুগের হবে এমন কোন যুক্তি নেই। আর্য ঋষিরা অহিংসা, মৈত্রী, ও প্রেমের আদর্শ ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। অহিংসার মনোভাব না থাকলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য সাধিত হতে পারত না তাই বেদে, রামায়ণে, ঋষি কণ্ঠে ও কবি কণ্ঠে অহিংসার কথা বলা হয়েছে বেদে ও রামায়ণে যা আভাসে ইঙ্গিতে ছিল গৌতম বুদ্ধ তা নিজ জীবনে আচরণ করে তাকে আরও প্রশস্ততর করেছেন, আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন— পেঁৗছে দিয়েছেন বিশ্ববাসীর মনের দুয়ারে।

রামায়ণ বৈদিক ভাবাপন্ন মহাকাব্য। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরে রচিত হওয়ায় রামায়ণের আদি স্তবে, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রজাপতি, আদিত্য ও রুদ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা বিশেষ স্থান লাভ করেছেন। পরবর্তী যুগে এই দেবতাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদিক সমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকলেও দেবতাদের মধ্যে তা বিস্তার লাভ করেনি। এক বা একাধিক দেবতা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সমানভাবে পুজা গ্রহণ করতেন। লোকপালক ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতা আর্য, অনার্য ও আর্যেতর সব জাতিরই উপাস্য দেবতা ছিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা ও মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে পতিত পাবনী গঙ্গাকে মর্ত্যে প্রবাহিত করে সগর বংশের উদ্ধার সাধন করেছিলেন[২]। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে মেনে নিয়েছিলেন।[৩] রাক্ষস রাজ রাবণ অনাহারে ভ্রাতাগণের সঙ্গে দশসহস্র বৎসর অমরত্ব লাভের জন্য ব্রহ্মার উপাসনা করেছিলেন।

১। শ্বেতাশ্বতরো উপনিষৎ—২।৫, ৩।৮ পৃঃ ৩৯৬. ৪১০, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৫৪।

২। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ পৃঃ ৭৬-৭৮।

৩। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, আদিকাণ্ড, পঞ্চষষ্টিতম সর্গঃ, পৃঃ ১১৪।

এক হাজার বৎসর পূর্ণ হলে দশানন একটি মস্তক কেটে অগ্নিতে আহুতি দেন। এইভাবে নয় হাজার বৎসর গত হল। এক একটি করে তাঁর নয়টি মস্তক অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করল। দশ হাজার বৎসর সমাগত হলে দশগ্রীব দশম মস্তকটি কেটে আহুতি দিতে ইচ্ছা করলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই স্থানে আগমন করলেন। ব্রহ্মার বরে রাবণ ইচ্ছামৃত্যু ও দেবদৈত্য, দানব, গন্ধর্ব ও নাগ প্রভৃতির অজেয় হয়েছিলেন এবং যে কোনরূপ ধারণ করতে পারতেন। দিগ্বিজয়ী রাবণের গতি একবার কৈলাস পর্বতে রুদ্ধ হলে বলদৃপ্ত রাবণ কৈলাস পর্বতকে উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। তখন দেবী পার্বতী ও পর্বতস্থিত দেবতারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মহাদেবের শরণ নিলেন। মহাদেব লীলাভরে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই পর্বতের উপর চাপ দিতে লাগলেন। পর্বতের চাপে রাবণের শিলাস্তম্ভতুল্য বাহু সকল নিপীড়িত হতে লাগল। তিনি যন্ত্রনায় ত্রিলোক কম্পিত করে রব করতে লাগলেন। অমাত্যগণের পরামর্শে রাবণ তখন স্তব স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে পর্বতের চাপ থেকে মুক্তি পেলেন এবং চন্দ্রহাস নামক মহাদীপ্তিশালী অস্ত্র লাভ করলেন।[১] কুম্ভকর্ণ তপস্যার দ্বারা দীর্ঘদিন নিদ্রায় অভিভূত হওয়ার বর লাভ করেছিলেন। লোকপালক ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে বর দিয়েছিলেন যজ্ঞ ও হোম শেষ করে যুদ্ধ যাত্রা করলে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারবেনা। এজন্য ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ সমাপ্ত করার আগেই লক্ষ্মণ তাকে বধ করেছিলেন[২] সুতরাং দেখা যায় যে রামায়ণী সমাজে ব্রহ্মা ও শিব সার্বজনীন দেবতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

রামায়ণের যুগে ভক্তের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা ভক্তের পক্ষ অবলম্বন করে তাকে নানা আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। অম্বরীষের যজ্ঞে শুনঃশেপ যূপকাষ্ঠে বন্দী অবস্থায় ইন্দ্র, অগ্নি ও বিষ্ণুর স্তব করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন।[৩] রাবণাদি রাক্ষসেরা ব্রহ্মার বরে দেব, দৈত্য, দানব ও যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতির অজেয় হয়েছিলেন। বালি,

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত. উত্তরকাণ্ড, পঞ্চদশঃ সর্গঃ পৃঃ ১২৭০

২। প্রাগুক্ত, লঙকাকাণ্ড, পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

৩ বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, আদিকাণ্ড, পৃঃ ১০৭-১০৮।

সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি বানর প্রধানেরা তপস্যার দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার বর লাভ করেছিলেন। রাবণ বধে রামচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য ইন্দ্র সূর্য বৃহস্পতি, অগ্নি. বায়ু প্রভৃতি দেবতারা বানরী, ভাল্লুকী পন্নগী ও বিদ্যাধরীদের গর্ভে নিজ-নিজ তুল্য মহাপরাক্রমশালী পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন।[১] স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট না হলে ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করে নেওয়ার প্রচেষ্টাও রামায়ণী সমাজে দেখা যায়। তিন রাত্রি সমুদ্রের উপাসনা করার পরও যখন রাম সমুদ্রের দেখা পেলেন না, তখন তিনি ত্রিজগৎ ত্রাসিত করে সমুদ্রে বাণ নিক্ষেপ করলেন। সমুদ্রের জল আলোড়িত হল। সমুদ্রও রামচন্দ্রকে দেখা দিয়ে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণের নির্দেশ দিলেন,

"বিধাস্যে যেন গন্তাসি বিষহি ষ্যেহপ্যহং তথা
ন গ্রাহ্যা বিধমিষ্যন্তি যাবৎ সেনা তরিষ্যতি।
হরীণাং তরণে রাম করিষ্যামি যথা স্থলম্ ॥"[২]

অনুবাদ—আপনি যেভাবে সমুদ্র পার হতে পারেন এবং আমিও সহ্য করতে পারি এমন একটা উপায় বের করবো, যেন বানরগণের তরণের সময় জলজন্তুগণ তাদের প্রতি কোনরূপ উপদ্রব করতে না পারে।

রামায়ণের যুগে সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজা প্রভৃতি দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করা হত। হনুমান অশোকবনে বন্দিনী জানকীর সাক্ষাৎ আশায় ভেবেছিলেন, সন্ধ্যা-উপসনার সময় উপস্থিত, হয়ত জানকী অশোকবনে নদীর ঘাটে সন্ধা-আহ্নিক করতে উপস্থিত হবেন,

"সন্ধ্যাকাল মনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীঞ্চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী ॥[৩]

অনুবাদ—'সেই বরারোহা শ্যামা লক্ষণান্বিতা জানকী প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হয়েছে বলে জানতে পারেন, তবে এই সুনির্মল জল সম্পন্ন সরোবরে নিশ্চয় আসবেন।

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, সপ্তদশ সর্গ, পৃঃ ৯৩০-৩৫।
২। ঐ, লঙকাকাণ্ড, দ্বাবিংশঃ সর্গ, পৃঃ ১৩০।
৩। প্রাগুক্ত, সুন্দরকাণ্ড, পঞ্চদশঃ সর্গঃ পৃঃ ৭৪৯।

রামায়ণে ভাগীরথী, যমুনা প্রভৃতি নদী স্ত্রীদেবতা রূপে পূজিত হয়েছেন। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা গুহকের নৌকা করে ভাগীরথীর মধ্যস্থলে উপনীত হলে কৃতাঞ্জলিবদ্ধা সীতা ভাগীরথীর কাছে পতি ও দেবরের মঙ্গল কামনায় মানসিক করে বলেছিলেন,

চতুর্দশ বৎসর বনবাস করে রাম, লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে মঙ্গলমত ফিরে এলে গো সহস্র ও সুরাপূর্ণ ঘটের দ্বারা তোমাকে পূজা করবো।

চীর-উত্তরীয়ধারী রামচন্দ্র স্বয়ং সন্ধ্যা শেষ না করে কখনও জল পান করতেন না। বালি চার সমুদ্রের তীরে সন্ধ্যা আহ্নিক করতেন। রামায়ণে যজ্ঞ-পূজা, স্বস্ত্যয়ণ ও মানসিকের কথা আছে। পূজা ও স্বত্যয়নাদি পুরোহিত তন্ত্র তখনও সমাজ দেহে শিকড় প্রবেশ করতে পারেনি। মূর্তি পূজা না থাকলেও দেবালয় ছিল। সেখানে দেবোদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হত। বিবাহের পর নববধূরা সেখানে প্রণাম করতে যেত। রামায়ণে বহু তীর্থস্থানের নাম আছে। কিন্তু তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা বা তীর্থ বাসের দ্বারা স্বর্গলাভের বা স্বর্গবাসের কথা নেই। তীর্থ স্থাপন বা তীর্থবাসের দ্বারা পুণ্য অর্জনের কথা রামায়ণে পরবর্তীযুগে প্রবেশ লাভ করেছে। পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ— এর ভাবনা রামায়ণে অনুপস্থিত। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার সময় ধর্ম, কর্ম, তীর্থবাস বা অরণ্যবাস দ্বারা শেষ জীবন অতিবাহিত করার কথা বলেন নি। সেকালে তীর্থবাস দ্বারা ধর্মজীবন যাপন করা সমাজ চিন্তার বহির্ভূত ছিল। দশরথ তৎকালীন সমাজ চিন্তার ধারায় রাজ্যভার শ্রীরামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করতে চাইলেন,

"জীর্ণস্তাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তির্মভিরোচয়ে॥
রাজপ্রভাব জুটাক্ষ দুর্বহাম জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
পরিশ্রান্তোহস্মি লোকস্য পূর্বীং ধমার্ধুরং বহণ্॥
সোহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে। ১

অনুবাদ—বহু সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করে আমি বৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত হয়েছি। অতএব পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে আমি আমার জীর্ণ শরীরকে বিশ্রাম দিতে চাই।

১। প্রাগুক্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, ২য় সর্গ পৃঃ ১৩৮।

দশরথ বার্ধক্য হেতু জীর্ণ দেহকে বিশ্রাম দিতে চেয়েছেন। তিনি অরণ্যবাস বা তীর্থ ভ্রমণের কথা চিন্তা করেন নি। রামায়ণের আদি স্তরের (২য়—৬ষ্ঠ কাণ্ড) রচনার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় মিলে তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। এর পর ক্রমশঃ পৌরাণিক যুগের দেবতারা রামায়ণে প্রবেশ করেছেন। রামায়ণের ছয় কাণ্ডে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র. সূর্য, মহাদেব, সোম, যম, অগ্নি, বরুণ, বায়ু, কুবের দেবসেনাপতি কার্তিকেয়, হর, কাম, জয়ন্ত বিশ্বরূপ এবং মরুৎগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিধাতা, ধর্ম, কাম, সাধ্য, পূষা, কৃষ্ণ প্রভৃতির নামও রামায়ণে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণু শিবের নাম রামায়ণের ছয়কাণ্ডে কোথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। রামায়ণের আদি স্তরের দেবতা বলে এদের মনে হয় না।

রামায়ণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ বিশেষ ভাবে না থাকিবার প্রধান কারণ এই যে রামায়ণের সমাজ বৈদিক কালের অব্যবহিত পরবর্তী বৈদিক ভাবাপন্ন সমাজ।"

কৈকেয়ীকে রাজা দশরথ বর দিতে চাইলে কৈকেয়ী দেবতাগণকে ডেকে সাক্ষী মানলেন—

"তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নবশ্চৈব গ্রহ রাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্ছে পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্বা স রাক্ষসা" ॥ ১৪

* * *

বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্ত দেবতাঃ [১] ॥ ১৬

অনুবাদ—তেত্রিশকোটি দেবতারা শ্রবণ করুন এবং চন্দ্র, সূর্য গ্রহ, আকাশ-মণ্ডল, দিবা, রজনী, দিক্, গন্ধর্ব, রাক্ষস, পৃথিবী, জগৎ, গৃহদেবতা, নিশাচর প্রাণী ও অন্যান্য জীবসকল আপনার সেই প্রতিজ্ঞা বাক্য অবগত হউক। কৈকেয়ী তাঁর স্ত্রীবুদ্ধিতে সব দেবতাকে আহ্বান করলেন, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত অযোধ্যাকাণ্ড, একাদশঃ সর্গঃ পৃঃ ১৬৩।

শিবকে আহ্বান করলেন না। কৌশল্যা রামকে বনগমনে বিদায় দানের সময় কোন পৌরাণিক দেবতার নাম উল্লেখ করলেন না। প্রার্থনার একেবারে শেষাংশে রামকে বিদায় দিয়ে হঠাৎ তাঁর সূর্য, অগ্নি বায়ুর কথা মনে পড়ল এসব দেবতার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ব্রহ্মার নামটা উচ্চারণ করলেন—

"অগ্নির্বায়ু স্তথা ধূমো মন্ত্রাশ্চর্যিমুখাচ্চ্যুতাঃ ।। ২৪
উপ স্পর্শনকালে তু পান্তু ত্বাং রঘুনন্দণম ।
সর্বলোক প্রভুর্ব্রহ্মা ভূত কর্ত্তা তথর্যয়ঃ । ২৫
যে চ শেষাঃ সুরাস্তে তু রক্ষন্তু বনবাসিনম্[১] ।।২৫

অনুবাদ—অগ্নি বায়ু, ধূম এবং মহর্ষিগণের মুখ নির্গত মন্ত্র সকল স্নান কালে তোমাকে রক্ষা করুন, রাম, সর্বলোক প্রভু, সর্বলোক স্রষ্টা এবং অপরাপর দেব ও ঋষিগণ বনবাসকালে তোমার রক্ষক হউন।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের বিংশ সর্গে কৌশল্যাকে পুত্রের মঙ্গল কামনায় বিষ্ণু পূজায় রত দেখা যায়। কিন্তু বনগমনোন্মুখী পুত্রের কল্যাণ কামনায় বিষ্ণুর নামটি তাঁর একবারও মনে পড়ল না। এসব দৃষ্টান্ত থেকে মনে করা যেতে পারে যে রামায়ণের আদিস্তরে বিষ্ণু পূজা প্রচলিত ছিল না। প্রক্ষিপ্ত রচনাকারদের দ্বারা পরবর্তী যুগে বিষ্ণু রামায়ণে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। বিষ্ণুর অর্বাচীনত্ব প্রমাণ করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন—

Vishnu has obtained such a prominent place as the Supreme Deity in later Hinduism that there is a natural reluctance among orthodox modern Hindus to accept him in his vedic character, as a mere Sun God. Yet such as he is in the Rigveda, and he is quite a humble deity in the vedic pantheon, far below, Indra or Varun Sabita or Agni"[২]

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, অযোধ্যাকাণ্ড, পঞ্চবিংশৎসর্গ পৃঃ ২০৭।

২। The early Hindu Civilization (B, C, 2000-320 Basde on Sanskrit literature)—Ramesh Ch. Dutt. Punthi Pustak, 4th edition, 1963, Page-76

হনুমান লঙকায় প্রবেশ করে সীতান্বেষণের সময় তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ করে ছিলেন কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ করেননি। রামায়ণী সমাজে স্তব স্তুতি উপাসনা, যজ্ঞ ও হোমের দ্বারা কল্যাণ কামনা করার রীতি প্রচলিত ছিল।

রাবণ বধের পূর্বে রামচন্দ্র ভগবান অগস্ত্যের নির্দেশে আদিত্য বা সূর্যের উপাসনা করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁদের এই বংশকে সূর্যদেবতার বংশ বলে জানতেন। সূর্য আদি দেবতা, সেজন্য ভারতবর্ষ, পারস্য, ইরাণ প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন দেশের আদি উপাসনায় সূর্য বন্দনা দেখা যায়। বেদে ও আবেস্তায় সূর্য বন্দনার কথা আছে। ইরাণীরা ও সূর্যোপাসক ছিলেন। বরুণ রাত্রির আকাশ আর মিত্র দিনের আকাশ। আকাশের দেবতা সূর্য. ইরাণীরা মিত্র নামে সূর্যকে পূজা করেন। ইরাণীদের সূর্য উপাসনা সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে,

"Sanskrit commentaries naturally explain Varuna as night and Mitra as day and the Iranian worshipped the Sun under the name of Mitra and gave the name of Varuna to a happy region, if not the Sky.

These facts show that the idea and name of Varuna as God of sky was known to the ancestors of the Aryan nations before those nations separated and migrated to Greece to Persia, and to India".[১]

সূর্য আদিম আর্যদের উপাস্য দেবতা ছিলেন। সুতরাং আর্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তাঁর উপাসনা দেখতে পাওয়া যায়। ইরাণীয়দের 'খোরশেদ' গ্রীকদেব 'Helios' ল্যাটিনদের 'Sol' ও টিউটনদের 'Tyr' সূর্য শব্দের রূপান্তর মাত্র। রামায়ণে ইক্ষ্বাকু বংশীয়দের যেমন সূর্যবংশীয় বলা হত, গ্রীকদেরও সূর্য বংশীয় বলে 'Helenes' বলা হত[২]।

ভারতীয় আর্যদের কাছে সূর্যের একটি বিশেষ স্থান ছিল। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, যম প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে আর্যরা হিরণ্যপাণি সূর্যের উপাসনা করেছেন।

"হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ হবয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্ ।।৫
অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ।।৬
বিভক্তরং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্ ।।৭
সখায় আনি ষীদত সবিতা স্তোম্যোনন্ নঃ দাতা রাধাংসি শুম্ভতি[১] ।।৮

অনুবাদ—হিরণ্যপাণি সবিতাকে আমি রক্ষার্থ আহ্বান করি। সে দেব যজমানের প্রাপ্য পদ জানিয়ে দেবেন। জলশোষক সবিতাকে রক্ষনার্থ স্তুতি করি। আমরা তাঁর যজ্ঞ কামনা করি। নিবাস হেতুভূত বহুবিধ ধনের বিভক্তা ও মনুষ্যদের প্রকাশকারী সবিতাকে আমরা আহ্বান করি। হে সখাগণ! চারিদিকে উপবেশন কর। সবিতাকে আমাদের শীঘ্র স্তুতি করতে হবে। ধনদাতা সবিতা শোভা পাচ্ছেন।

রামায়ণ বৈদিকভাবাপন্ন মহাকাব্য বলে রামায়ণে সূর্য উপাসনার একটা বিশেষ স্থান ছিল। সূর্য যেন সকল শক্তি ও সকল গুণের আধার স্বরূপ। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা সকলেই সূর্যের স্তব করেছেন।

রামায়ণী সমাজে সূর্য উপাসনা প্রচলিত থাকলেও যজ্ঞের সময় সূর্য উপাসনার সঙ্গে-সঙ্গে অগ্নিকেও অর্চনা করা হত। ইন্দ্রের সম্মান সে সমাজে ছিল, কিন্তু সূর্য ও অগ্নির ন্যায় তেমন পূজা পেতেন না। বর্তমান যুগের শিব ও বিষ্ণুর ন্যায় অগ্নি প্রতি ঘরে পূজা পেতেন। যজ্ঞাগ্নি ও অগ্নি হোত্র প্রতি ঘরে রক্ষিত হত। অযোধ্যার রাজান্তপুরে, জনপদবাসী বেদবিদ ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধান্তপুরে, রাবণের লঙকাস্থিত রাজপ্রাসাদে যজ্ঞাগ্নি ও অগ্নিহোত্র রক্ষিত হত। রামের বনগমণের সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁদের যজ্ঞাগ্নি বহন করে রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেছিলেন। ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য বনে আগমন করলে রাম ভরতকে রাজ্যের বিবিধ কুশল প্রশ্নের সঙ্গে তাঁর অগ্নিহোত্র কার্যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাবণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় অধ্বর্যুগণ পাত্রস্থিত প্রদীপ্ত অগ্নি বহন করে শব যাত্রীদের অগ্রে-অগ্রে গমন করেছিলেন।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১—২২।

শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের সময়ও জ্বলন্ত যজ্ঞাগ্নি সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। কেবল প্রতি ঘরে-ঘরে যজ্ঞাগ্নি ও অগ্নিহোত্র রক্ষা করা নহে—অগ্নি পূজা ও অগ্নি উপাসনা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। অগ্নিপূজা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন—

"Fire was an object of worship among all ancient nations and in India sacrifical fire received the highest regard, As no sacrifice could be performed without fire, Agni or fire was called the invoker of the Gods".[১]

ঋগ্বেদে অগ্নির বহু স্তব স্তুতি আছে। ঋগ্বেদের ১।১।১৫ সূত্রে অগ্নিকে যজ্ঞের হোতা বা পুরোহিত ও সত্যদ্রষ্টা বলা হয়েছে,

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞসা দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্ ।।১
অগ্নিঃ পূর্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবা এহ বক্ষতি ।।২
অগ্নিনা রয়িমশ্রবৎ পোষমেব দিবেদিবে। যশসং বীরবত্তমম্ ।।৩
অগ্নে যং যজ্ঞ মধবরং বিশ্বতঃ পরিভূ রসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ।।৪
অগ্নি হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ দেবো দেবেভিরা গমৎ[২] ।।৫

অনুবাদ—অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান, অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূতরত্নধারী, আমি অগ্নির স্তুতি করি। অগ্নি পূর্বে ঋষিদের স্তুতিভাজন ছিলেন। নূতন ঋষিদেরও স্তুতিভাজন। তিনি দেবগণকে এ যজ্ঞে আনুন। অগ্নি দ্বারা যজমান ধন লাভ করেন। সে ধন দিন-দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও যশোপ্রাপ্ত হয় এবং তা দিয়ে অনেক বীর পুরুষ নিযুক্ত করা যায়। হে অগ্নি, তুমি যে যজ্ঞ চারদিকে বেষ্টন করে থাক সে যজ্ঞে কেউ হিংসা করতে পারেনা এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহে দেবগণের নিকট গমন করে। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্মা, সত্যপরায়ণ ও বিবিধ কীর্তিযুক্ত সে দেবদেবগণের সঙ্গে এ যজ্ঞে আগমন করুন।

বৈদিক সমাজের ন্যায় রামায়ণী সমাজেও অগ্নি যজ্ঞ ফল প্রদানকারী। অপুত্রক রাজা দশরথ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপ্ত করার পর যজ্ঞাগ্নি

১। The Early Hindu Civilization, Ibid, Ramesh Ch. Dutt, p, 76.

২। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম প্রাগুক্ত, ১-১।১-৫, পৃঃ ১।

থেকে অতুল প্রভাবশালী, মহাবীর্য, মহাবল, সূর্যের ন্যায় প্রখর দেহ, প্রদীপ্ত অনলশিখা তুল্য এক মহাপুরুষ আবিভূর্ত হয়ে পুত্র উৎপাদক দিব্য পায়স দশরথকে দান করেছিলেন[১]। এ মহাপুরুষ আর কেহ ন'ন সাক্ষাৎ অগ্নি।

সর্বমানবের পাপপুণ্যের দ্রষ্টা ও যজ্ঞফল প্রদানকারী এই অগ্নিকে রামায়ণে আরও একবার আবির্ভূত হতে দেখা যায়। রামচন্দ্র সাগর পারে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন তিনি রাক্ষসগৃহে বাস করায় রামচন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করলেন না। স্বামী পরিত্যক্তা সীতা আত্মবিসর্জনের জন্য লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন। লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করলে সীতা রামচন্দ্র ও অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে বললেন,

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ।।২৫
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ [২] ।।২৬

অনুবাদ—যখন আমার মন কখনো রামকে বিস্মৃত হয়নি তখন লোক সাক্ষী পাবক আমায় সর্বতোভাবে রক্ষা করুণ। বিশুদ্ধা চরিত্রা আমাকে স্বামী যেরূপ দুষ্টা মনে করলেন, সেরূপ লোকের পাপপুণ্যের সাক্ষী ভগবান পাবক আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন—এই বলে সীতা নিঃশঙ্কচিতে অনলে প্রবেশ করলেন। সর্বদর্শী লোকসাক্ষী পাবক তখন সশরীরে আবিভূর্ত হয়ে বৈদেহীকে রামের নিকট স্থাপন করে জগৎ সমক্ষে তাঁর বিশুদ্ধতা ঘোষণা করলেন।

এভাবে দেখা যায় রামায়ণী সমাজে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে অগ্নি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। রামায়ণে বহুদেবদেবীর বন্দনার কথা আছে। কিন্তু সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ভূত অদ্বৈত ব্রহ্ম বা একেশ্বরবাদের কথা নেই। উপনিষদের যুগে একেশ্বরবাদের সূচনা। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চকে এক অদ্বৈত সত্ত্বার উপলব্ধি করেছিলেন।

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪।
২। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১৯৮।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদব্রহ্ম
পশ্চাদব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোধর্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ১। ১১

অনুবাদ—'পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্ত অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মই, পশ্চাৎভাগে ব্রহ্মই, দক্ষিণে ও উত্তরে ব্রহ্ম। অধঃ ও উর্ধ্বদিকে ব্রহ্মই ব্যাপ্ত। সর্বত্র প্রসৃত এই বিশ্ব বরেণ্যতম ব্রহ্মই।

উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বে যে ব্রহ্মবাদের সূচনা মহাভারতে তার প্রচার ও প্রসার।

মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবদগীতা একেশ্বরবাদ প্রচার করেছে,

"ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপম্ ২।

অনুবাদ—হে অনন্তরূপ! তুমি আদিদেব। তুমিই পুরাণ পুরুষ। তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র লয় স্থান। তুমিই একমাত্র জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু। তুমিই পরম ধাম, এই বিশ্ব ব্যাপি তুমিই অবস্থান কর এবং তুমিই বিশ্বের আদি কারণ।

সর্বভূতের আদি কারণ স্বরূপ এই একেশ্বরবাদের কথা রামায়ণে অনুপস্থিত। রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য। গৃহধর্মকে রামায়ণে সর্বোপরি স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই রামায়ণের যুগে যজ্ঞ, উপাসনা, দান, সত্যপালন অতিথি সৎকার প্রভৃতিই কর্ম। এই কর্ম অনুসরণ দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। এই ছিল সে যুগের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রামায়ণের সমাজ পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ মানুষের

এই বিশ্বাস শিথিল হয়ে এল। সবসময় আশানুরূপ কর্মফল লাভ করা গেল না। ফলে এই সব কর্মের উপর সন্দেহ দেখা দিল। মানুষ কর্মফল অপেক্ষা ভক্তিবাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল। এই বিশ্বাস ও ভক্তির যুগ মহাভারতের যুগ। রামায়ণের যুগ হল কর্মের যুগ। রামায়ণের যুগে মানুষ দৈব নির্ভরতা অপেক্ষা আপন পৌরুষ ও আত্ম শক্তিতেই অধিক বিশ্বাসী। যৌবরাজ্যে অভিষেকোন্মুখ রামচন্দ্র তাঁর নির্বাসন দণ্ডকে দৈববিড়ম্বনা বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি রামচন্দ্রকে পুরুষকারের দ্বারা হৃতরাজ্য জয় করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমনে দৃঢ় সংকল্পের কথা জানালে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে বললেন,

"বিক্লবো বীর্য হীনো যঃ স দ�ৈবমনু বর্ত্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্য্যুপাসতে ।।১৭
দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রভাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোহবসীদতি [১] ।। ১৮

অনুবাদ—'যে নিস্তেজ ও বীর্যহীন সেই দৈবের অনুগামী হয়ে থাকে। যে পুরুষের পৌরুষদ্বারা দৈবকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে, তিনি দৈব নিবন্ধন বিপন্ন হলেও অবসন্ন হননা'। রামায়ণের যুগে নিজের দুর্ভাগ্যকে কেউ দৈব বিড়ম্বনা বলে মনে করেন না। তাই বিপদ মুক্তির জন্য দেবতার সহায়তা প্রার্থনার রীতিও রামায়ণে অনুপস্থিত। রাক্ষসরাজ রাবণ কতৃক অপহৃতা সীতা নিজের বিপদমুক্তির জন্য কোন দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান নি। বরং রামের বাহুবলের উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। অমিত শক্তিশালী মহাবাহু রাম জানতে পারলেই যে তাঁর ভার্যাপহরণকারীকে সবংশে নিধন করবেন এতে সীতার কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি রাবণকে কটুক্তি করে বললেন,

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, অযোধ্যা কাণ্ড, চতুর্বিংশঃ সর্গঃ, পৃঃ ২০১—২০২।

"নহি চক্ষুঃপথং প্রাপ্য ত্বয়োঃ পার্থিব পুত্রয়োঃ।
সসৈন্যোঽপি সমর্থস্ত্বং মুহূর্ত্তমপি জীবিতুম্ ।।১১
ন ত্বং ত্বয়োঃ শরস্পর্শং সোঢ়ুং শক্তঃকমঞ্চন।
বনে প্রজ্বলিতস্যেব স্পর্শমগ্নে র্বিহঙ্গমঃ[১] ।। ১২

অনুবাদ—'তুই সসৈন্যে সেই রাজনন্দনের দৃষ্টিপথে পড়লে মুহূর্তকালও জীবিত থাকতে পারবিনা। পাখীরা যেমন বনমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি স্পর্শ সহ্য করিতে পারেনা। তুইও কোন মতে তাঁদের বাণ স্পর্শ সহ্য করতে পারবিনা'।

রামায়ণে দেবতার গুণকীর্তন করা হয়নি। মানুষই নিজগুণে দেবতা হয়ে উঠেছেন। রামায়ণের ধর্ম মানুষের ধর্ম। রামায়ণে মানুষ দৈবনির্ভরশীল নয়—আত্মশক্তিতে শক্তিমান ও স্বনির্ভর।

কোন এক সুদূর অতীত কালে ভারতীয় লোকচিত্তে রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপত্তি হয়েছিল। এই লোকগাথার কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্বত্র। লোকগাথার কাহিনী লোকান্তর ও স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ বৈচিত্র্যও লাভ করেছিল এক একটি অঞ্চলে। কবিগুরু বাল্মীকি এই লোকগাথাগুলিকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে মহাকাব্যের রূপ দান করে গেছেন। বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারত ভারতের 'ভূতল-জঠর থেকে উদ্ভূত হলেও ভারতের মৃত্তিকা ছাড়িয়ে ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। ভারতীয়, শিক্ষা সভ্যতা, সংস্কৃতির আলোক বর্তিকাটি একদিন ভারতের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন ছিল রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য। ব্রহ্মদেশ শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, সুমাত্রা, জাভা ও বলিদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির শিকড়টি এত গভীরে প্রবেশ লাভ করেছিল যে কালে কালে নানা জাতি ও ধর্মের উত্থান পতন সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি আজও সেখানে অক্ষুন্ন রয়েছে। জাতিতে তারা বৌদ্ধ, মুসলমান বা অন্য ধর্মাবলম্বী হলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে সেখানে আর্য প্রভাব এখনো বিদ্যমান। দ্বীপময় ভারত রাষ্ট্রের ভারতে প্রেরিত প্রথম রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত সুদর্শণ ভারতবর্ষে অবস্থান-কালে একসভায় বলেছিলেন—"ইন্দোনেসিয়ার ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে,

১। বাল্মীকি রামায়ণম্ অরণ্যকাণ্ড, চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ, পৃঃ ৫০৬।

বাহিরে মুসলমান ধর্ম সকলে মানিলেও, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব এখনও বিশেষ বিদ্যমান[১]। তাদের উৎসব. স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লোকসংস্কৃতি পর্যন্ত এখনো রামায়ণকে কেন্দ্র করে বিস্তার লাভ করছে। রামায়ণ মিশ্রিত এই উৎসবগুলিকে জাতিধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই নিজেদের জাতীয় উৎসব বলে মনে করেন। ইন্দোনেসিয়ায় অধিকাংশ লোকের নামকরণ এখনো হিন্দু-ধর্মাশ্রয়ী, ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাটি কোন সুদূর অতীতে কখন যে ভারতের সীমা অতিক্রম করে বহির্ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে আজও মতদ্বৈধতা আছে। ভারতীয় সভ্যতার বাণী বহন করে একদিন বহির্ভারতীয় দ্বীপগুলিতে যে ভারতীয় নৌবহর ভিড়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শ্রীবিজয় লক্ষ্মী' কবিতায় তার সুন্দর বাকপ্রতিমা রেখে গেছেন,

"মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলো ছলো।
পূব সাগরে হাত বাড়িয়ে বললে, চলো চলো ॥
রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে।
আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে ॥
তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা—
বললে আমি ঐ পারেতে বাঁধব নূতন বাসা ॥
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইল আমার কানে,
আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে[২] "।

১। রামায়ণ কৃত্তিবাসবিরচিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্যসংসদ, ১৩৬৪, ।

২। রবীন্দ্ররচনাবলী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২য় খণ্ড, জন্মশত বার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃঃ ১৫৭।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভা যাত্রীর পত্র গ্রন্থেও ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত রামায়ণ মহাকাব্য কিভাবে বহির্ভারতে আজও প্রভাব বিস্তার করেছে তার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন— "রামায়ণের মহাভারতের গল্প এদেশের লোকের মনকে, জীবনকে কি রকম গভীর ভাবে অধিকার করেছে তা এই কয়দিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে, বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের নূতন আমদানি হবার অনতিকাল পরেই দেখতে দেখতে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। এমন কি যেখান

থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ মহাভারতের গল্প এদের চিত্ত ক্ষেত্রে তেমনি করে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্বোধন কলা রচনায় নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারেনা। সেই প্রকাশের অপর্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল। বরবুদরের মূর্তিকল্পনায়। আজ এখানকার মেয়ে পুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিতকথাকে নৃত্য মূর্তিতে প্রকাশ করেছে, ছন্দে ছন্দে এদের রক্ত-প্রবাহে সেই-সকল কাহিনী, ভাবাবেগে আন্দোলিত[১] ”।

রামায়ণের সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি এই দেশের আকাশ, বাতাস, মাটিকে আশ্রয় করে আজও জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁরা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে যে কেবল পরিবর্তন করে সেই দেশের উপযোগী করে নিয়েছেন তা নয়, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে তাঁরা পরিবর্তন আর পরিবর্ধনও করেছেন। তাঁদের জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে রামায়ণ কাহিনী জড়িয়ে মিশিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাভা যাত্রীর পত্র' গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন, "রামায়ণ মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্তিতে এদের দেশেই বিচরণ করছেন. আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্বজনব্যাপী পরিচয় নেই, সেখানে ক্রিয়াকর্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন করে বিরাজ করেন না''।[২] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' গ্রন্থে বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুদূর প্রসারী প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য সর্বাংশে ভারতীয় মহাকাব্য, পুরাণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত। শ্রী হিমাংশু ভূষণ সরকার তাঁর দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে বহির্ভারতে রামায়ণ মহাকাব্যের প্রচার ও প্রসারের কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করে বলেছেন—

"প্রাচীন যবদ্বীপের কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থ এবং বহু 'ওয়েয়াঙ গল্প রামায়ণের বিভিন্ন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে অথবা উহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে কোনটি যে সুমনসান্তক, অর্জুনবিবাহ, হরিশ্রয় প্রভৃতি কাকাবিনের মূল

১, ২। রবীন্দ্ররচনাবলী, জাভা যাত্রীর পত্র, দশমখণ্ড, ২৫শে বৈশাখ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮, পৃঃ ৬৫০, ৬৫৩।

উৎস তাহা আজ বলা দুঃসাধ্য। সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে সুমন-সান্তক কাব্যটি একটি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ, কারণ ইহা যে কেবল মাত্র সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার বিষয় বস্তুও ভারতীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে [১]"।

সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি বহির্ভারতীয় অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তারের আর একটি কারণ ভারতবর্ষ তখন সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে জ্ঞান ও সভ্যতার দ্বীপ শিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিল। উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজেই এই সমস্ত অনুন্নত দেশগুলিতে ভারতের সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে :

"It seems almost to be a universal law, that when an inferior civilisation comes into contact with a superior one, it gradually tender to be merged into the latter, the rate and the exent of this process being determined solely by the capacity of the one to assimilate, and of the other to absorb. When the Hindus first settled in Suvarnabhumi and came into close association with her peoples, this process imediately set in, and produced the inevitable result[২]"

ভারতের বাইরে যে রামায়ণ কথা প্রচারিত হয়েছিল তা যে কেবল দেব ভাষা সংস্কৃতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা নয়, প্রাচীনকালে ভারতীয়রা যে সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সে সব অঞ্চলের কবির নিজের ভাষায় রামায়ণ মহাকাব্য অনূদিতও হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, বালি দ্বীপ, যবদ্বীপে এরূপ স্থানীয় ভাষার রামায়ণ পাওয়া যায়। যে স্থানে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল সেখানকার রামায়ণে আর্য প্রভাব বেশী, শ্যামদেশে আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। সেজন্য শ্যামদেশে বাল্মীকির মূল রামায়ণই প্রচলিত ছিল। আবার অনার্য প্রভাবিত অঞ্চল সমূহে দক্ষিণ

ভারতীয় রামায়ণের প্রভাব বেশী। এছাড়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আগন্তুক জাতিদের দ্বারা রামায়ণী কথা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন যে জাতি ভারতে এসেছে তখনই সে জাতি ভারতের জাতীয় জীবনের এই মনোরম মহাকাব্যের কাহিনী ও ভাবধারা যত্নের সঙ্গে তাদের দেশে বহন করে নিয়ে গেছে। অনেকের বিশ্বাস হোমারের ইলিয়াড্ মহাকাব্য রামায়ণের অনুকরণে রচিত। অনেকে আবার রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কথাও বলে থাকেন।[১]

বিভিন্ন যুগে রামারণ মহাকাব্য বিভিন্ন হিন্দু উপনিবেশ সমূহে বিস্তার লাভ করেছিল। এ সকল উপনিবেশ সমূহে রামায়ণ কাহিনীর বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রামায়ণ কথা জবদ্বীপে প্রচার হয়েছিল। এই সময়ে রামায়ণ মহাকাব্যে উত্তর কাণ্ড গ্রথিত হয়নি। তাই সমসাময়িক যুগে যবদ্বীপীয় রামায়ণে উত্তর কাণ্ড সংযুক্ত হয়নি। কবি কৃত্তিবাস যেমন বাংলার পলিমৃত্তিকা সংলেপন করে বাল্মীকির রামায়ণ কাহিনীকে বাঙালীর ঘরের কাহিনীতে পরিণত করেছেন। ভারতের বাইরে প্রচারিত রামায়ণ কাহিনীও স্থানীয় কবিভাষার জারক রসে জারিত হয়ে একটি স্থানীয় রূপ লাভ করেছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত রামায়ণগুলি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের সঙ্গে হুবহু এক নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরের সময় বাল্মীকি রামায়ণের এরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় হিন্দী ভাষায় রচিত তুলসীদাসী রামায়ণে এবং কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণে। দক্ষিণ ভারতে প্রচারিত তামিল ও তেলেগু ভাষার রামায়ণ, দশরথ জাতক, অদ্ভুত রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতির কাহিনীও হুবহু বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে এক ছিল না, বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত রামায়ণ কাহিনী ও বহির্ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। বহির্ভারতে প্রচারিত রামায়ণগুলির মধ্যে যবদ্বীপীয় রামায়ণের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। যবদ্বীপীয় ভাষায় যোগীশ্বর রচিত রামায়ণ কাকাবিনটি সর্বাংশে বাল্মীকি রামায়ণের অনুরূপ নয়। ডঃ হিমাংশু ভূষণ সরকার বাল্মিকী রামায়ণ ও যবদ্বীপীয় রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা ভট্টিকাব্যের সঙ্গে যোগীশ্বরের রামায়ণের মিল বেশী। কবি

১। A History of Indian Literature, M. Winternitze.

যোগীশ্বরের সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল। তাঁর রামায়ণের সর্বত্রই ভট্টিকাব্যের নিদর্শন মেলে। ভট্টিকাব্যের মত যোগীশ্বর মঙ্গলাচরণ ছাড়াই তাঁর কাব্য আরম্ভ করেন। রামায়ণ কাকাবিন ছাড়াও রামায়ণের কাহিনী অবলম্বলনে বহু যবদ্বীপীয় কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। 'হরিশ্রয়' ও 'সুমনসন্তক' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সুমনসন্তক অর্থাৎ পুষ্প দ্বারা নিহত। এর কাহিনী ভাগের সঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশের অজ-ইন্দুমতীর কাহিনীর অদ্ভুত মিল দেখা যায়।

যবদ্বীপে আর যে কয়টি রামায়ণ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে 'হিয়াকৎ সেরি রম' এবং সেরেৎখণ্ডের সঙ্গে অদ্ভুত রামায়ণের সাদৃশ্য দেখা যায়। অদ্ভুত রামায়ণে কথিত আছে যে ঋষিগণের রক্ত পান করে রাবণের পত্নী মন্দোদরীর গর্ভে ডিম্বাকারে সীতার জন্ম হয়। রাবণ তখন একশত বৎসর লংকার বাইরে ছিলেন বলে মন্দোদরী লোকলজ্জার ভয়ে ডিম্বটি ত্যাগ করেন। মিথিলার জনক রাজা চাষ করার সময় ডিম্ব ফেটে সীতার উৎপত্তি হয়। লাঙলের মুখে জন্ম বলে তাঁর নাম সীতা। সেরেৎখণ্ডে রহবন ও নকল বন্দোদারির কন্যা হল সিন্ত দেবী বা সীতাদেবী। সেরেৎখণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে যে রহবন মন্দ্রপুরের রাজা দশরথের রাণী বন্দোদারির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে দাবী করে। বন্দোন্দরি রহবনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিজ দেহের ক্লেদ থেকে বন্দোদারি ক্লালার নামে একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করে রহবনের কাছে পাঠিয়ে দিল। রহবনের সহবাসে নকল বন্দোদারি সন্তান-সম্ভবা হল। রহবন জানতে পেরে প্রতিজ্ঞা করে যে যদি তার স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করে তবে তার সঙ্গে রহবন যুদ্ধ করবে। আর যদি কন্যা সন্তান হয় তাকে স্ত্রীরূপে পরিগ্রহ করবে। নকল বন্দোদারির একটা কন্যা জন্মাল। কন্যাটি শ্রীর অবতার। যেমন সীতা লক্ষ্মীর অবতার ছিলেন। রহবন যদি এই কন্যাকে বিবাহ করে এই আশংকায় মাতা তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। মন্তিলির রেসিকল বাক্সে ভাসমান কন্যাটিকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করে নাম দিলেন 'সিন্ত'। সিন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রেসিকল স্বর্গ থেকে একটা ধনুক প্রাপ্ত হল। রেসিকল ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি ধনুকে টঙ্কার দেবে এবং নয়টি তালবৃক্ষ ছেদন করতে পারবে তাকেই সিন্তদেবী প্রদান করা হবে। রহবন বহু চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারল না। অবশেষে মন্দ্রপুরের বল্যদরুর পুত্র বের্গব ধনুকে জ্যা রোপন করে সিন্তদেবী লাভ করলেন।

এই ঘটনাটি রামায়ণে রামের হরধনু ভঙ্গের কাহিনীর অনুরূপ। 'বন্দোদারি-ক্লালার' বা নকল বন্দোদারির উৎপত্তি ও সিন্ত দেবীর জন্ম কাহিনী রামায়ণ বর্ণিত সীতার জন্ম কাহিনীর বিকৃত স্বরূপ। এ ছাড়া রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বনে আরও অনেকগুলি রামায়ণ কাকাবিন রচিত হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে 'রম কিদুঙ বলি', 'রম ক্লিঙ ও অর্জুন বিজয়' গ্রন্থে রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে।[১]

রামায়ণ কাহিনী কেবল যে বৃহত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল তা নয়, ভারত ও ভারতের প্রত্যন্ত দেশ ছাড়িয়ে উহা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন, জাপান, পারস্য ইরাণ প্রভৃতি দেশেও রামায়ণের অনুবাদ সাদরে গৃহীত হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সিলভা লেভী রামায়ণের চৈনিক সংস্করণের কথা সর্বসমক্ষে প্রচার করেন। এই রামায়ণটির নাম "কি—কিতা য়ে" এর রচনাকাল ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দ বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা দশরথ জাতকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশী।[২] কেবল চীনদেশে নহে, সপ্তম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে রামায়ণ কাহিনী পারস্য, ইরাণ তুর্কিস্হান প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

পারস্য ভাষায় দু' খানা রাময়ণের অনুবাদের প্রতিলিপি বিলাতের ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত হয়েছে। তুলসী রামায়ণের পারসী অনুবাদ ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও আছে। এই রামায়ণগুলিতে বাল্মীকি রামায়ণ ও দশরথ জাতকের সংমিশ্রন ঘটেছে। গ্রন্থটির অনুবাদকের নাম দেবীদাস কায়স্হ। বোগদাদের খলিফা হারুণ-অল-রশিদ বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের পারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন।[৩] ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যোৎসাহী সম্রাট আকবর বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ করান। ৯৯৯ হিজিরা অব্দে জামদণ্ডান-আওয়াল মাসে বদাউনি রামায়ণের অনুবাদ শেষ করেন। তারিখ—বদায়ু-

নীতে এই অনুবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১] ইংরাজদিগের ভারত অধিকারের পর বিভিন্ন ইংরাজ ও ভারতীয় মনীষীদিগের চেষ্টায় দেশে ও বিদেশে রামায়ণের বহু ইংরাজী অনুবাদ সংকলিত হয়।

কেবল দ্বীপময় ভারতের কবিরা রামায়ণ মহাকাব্য অবলম্বন করে বিপুলায়তনে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভাস্কর এবং শিল্পীরাও মন্দির-গাত্রে সেই কাহিনীকে শাশ্বত রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়ে গেছে প্রাম্বানন, পনতোরন, বাপুয়ন ও আঙকোরভাটের মন্দিরগুলির প্রস্তর গাত্রে। প্রাম্বাননের মন্দির খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। পনতোরণের মন্দির এর কয়েক শতাব্দী পরে খ্রীষ্টীয় ১১৯৭—১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছিল বলে মনে হয়। পনতোরন, আঙকোরভাট ও প্রাম্বাননের অঙ্কিত রামায়ণ বিষয়ক চিত্রগুলি বহুলাংশে বাল্মীকি রামায়ণের অনুকরণ না হলেও শিল্প সৌকর্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। অধ্যাপক বিজন রাজ চ্যাটার্জী তাঁর Indian Influence in Combodia গ্রন্থেও প্রাম্বাননের মন্দির গাত্রে অঙকিত চিত্রাবলীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

The first six scenes are also found in the Rāma Relief of prāmbanan in Central Java a temple of the 9th Century A. D. The Prāmbanan reliefs are decidedly superior in artistic merit, though they do not follow Vālmīki's Rāmāyana closely".[২]

এইভাবে দেখা যায় রামায়ণ কাহিনী যুগে যুগে ভারতে ও ভারতের বাইরে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও দর্শণকে প্রভাবিত করে আসছে। রামায়ণের যে কাহিনী অবলম্বনে কবিরা বিপুলায়তন সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছেন শিল্পীরা সে কাহিনীকেই অবলম্বন করে শাশ্বত শিল্পরূপ দিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং রামায়ণ কাহিনী কালে কালে, দেশে দেশে সমস্ত সৃষ্টি ধর্মী প্রেরণার উৎস স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় শিল্প, ধর্ম ও দর্শনে রামায়ণ

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস সমগ্র ভারত আত্মার মুক্তি ও চিত্ত বিকাশেরই ইতিহাস। পাশ্চাত্যশিল্পের মত তা শিল্পীর ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়। ভারতশিল্প প্রতিটি স্তরে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ধর্মের মাধ্যমে জাতির আত্মচেতনাকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছে। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় ও জাতির অধ্যাত্মচেতনা থেকে ভারতীয় শিল্পকলা এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় শিল্পে জাগতিক বা ঐহিক ভাবধারা অপেক্ষা পারলৌকিক বা অধ্যাত্মবাদীয় ভাবধারার পরিচয় মেলে অধিক। অবশ্য কোথাও কোথাও বাস্তব জীবনের চিত্রও আছে। ভারতবর্ষে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করেছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতীয় জীবনের নানান দিক ভারতীয় শিল্পকলায় প্রতিফলিত হয়েছে। জাতির ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেক সময় শিল্পীর ব্যক্তি সত্তা বিকাশ লাভ করতে পারেনি। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা Objective বা বাস্তবায়িত শিল্প নয়—এ হচ্ছে Subjective বা আদর্শায়িত এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি। শিল্পী তাঁর শিল্পকলার মধ্যে রূপের প্রকাশ করতে গিয়ে অরূপেরই সন্ধান পেয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যে হরপার্বতী, লক্ষ্মীনারায়ণ,রামসীতা, যক্ষ-যক্ষিণীর যে বিভিন্ন মূর্তি ও চিত্রাবলী রয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার কথা থাকলেও তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে এক অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে আমাদের চিত্তবৃত্তিকে টেনে নিয়ে যায়। প্রাচীন ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি-গুলি এক অপার্থিব ভাবকল্পনায় সমৃদ্ধ ও স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত। এদের চোখ, মুখ, নাকের গড়নে নিটোল দৈহিক সৌন্দর্য অপেক্ষা এক অপ-

রূপ জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য ও অপার্থিক ধ্যেয়রূপই অধিক প্রকাশ পেয়েছে। ডাগোবার্ট ডিরানস্ ও হ্যারী জি স্রীক্‌ল তাঁদের Encyclopaedia of the Arts—গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করেছেন—

"Art in India, since its beginnings, has been dedicated ot the great religious sytems of India: Brahmanism or Hinduism, Buddhism, Jainism and the many indigenous nature cults that have always flourished in (South-Western) Asia. It has been an art concerned with the statement of the traditional principles embodied in these faiths and never with the self conscious creation of beauty for its own sake. The monuments of the great periods of Indian Art history are icons with the primary utilitarian function of presenting the -divine prototype in material form for the express veneration of the worshipper. If they are beautiful or moving, it is because they have been effectively fashioned to fulfill this purpose and not because the craftsman deliberately set out to make something 'artistic' with super ficially pleasing surfaces. It was the final purpose of art in India to present to the believer all of the truths and certainties of his religion.[১]

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের জাতীয় মহাকাব্য। স্মরণাতীত কাল থেকে রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের জাতীয় জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে আসছে। ভারতীয় কবিকুলচিত্তে রামায়ণ কাহিনী কাব্য প্রেরণার উৎস স্বরূপ। ভারতীয় সাহিত্যের ন্যায়, ধর্ম, দর্শন শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসও রামায়ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এক কথায় ভারতীয় জনজীবনের প্রতিটি স্তর রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ভারতীয় শিল্পে রামায়ণের একটা উল্লেখযোগ্য স্থান আছে।

১। Encyclopaedia of the Arts, Dagobert D Runes & Harry G Schrickle, New York, 1946, pp. 455-56.

হরপার্বতী, লক্ষী-নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা ও পুরাণ কাহিনীর মত রামায়ণ ক্যাহিনী এবং রামায়ণের চরিত্র ভারতীয় শিল্পীর হাতে শিল্পরূপ লাভ করে ভারত শিল্পের সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করছে। রামায়ণ শুধু ভারতীয় শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেনি, রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে সুদূর শ্যাম, কম্বোজ, জাভা, বালিদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি দেশের ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য ও ললিতকলা প্রভৃতিও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কোন্ সুদূর অতীতে রামায়ণ কাহিনী প্রথম ভারতশিল্পে রূপলাভ করেছিল তার যথার্থ কাল নির্ণয় আজও সম্ভব হয়নি। ভারতশিল্পে রামায়ণ কাহিনীর কাল নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই ভারত-শিল্পের প্রকৃতি নিরূপন করা প্রয়োজন। ভারত আত্মার অকলঙ্ক অতুলনীয় প্রতিমা আত্মপ্রকাশ করেছে ভারতীয় শিল্পকলায়। ভারতশিল্পের এক একটি অংশের মধ্যে তার যুগোত্তীর্ণ সমগ্র সত্তাটিকে উপলব্ধি করা যায়। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলনের ফলে হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি। হিন্দু সংস্কৃতির গঠনে প্রাণময় গতিশীলতা দিয়েছে অনার্য জাতি আর আন্তচেতনা দিয়েছে আর্য জাতির দার্শনিক চিন্তাধারা। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে মূর্তি শিল্পে ভারতীয় ঐতিহ্যের চিহ্নস্বরূপ অঙ্কিত রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্ররূপ ও হিন্দুর নানান পুরাণ কাহিনীর দৃশ্য। এই চিত্রগুলির মধ্যে আছে বহু লৌকিক বিশ্বাস ও জনজীবনের কিংবদন্তী। ভারতশিল্পে রামায়ণ মহাভারতের চিত্রগুলির মধ্যে বাল্মীকি ও ব্যাস কথিত কাহিনী যেমন রূপ লাভ করেছে তেমনই জনজীবনে প্রচলিত অন্যান্য কাহিনী গুলিও স্থান লাভ করেছে। এ সমস্ত শিল্প সৃষ্টির অধিকাংশই রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মহাকালের সীমাকে অতিক্রম করে একালের দ্বারে এসে পৌছাতে পারে নি। তাই গুপ্তযুগের পূর্বে আমরা ভারত শিল্পে রামায়ণের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখতে পাই না। অথচ প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন প্রথম আবিষ্কৃত হয় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। রামায়ণ আরও পরবর্তী কালের সৃষ্টি। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে রামায়ণ খৃষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতকে রচিত হয়েছিল। রামায়ণ কাহিনীও সমসাময়িক কালে বা তার কিছু পরে শিল্পরূপ লাভ করেছিল বলে মনে হয়। সিন্ধুসভ্যতায় যেখানে ভারতশিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল এবং আর্য-জাতির শিল্পের সঙ্গেও তার নিকট সাদৃশ্য রয়েছে, সেখানে ভারতের জাতীয়

মহাকাব্যের কাহিনী শিল্পরূপ লাভ করেনি একথা বিশ্বাস করা যায় না। আজও ভারতের বিভিন্ন পর্বতগাত্রে ও মন্দিরের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে বহু ভারতীয় শিল্প সম্ভার অবলুপ্তির পথে চলেছে। যার সংরক্ষণ ও পরিচর্যার ব্যবস্থা আজও হয়নি। যার ফলে গুপ্তযুগের পূর্বে সিন্ধুসভ্যতার শিল্প নিদর্শন ছাড়া ভারতশিল্পের আ র কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গুপ্তযুগ ভারতশিল্পের চরম উৎকর্ষের যুগ। এ যুগের শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন আজও গৌরবের বস্তু। গুপ্তযুগ ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ নামেও পরিচিত। এযুগকে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যুগও বলা যায়। এই সময়ে ভারতীয় শিল্পকলা ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আর কোন সময়ে এতটা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। সেই সুদূর অতীতকাল থেকে ভারতে বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে. তোরণে দেবদেবীর চিত্র, পুরাণ কাহিনী ও বৌদ্ধ জাতকের উপাখ্যান চিত্রিত হয়ে আসছে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও ভারতের বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে নিপুনভাবে খোদিত হয়েছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে রামসীতার মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মথুরা ও সারনাথের বুদ্ধমূর্তি সুলতানগঞ্জের তাম্রমূর্তি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ও নাগ গিরির ভাস্কর্য মূর্তি এবং অজন্তার চিত্র ও ইলোরার স্থাপত্য এযুগের বিস্ময়কর সৃষ্টি। শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্য অপেক্ষা ভাব ও ব্যঞ্জনা ধর্মিতাই এই যুগের শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে ভারতবাসীর অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্মের মূলে দুইটি দেবতাই প্রধান। প্রথম শিব, দ্বিতীয় বিষ্ণু। বিষ্ণু অপেক্ষা শিব অধিকতর প্রাচীন দেবতা। কারণ শিবের প্রাকৃতরূপ আমরা দ্রাবিড়দের মধ্যেও দেখতে পাই। আর বিষ্ণু যুগে যুগে বিভিন্নরূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। উদার হিন্দু ধর্ম আর্য অনার্য ও বৌদ্ধমতকে সাঙ্গীভূত করে দশ অবতারের কল্পনা করেছে। তাই হিন্দুর বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে দশ অবতারের মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলির দেওয়াল গাত্রে দশ অবতারের বিভিন্ন দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। কোথাও বা মন্দিরের ভিতরে অবতারগুলির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূর্তিগুলির মধ্যে বরাহ অবতারের মূর্তি উত্তরভারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে উত্তর প্রদেশের ঝান্সী জেলার দেওঘরের পাথরের তৈরী মন্দির ও

কানাপুরের ভিতর গাঁওয়ের ইটের মন্দির দুটি খুবই বিখ্যাত। দশ অবতারের মন্দিরটি মস্ত বড়। মন্দিরের উপরের দিকটা চূড়া বিশিষ্ট বলে ইহাকে শিকর মন্দির ও বলা হয়। দেওয়ালের গায়ে বেদীর চারদিকে,মন্দিরের ভিতেও রামায়ণের কাহিনী খোদাই করা হয়েছে। মন্দিরটির তিনদিকে মহাযোগী শিব, গজেন্দ্রমোক্ষ ও বিষ্ণুর অনন্ত শয্যার তিনটি মূর্তি খোদিত হয়েছে। দ্বারে গঙ্গা যমুনার দুইটি মূর্তি দ্বার রক্ষীর কাজ করছে। শ্রীসরসী কুমার সরস্বতী গুপ্তযুগে দেওঘরের শিল্পরীতির যে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

"The basement of the temple is embellished with sculptured friezes depicting scenes from the Rāmāyana, while the wall proper are provided with altorelievo sculptures in nichcs, one on each of its three sides. The Rāmāyana Panels seem to belong to the order idiom of narrative reliefs with all their characteristic, spontaneity, but this spontaneity instead of represnting a wild and frenzied existence is found to be governed by certain discipline in the manner of the ages."[১]

খৃীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অজন্তা, ইলোরা ও বাগ গুহায় অঙ্কিত চিত্র ভারতশিল্পের আর এক অপূর্ব নিদর্শন ইলোরায় কৈলাস পর্বতে শিবমন্দিরের ভাস্কর্যের চিত্র গুপ্তযুগের আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। রাবণের দিগ্বিজয়ের একটি দৃশ্য অবলম্বনে ইলোরার ভাস্কর্যটি রূপ লাভ করেছে। রাবণ দিগ্বিজয়ে বের হয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসস্থল কৈলাস পর্বত উত্তোলনের চেষ্টা করে। রাবণের আকর্ষণে পর্বতবাসী ভয়ে বিকম্পিত হল। ভীত সন্ত্রস্তা পার্বতী মহাদেবকে আলিঙ্গন করে রইলেন। মহাদেব পায়ের আঙুলের চাপে দশাননকে সেই পর্বতের নিচে আটকে রাখলেন। দৃশ্যটি যেমন জীবন্ত তেমনই বীরত্বব্যঞ্জক। এর মধ্যে একটা নাটকীয় ব্যঞ্জনা ও প্রাণচাঞ্চল্য আছে। শিল্পী রাবণের মূর্তিটির মধ্যে যে আদিম বন্যতা ও শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে দ্রাবিড় শিল্পের ও খানিকটা প্রভাব আছে। ইলোরার

A Survey of Indian Sculpture, S.K. Swaraswati, 1st Ed, 1957. P 138.

এই ভাস্কর্যটি সম্বন্ধে আনন্দ কুমার স্বামী তাঁর "Introduction To Indian Art গ্রন্থে বলেন—

At Elura the most renowned monument is the Kailasa. ....The main temple and most of its Chapels are Shiva. The best-known relief represents Shiva and Parbati upon mt. Kailasa, Ravana, below attempting to shake the mass from within and Shiva steadying it with the pressure of his foot—a magnificent dramatization of the forces of strain and resistanne at work in the earth's crust."[১]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অজন্তার চিত্র ও ইলোরার স্থাপত্য শিল্পে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের দৃশ্য, গিধ্ররাজ জটায়ুর রাবণকে বাধা দানের চেষ্টা এবং রাবণ কর্তৃক জটায়ুকে মৃতপ্রায় করে রাখা, বালি সুগ্রীবের যুদ্ধ, হনুমানের লঙ্কা দহন, রাম রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগের ন্যায় চালুক্য ও রাষ্ট্রকুট বংশের পৃষ্ঠপোষকতায়ও ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছিল। অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্রের অনেকগুলি চিত্র চালুক্য রাজগণের রাজত্বকালেই অঙ্কিত হয়েছিল। বাতাপি ও পাট্টাদাকালে বৃহৎ মন্দিরও এসময়ে নির্মিত হয়েছিল। চালুক্য বংশের রাজত্বকালে পাপানাথ মন্দিরের বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে রামায়ণের কাহিনীও চিত্ররূপ লাভ করেছিল। চালুক্যরা সূর্য ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার মূর্তির সঙ্গে রামসীতার মূর্তি ও অঙ্কিত করেছিলেন। মাদ্রাজ মিউজিয়ামে চালুক্য বংশীয়দের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যে নিদর্শন রাখা হয়েছে তাতে রামসীতার মূর্তি ও আছে। বিজয় নগরে 'পেনুকোণ্ডাতে' শিবের মন্দিরে যেমন শৈব সম্প্রদায়ের নানা রকম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তেমনই হাজরা রামস্বামী মন্দিরে রামায়ণ ও ভাগবতের কাহিনী মন্দিরগাত্রে চিত্ররূপ লাভ করেছে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে রাম এবং কৃষ্ণের বাল্য-লীলাই প্রধান।

রাষ্ট্রকুটযুগে ইলোরায় কৈলাসনাথের মন্দির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটির শিল্প সৌকর্য যে কোন যুগের যে কোন জাতির গৌরবের

Introduction To Indian Art, Ananda Koomarswami. 2nd Ed, 1956. p 41.

বস্তু বলা যেতে পারে। এই মন্দিরের মুখ্য দেবতা শিব। একখানি বিরাট পাথর খোদাই করে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। ইহার সৌন্দর্য এখনো মানুষের মনকে মুগ্ধ করে। ইলোরায় কৈলাসনাথের মন্দিরে খোদায় করা বিভিন্ন রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে কৈলাস পর্বতের সানু দেশে একটি গুহার মধ্যে বন্দী রাবণের আস্ফালনের দৃশ্য রামায়ণ কাহিনীর বিভিন্ন উৎসের মধ্যে আর একটি উৎসের সন্ধান দেয়। এই চিত্রটিতে কৈলাস পর্বতের উপরে দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতী ও তাঁর অন্যান্য অনুগামীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। পর্বতের তলায় একটি গুহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে পরাজিত করে শাস্তিস্বরূপ বন্দী করে রেখেছেন। রাবণ তার দশমুণ্ড কুড়ি হাতে পর্বতটিকে উপড়ে ফেলতে চায়। এই চিত্রের কাহিনীর সঙ্গে গ্রীক পুরাণের টিটানের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। রাবণও মাঝে মাঝে টিটানের মত প্রচণ্ডবেগে পর্বতটাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। এই ঝাঁকুনির ফলে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। সম্ভবতঃ এই চিত্রটি ৭৫৩—৭৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই চিত্রটি সম্বন্ধে জীমার তাঁর The Art of Indian, Asia গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

Beneath is a cave, which is parts of the rether world, Under the roots of the giant mountain when"Where Ravana, King of the demon monsters, is imprisoned, with his ten heads and twenty arms. For according to the epic story in the Ramayana Ram pursued, and Conquered Ravana after he had abducted Sita, Rama's wife, and in punishment for his crime he was imprisoned in the nether-world, held down by the weight of mount Kailasa-like the titans in Greek mythology when they had been conquered by the Gods."[১]

কৈলাসনাথ মন্দিরে বন্দী রাবণের মূর্তিটিতে আর্য রামের সঙ্গে অনার্য রাবণের সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শক্তিশালী আর্যদের কাছে

অনার্যরা পরাজিত ও বন্দী হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে শৌর্য বীর্যের অভাব ছিল না। পরাজিত ও বন্দী অবস্থায় ও তারা যে তাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে বন্দী রাবণের চিত্রটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে জম্মুর ডোগরা পাহাড়ে অঙ্কিত রামায়ণের কয়েকটি চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। চিত্রগুলির মধ্যে উল্লসিত বানর সেনার সেতু পার হয়ে লংকা জয়ের দৃশ্য এবং গুহক ও রামের মিলন দৃশ্যের চিত্র দুইটি শিল্প-সৌকর্যের অপূর্ব নিদর্শন। নাকমুখ ও চোখের গড়নে চিত্রগুলি একেবারে মিখুঁত। রাজপুত ও পারসীয়ান শিল্পের সংমিশ্রণে জম্মুর এই অপরূপ চিত্রশিল্প গড়ে উঠেছে। ডোগড়া পাহাড়ে অংকিত এই চিত্রগুলির শিল্পরীতি সম্বন্ধে বেঞ্জামিন রোলান্ড, The Art and Architecture of India গ্রন্থে বলেন—

"The style, from the point of view of figure-drawing and compositional arrangement, is enormously more complicated than that of Rajasthani painting. There is an almost persian quality in the delicacy of drawing and freshness of colouring which may be a reflexion of contemporary Mogul styles" ১

দক্ষিণ ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে রাষ্ট্রকূট ও চোল বংশীয় রাজারা বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, ত্রিবাংকুর কোচিনে মট্টনচেরী রাজপ্রসাদের সুপ্রশস্থ সভাগৃহে শুদ্ধান্তপুরে রামচরিত ও কৃষ্ণলীলার চিত্র অংকিত হয়েছিল। কেরলের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমে শ্রীপদ্মনাভ বিষ্ণু মন্দিরের তুঙ্গ তোরণ শোভিত মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রকলায় বিষ্ণু, শিব ও কুম্ভলীলার সঙ্গে সঙ্গে রামলীলার কাহিনী উৎকীর্ণ হয়েছে। মন্দিরের উপরের দিকে দেওয়ালচিত্রে অশোকবনে বন্দিনী সীতাদেবীর বিষাদ প্রতিমা অংকিত হয়েছে। নীচে সবটা দেওয়াল জুড়ে বিশাল দণ্ডকারণ্য। মাদ্রাজের ত্রিনোভেলী জেলায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অংকিত রামসীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের কতকগুলি ত্রিভঙ্গ ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া

১। The Art And Architecture of India, B. Rowland. Great Britain, 1953, 3rd Ed, P-204.

গেছে। রামলক্ষ্মণের হাতে ধনুর্বাণ নেই, কিন্তু হাত দুটি রয়েছে ধনুর্ধারণ মুদ্রায়। প্রতিটি মূর্তি পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান, সীতার দক্ষিণ হাত নিচের দিকে নামানো। বাম হাতটা রয়েছে বুকের কাছে। হনুমানের বাম হাত কোমরে, ডান হাত মুখের কাছে। প্রতিটি মূর্তিই রত্নালংকার শোভিত। মাদ্রাজের ত্রিনোভেলী জেলায় রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রের আর কয়েকটি ব্রোঞ্জ-মূর্তি পাওয়া গেছে। একটি চিত্রে রামলক্ষ্মণ সীতা ও হনুমান রয়েছে। রামের একপাশে সীতা আর এক পাশে লক্ষণ। হনুমানের দুই হাতে দুইটি শিবলিঙ্গ। শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধে স্থাপনের জন্য শিবলিঙ্গ হনুমানকে দিয়ে আনিয়েছিলেন। মাদ্রাজের মহাবলিপুরের বিষ্ণুমন্দিরে রামচন্দ্র ও হনুমানের একটি পাথরের খোদাই মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিটিতে ধনুর্ধারী রামের পাশে অঞ্জলিবদ্ধ হনুমান রামের বন্দনা করছে। ত্রিবান্দ্রমে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং হনুমানের একসঙ্গে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা একটা মূর্তি পাওয়া গেছে। ত্রিবান্দ্রমের আর্টমিউজিয়ামে মূর্তিগুলির ফটোগ্রাফি সংরক্ষিত হয়েছে।

বাংলার মন্দিরগাত্রে, চালচিত্রে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকচিত্র বাংলার নিজস্ব চিত্রশিল্পের পরিচয় বহন করে। এই টেরাকোটা বা পোড়া-মাটির ফলক চিত্রগুলির মধ্যে কবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ কাহিনী এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে। মন্দিরগাত্রে ও চালচিত্রে অঙ্কিত বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে রাম রাবণের যুদ্ধ ও শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসন আরোহণের দৃশ্যই বেশীর ভাগ দেখা যায়। অন্যান্য চিত্রও আছে তবে সেগুলির বেশীর ভাগই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। রামায়ণ কাহিনীর চিত্রায়িত পোড়ামাটির চিত্রশিল্পগুলি পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম. মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী ও হাওড়া জেলায় অধিক উন্নতি লাভ করেছে। বীরভূম জেলার ইলামবাজারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের চাতালে, মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে রথারোহী রাম রাবণের যুদ্ধের চিত্র. বনবাস থেকে ফিরে আসার পর সীতাসহ রামের সিংহাসন আরোহন ও শ্রী রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার চিত্র দেখা যায়। বীরভূম জেলার জয়দেব কেঁদুলীতে জয়দেব মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে রামরাবণের যুদ্ধে বানরসেনাদের রামচন্দ্রকে সাহায্য করার চিত্র, রথারোহী রামলক্ষ্মণ. দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত রাবণের দিকে বাণ বর্ষণ করার চিত্র, এ ছাড়া রামচন্দ্রের বানর সেনাদের কেউ গাছের ডাল, কেউ পাথরের টুকরো নিয়ে বানর

সেনাদের সংগে যুদ্ধ করার বীরত্ব ব্যঞ্জক চিত্র অংকিত হয়েছে। চিত্রগুলির মধ্যে একটা নাটকীয় লক্ষণও আছে। এছাড়া বীরভূম জেলার সুরুলের সুরুল মন্দিরে পোড়া মাটির ফলকচিত্রে হনুমানের সীতান্বেষণ চিত্র রাবণের চেড়ীদের হাতে সীতার লাঞ্ছনার দৃশ্য অংকিত হয়েছে। আর একটি চিত্রে বিভীষণ সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে ফেরত দিতে বলায় রাবণ পদাঘাতে তাকে বিতাড়িত করার দৃশ্য এবং হনুমানের লংকা দাহনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। সুরুলের আর একটি মন্দিরে রামলক্ষণ সীতার বনগমনচিত্র ও রামচন্দ্রের সিংহাসন আরোহনের চিত্র অংকিত হয়েছে। চিত্রটিতে সীতাকে বাঙ্গালীর গৃহস্থ বধূর মত দেখাচ্ছে। নদীয়া জেলার চাকদায় পালপারা মন্দিরে রাম-রাবণের যুদ্ধের ঘটনা, সীতাহরণ হনুমানের লংকা দাহন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার পাতাল প্রবেশ ও লবকুশের রামায়ণ গান প্রভৃতির জীবন্ত চিত্র অংকিত হয়েছে। বাংলার মন্দিরগাত্রে অংকিত চিত্রগুলি রামায়ণের এক একটি খণ্ড চিত্র হলেও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পারস্পরিক একটা যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। নাটকীয় ব্যঞ্জনা ও বীর রসের প্রাধান্যে চিত্রগুলির একটা বাস্তবায়িত রূপও লক্ষ্য করা যায়। ভারতশিল্পে বাঙালীর পোড়ামাটির চিত্রশিল্প বিশেষ গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। এর উপকরণ অতি সামান্য কিন্তু শিল্প নৈপুন্যে যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পের সমকক্ষতার দাবি রাখে।

পৃথিবীতে মানবজাতি দুইটি উপায়েপ্রাধান্য লাভকরেছে। একদল সার্বজনীন উদার মানবতাবাদ, ত্যাগ স্বীকার ও উচ্চ নৈতিক আদর্শের দ্বারা, দ্বিতীয় শৌর্য-বীর্য-ভোগ ও ঐশ্বর্যের চরম বিকাশের পথে বিশ্ব ব্যাপী শক্তির দম্ভ প্রকাশ করে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভারতবর্ষ ত্যাগের আদর্শে বড়। ভারতবাসী এই ত্যাগের আদর্শ তার জীবন থেকে পেয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি ধর্ম। ভারতীয় সভ্যতায় আচার-ব্যবহার, রাষ্ট্রবিধান সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সমস্তই ধর্মের উপর নির্ভরশীল। বৈদিক ঋষি ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—" লোকধারয়তি ধর্ম।" যা মানব জীবনকে ধারণ করে তাই ধর্ম অর্থাৎ চেতনার বাহনের নাম ধর্ম—ধর্ম মানব জীবনে উত্তরোত্তর চেতনার বিকাশ ঘটায়। এই ধর্ম কেবল ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রচারিত ধর্ম নয়। ভারতীয় ঋষির চিন্তায় উপলব্ধ এক শাশ্বত সত্য থেকে এর উদ্ভব। বিরাট মহীরূহের মত বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করে ভারতীয় জনজীবনের মর্মস্থলে এই ধর্ম প্রবেশ লাভ করে আন্ত প্রবাহিনী ফল্গু

ধারার ন্যায় জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও পরিশোধিত করে আসছে। এর বহু শাখা-প্রশাখা বহু কাণ্ড, কিন্তু মূলতঃ তা এক এবং অভিন্ন। তাই ভারতীয় সনাতন হিন্দুধর্ম বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও সূর্যোপাসক, পারসিক, খ্রীষ্টানও মুসলমান ধর্মকেও ভারতীয় হিন্দু ধর্ম স্বীয় উদার নীতির দ্বারা সাঙ্গীভূত করে নিতে পেরেছে। আবার এই ধর্ম যখন বিকারগ্রস্ত হয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অধঃপতন দেখা যায়। জাতীয় জীবনকে এই অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সমাজের প্রয়োজনে সমাজ দেহে ধর্মের নবরূপায়ণ ঘটে। রামায়েৎ সম্প্রদায় বা রামভক্ত সম্প্রদায় ভারতীয় সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের এরূপ একটি নবরূপায়ণ। উদার বৌদ্ধধর্ম এককালে শুধু ভারতবর্ষে নয়—ভারতের সীমা ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল কিন্তু আজ তা স্বদেশেও অবলুপ্তির পথে চলেছে। ভাগবত বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্তধর্ম এবং শৈব ধর্মও কালপ্রবাহে নীতি ভ্রষ্ট হয়ে নৈতিক পতনের চরম সীমায় উঠেছিল। বহতা নদীর মত ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে একটা পরিবর্তনের প্রবাহ চলতে থাকে। যার ফলে পুরাতন জরাজীর্ণ মোহান্ধকার দূর হয়ে নবধর্মের প্রবর্তনায় সমাজ সুচিস্নাত হয়। ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের এমন একটি নৈতিক উচ্চ আদর্শসম্পন্ন পরিশুদ্ধ রূপ হল রামায়েৎ বৈষ্ণব ধর্ম বা রামভক্ত সম্প্রদায়। (Rama sects)

রামায়েৎ বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক কে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এক হিসাবে কবি গুরু বাল্মীকিকেই এই ধর্মের প্রবর্তক বলা যেতে পারে। ভারতীয় জনজীবনে বাল্মীকির রামচরিত্র যে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে জগতের ইতিহাসে তা দুর্লভ। কবি মানব চরিত্র অংকন করতে গিয়ে মানবকেই দেবতা করে তুলেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ও বাল্মীকির মুখ দিয়ে বলেছেন—

"তুলিব দেবতা করি মানুষেরে
মোর ছন্দে গানে।"

তিনি আদর্শ মানব চরিত্র অংকন করেছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র ভারতবাসীর অন্তরে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ভারতবাসী রামচন্দ্রকে দশ অবতারের এক অবতারে পরিণত করেছে। রমোয়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রের এই দেবত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে—

"ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা সরাণাং বিষ্ণুরাত্মবাণ।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশারথং নৃপম্‌ ॥১

অবশ্য আদি ও উত্তর কাণ্ড বাল্মীকির পরবর্তীকালের রচনা, মহাভারত, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বৃহৎসংহিতা, রঘুবংশ প্রভৃতিতে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে রামভক্তিবাদ উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেবল নৃপতি কুলশেখর আলবার তাঁর ইষ্টদেবতা রামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করে যে সকল ভক্তিসঙ্গীত রচনা করেছিলেন তা আজও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে অমিতগিরি নামক একজন জৈন লেখক রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার রূপে দেখিয়েছেন। তাঁর ধর্ম পরীক্ষা পুস্তকেও অনুরূপভাবে রামচন্দ্রেয় উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র জগৎ পালক সর্বজ্ঞ বিষ্ণুরই অবতার। ব্যাপকভাবে রামভক্তি শাখার প্রচার ও রামপ্রতিমার পূজা প্রচলন সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। অনেকে মনে করেন রামানুজই রামভক্তি শাখার প্রবর্তক। রামানন্দ সর্বসাধারণের কাছে তা পেঁীছিয়ে দিয়েছেন। কবির, দাদু, রামানন্দ এঁরা রামায়েৎ সম্প্রদায়ের একটি সার্বজনীন উদার মানবতাবাদী রূপ সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচার করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে রাম প্রতিমার পূজা প্রচলিত ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন—" দীর্ঘকাল পরে প্রায় খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী হইতে কৃষ্ণ ভক্তি শাখার অনুরূপ রাম ভক্তি শাখার অভ্যুত্থান হয় বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১১১৭ খ্রীঃ অব্দে সুদূর কাশ্মীরে রামদেব নামক একজন বৌদ্ধ নৃপতি অরিগোম (শ্রীনগরের ১৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত) নামক স্থানে নূতন করিয়া রামচন্দ্রের মন্দির সংস্কার করাইয়া ছিলেন, অর্থাৎ তাহার পূর্বেও রামচন্দ্রের মন্দির বা বিগ্রহ ছিল। নৃপতি রামদেব তাহারই সংস্কার করেন।[২] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আনন্দতীর্থ বা মাধবচার্যের ইতিহাসে আবার রামপ্রতিমা পূজার প্রচলন দেখা যায়। মাধবাচার্য নিজে বদরিকাশ্রম থেকে একটি রামপ্রতিমা সংগ্রহ করেন। এছাড়া তাঁর

শিষ্যকে দিয়ে পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্র থেকে ও দুইটি রামসীতার প্রতিমা আনিয়েছিলেন। এই শতকেই হেমাদ্রী নামক একজন লেখকের ব্রতখণ্ড নামে একটি 'রামব্রতকথা' পাওয়া যায়। এতে চৈত্র শুক্লা নবমী তিথিতে রাম পুজার বিধি বিধান দেখা যায়। আজও উত্তর ভারতে রামনবমী পুজার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। চতুর্দশ শতকে অধ্যাত্ম রামায়ণ নামে কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখকের একখানি রামায়ণ পাওয়া গেছে। রামের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা এবং রামায়েৎ ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর একটি অংশ রামগীতা নামে খ্যাত। রামগীতা ভগবৎ গীতার অনুকরণে রচিত। পুস্তকটিতে লক্ষ্মণকে উপদেশ দেওয়ার ছলে রামভক্তি ধর্মের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও একখানি রামগীতা পাওয়া গেছে তাতে আছে সীতার মুখে হনুমানকে উপদেশ দান। অধ্যাত্ম রামায়ণের তত্ত্বাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে তুলসীদাস তাঁর অমরকাব্য রামচরিত মানস রচনা করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রাম-সীতার কাহিনী অবলম্বন করে পদ রচনা করেন। হরপার্বতীর মত রামসীতাও তাঁর উপাস্যদেবতা ছিল। উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই এভাবে রামকাহিনী, রাম মূর্তির পুজা ও রামগীতা প্রচারিত হতে দেখা যায়। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামানন্দের রামারেৎ সম্প্রদায় সমগ্র উত্তর ভারতে রামভক্তিবাদের প্লাবন সৃষ্টি করে। বল্লভাচার্য যেমন কৃষ্ণায়েৎ বা কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, রামানন্দ ও তেমনি রামায়েৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এই নব ধর্মের প্লাবনে ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন নব প্রাণ রসে সঞ্জীবিত হয়। এক কথায় ভারতীয় জন-জীবনে তিনি সর্বভারতীয় ভাবধারার প্রবর্তন করেন। রামানন্দ রামায়েৎ সম্প্রদারের মধ্যে থেকে ভারতীয় হিন্দু জাতির দুষ্টক্ষত জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত করেন। এই দিক থেকে রামানন্দকে মধ্যযুগীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের প্রবর্তক বলা যায়। রামানন্দ প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে একমাত্র রামমোহন প্রবর্তিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিগত ত্রিমুখী আন্দোলনের তুলনা চলে। রামানন্দ প্রবর্তিত ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করে, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন ও রামানন্দের সঙ্গে রামমোহনের তুলনা করে বলেছেন—আধুনিক কালে ভারতীয় ইতিহাসে রামমোহনের যে স্থান, মধ্যযুগের ইতিহাসে রামানন্দেরও সেই স্থান বললে অত্যুক্তি হয় না।[১]

রামানন্দের জীবন চরিত আজ ও অজ্ঞাত। কেবল এই টুকু জানা যায় যে কনৌজের ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কাশীতে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি রামানুজ আচার্য প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যোগ দান করেন। কিন্তু সেখানে ধর্মীয় অনুদার নীতি ও বিভিন্ন সামাজিক কারণে স্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর মতভেদ উপস্থিত হয়। তিনি অপমানিত হয়ে উত্তরভারতে প্রত্যাবর্তন করে সার্বজনীন উদার এক নব সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন! রামানন্দ প্রবর্তিত এই নব আবির্ভাবের ইতিহাসের সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতীয় রাজনৈতিক কাঠামো বিশেষ ভাবে জড়িত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলমান শক্তি প্রাধান্য লাভ করার পর ভারতীয় হিন্দু সমাজ কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সব দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষে এমন কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা সমস্ত সংকীর্ণতার গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে মানবতাবাদের উচ্চ আদর্শে সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন। অপরদিকে রক্ষনশীল হিন্দু সমাজের স্মার্ত পণ্ডিতেরা কঠোর সামাজিক বিধি-বিধান প্রয়োগ করে বৈদেশিক স্পর্শ বাঁচিয়ে সমাজ রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠেন। রক্ষনশীল ও উদার নীতির বিরোধের ফলেই রামানন্দ দক্ষিণভারত থেকে উত্তর ভারতে ফিরে আসেন। কারণ দক্ষিণ ভারতে রামানুজাচার্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তি ও মুক্তির সমানাধিকার স্বীকৃতি পেলেও বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে বর্ণবৈষম্য বিদ্যমান ছিল। রামানন্দ ভারতীয় বৈষ্ণব সমাজের ধর্মসাম্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সাম্য ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

"Ramananda now began a radical reform and made no distinction between Brahmanas and members of the degraded castes, and all could even dine together provided they were devotees of Vishnu and had been admitted into the fold".[১]

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র শাসিত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে এই দারুণ দুঃসাহসিকতার কাজে একমাত্র গৌতম বুদ্ধ ছাড়া কারও সঙ্গে

১। Vaishnavism, Saivism And Minor Religious systems, R. G. Bhandākar, Indological Book House, P-66

তাঁর তুলনা হতে পারে না। গৌতমবুদ্ধের ন্যায় রামানন্দেরও সকল বর্ণের শিষ্য ছিল। তাঁর বারজন শিষ্যদের মধ্যে একজন নাপিত (তাঁর নাম সোনা), একজন চামার (নাম রুইদাস) একজন মুসলমান জোলা (নাম কবীর)। বুদ্ধের ন্যায় রামানন্দও নারীর ধর্মচর্চায় স্বাধীনতা স্বীকার করেছিলেন এবং পদ্মাবতী ছিলেন তাঁর নারী শিষ্যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামভক্ত সাধক, সর্ব প্রথমে এভাবে যে ধর্ম ও সামাজিক মুক্তির দ্বার সকল সম্প্রদায়ের নিকট খুলে দিলেন এর একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। বাল্মীকি রচিত রামায়ণের মধ্যে এই মুক্তির বীজ নিহিত ছিল। নিষাদরাজ গুহ রামচন্দ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণের—

"তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা ।।
নিষাদ জাত্যো বলবাণ স্বপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ ।।"৩৩
তমার্তঃ সম্পরিস্বজ্য গুহো রাঘবম্ ব্রবীৎ ।
যথাযোধ্যা তথেদং তে রাম কিং করবাণিতে ।।২৩৬

সেই প্রদেশে নিষাদ জাতীয় স্থপতি বলে বিখ্যাত বলবান গুহ নামে রামের প্রাণতুল্য প্রিয়সখা এক রাজা ছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁর রাজ্য মধ্যে এসেছেন শুনে তিনি বৃদ্ধ জ্ঞাতি ও অমাত্যগণে পরিবৃত হয়ে রামকে আলিঙ্গন করে বললেন, অযোধ্যা নগরে আপনার যে রকম অধিকার, আমার রাজ্যেও আপনার সেরকম অধিকার। রামানন্দ প্রবর্তিত রামারেৎ সম্প্রদায় উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে ভারতের প্রত্যেকটি অঞ্চলে এই ধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে বাংলায় চৈতন্যদেব রামানন্দের মতই বলতে পেরেছিলেন—"চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ"। তিনিও রামানন্দের মত যবন হরিদাসকে তাঁর শিষ্য করেছিলেন। উত্তর প্রদেশে কবীর, পাঞ্জাবে নানক এবং মহারাষ্ট্রে একনাথ সকলেই বর্ণবৈষম্যের মূলে আঘাত করে হিন্দুসমাজের জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। তাছাড়া মুসলমান শিষ্য গ্রহণ করে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেছিলেন।

সমাজিক ব্যাপারের ন্যায় নৈতিক ব্যাপারেও রামানন্দের প্রবর্তিত ধর্ম দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছিল। দেশে যখন কৃষ্ণায়েৎ সম্প্রদায়ের

বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, অযোধ্যাকাণ্ড,৫০।৩২।৩৬, পৃঃ ২৬৯

কৃষ্ণকে আচ্ছন্ন করে রাধার প্রাধান্য সমগ্র দেশের চিত্তকে মোহগ্রস্ত করছিল তখন রামানন্দ রাধাকৃষ্ণের পরিবর্তে রামসীতার উন্নত আদর্শকে জাতির সামনে তুলে ধরে হিন্দু জাতির পারিবারিক জীবনকে কলুষমুক্ত করলেন। রামভক্তির প্রভাব জাতীয় জীবনকে কি ভাবে প্রেরণা দিয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লোক সাহিত্য প্রবন্ধে তার পরিচয় দিয়েছেন—

"রামায়ণ কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চাঙ্গের হৃদয় বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্ব প্রকার হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্ম নিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোন দেশে কোন সাহিত্যে নেই। বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"[১] সুপরিকল্পিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের স্বরূপ বর্ণনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তরের অনুসরণ করিয়া আপনার পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। কবি তাঁহার প্রতিভাব দ্বারা তাহাকে এক জায়গায় ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তখন সর্ব সাধারণের ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ হইল।

রামায়ণের আদি কবি গার্হস্থ্য প্রধান হিন্দু সমাজের যত কিছু ধর্ম্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে পতিরূপে বন্ধুরূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষাকর্তারূপে। অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমান করিয়াছিলেন"।[২]

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিকী সং, পঃবঃ সঃ ১৩৬৮, পৃঃ ৭৩৩-৭৩৪,।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৯০।

রামানন্দ এই সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শকেই দেশের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। রামানন্দ ভাবাবেগ ও অনুষ্ঠানাদির পরিবর্তে যুগ নিষ্ঠাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সন্ন্যাসের নিষ্ক্রীয়তা অপেক্ষা কর্তব্যনিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাছে বড়। কেবল ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে নয় ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়েও রামানন্দের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় তিনি বিদ্বৎজনের ভাষা ও সংস্কৃতের পরিবর্তে সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা হিন্দীকে তাঁর নব ধর্ম প্রচারের বাহন রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই দিক দিয়ে তিনি শাস্তা গৌতম বুদ্ধের পথ অনুসরণ করেছেন। গৌতমবুদ্ধ ও সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বা প্রাকৃতজনের ভাষায় উপদেশ দিতেন। রামানন্দ হিন্দীতে অতি সহজ সরল ভাযায় রামচন্দ্রকে নিয়ে কতকগুলি পদ রচনা করেন। তাঁর পরে অনেক কবি রামচন্দ্রের জীবন কাহিনী নিয়ে বহু গীতি কবিতা ও কাব্য রচনা করেন। রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে কাব্য বা গাথা রচিত হয়েছিল তা রামভক্তি স্কুল অব পোয়েট্রি (Rama Bhakti School of Poetry) নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কবি তুলসীদাসই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' কাব্যের মাধ্যমে সারা উত্তর ভারতে রাম ভক্তিবাদের এক অপূর্ব প্লাবন দেখা দেয়—ভক্তির বন্যায় সারা দেশ ভেসে যায়। হিন্দুর গীতাও খ্রীষ্টানের বাইবেলের মত তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' কাব্য সমগ্র উত্তর ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠন-পাঠন হত। তুলসীদাসের' রামচরিত মানস' কাব্যের মত কোন পুস্তক এত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। আর তুলসীদাস তাদের কাছে কেবল একজন হিন্দী কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সন্ত ব্যক্তি। তুলসীদাসের এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে রাম ওয়াধ দ্বিবেদী বলেন—

"Tulsidasa is to them not only the greatest Hindi poet but also the saint of saints, and true devotee of Rame. Thus his voice has a two fold authority and his nama is not only dear but sacred to Hindus.[১] "

ভক্তমাল অনুযারী তুলসীদাস রামসীতার ভক্ত ছিলেন। তাঁর হিন্দী

১। Hindi Literature, R. A. Dwivedi, Ist Ed, 1953, p. 49-50

রামায়ণ ভক্ত ভারতবাসীর অতি আদরের বস্তু। শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনি একবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বানরের উৎপাতে বাধ্য হয়ে সম্রাট তাঁকে মুক্তি দেন। মুক্তি লাভ করে তিনি বৃন্দাবনে বাস করতে শুরু করেন। এর পর থেকে তিনি রামসীতার পূজা শুরু করেন। বৃন্দাবন থেকে তিনি বেনারসে আসেন এবং তাঁর বিখ্যাত রামায়ণ রচনা শুরু করেন। ইহা ছাড়া তিনি রামগুণাবলী নামে আরও কতকগুলি রামপ্রশস্তিমূলক কাব্য রচনা করেন। বেনারসে তিনি রামসীতার একটি মন্দিরও তৈয়ার করান। তুলসীদাসের রামচরিতমানস কাব্য একখানা ভক্তির আকর গ্রন্থ। ইহা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি করেনা বরং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে। তিনি তাঁর রামচরিতমানস কাব্যে শিবের সঙ্গে রামের পূজা প্রচলন করতে চেয়েছেন। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর এই দূরদৃষ্টি ছিল বলে উত্তর ভারত এ সময়ে ধর্মীয় ক্লেশ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। রামচরিত মানস কাব্য মধ্যযুগে দিগভ্রান্ত মানুষকে পথ দেখিয়েছে। ইহাতে কেবল ধর্মীয় কাহিনী শোনান হয়নি। তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্ম জীবনের সমন্বয় সাধন করতেও চেয়েছেন। পার্থিব জগতে এই কাব্য মানুষকে সদভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। মধ্যযুগে তুলসীদাসের বিরাট প্রতিভার কাছে অন্যান্য রামচরিত গ্রন্থগুলি ম্লান হয়ে আছে। রামান্দীপন্থীদের মধ্যে ভক্ত কবির, আগ্রাদাস, নাভাজী, প্রভৃতি কবিরা রামভক্তিবাদের কাব্য রচনা করেন। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ চাঁদ চৌহানের রামায়ণ মহানাটক ১৬২৩ খ্রীঃ অঃ হৃদয়রামের হনুমান নাটক উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মহান্ত রামচরণ দাস, বাবা রঘুনাথ, রেওয়ারের রাজা রঘুনাথ সিং রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাক চৈতন্য যুগে রামায়ণ

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুই জাতীয় মহাকাব্য যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ও জনজীবনকে এই দুই মহাকাব্য প্রভাবিত করে আসছে, ভারতীয় জীবন ধারার প্রতিটি স্তরে রামায়ণের প্রভাব অসাধারণ। সুদূর হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতের প্রতিটি প্রান্তরে, প্রতিটি জনপদে রামায়ণ কাহিনী সমাদৃত এবং জাতির জীবস রসধারায় আজও পরিপুষ্ট, পরিবর্ধিত। রামকথা, রামায়ণ কাহিনী বাঙ্গালীর ঘরের কথা। শ্রীরামচন্দ্র বাঙ্গালীর অন্তরের দেবতা। রামায়ণের চরিত্র বাঙ্গালীর মানস লোকের আদর্শ। তাই কৃত্তিবাস কবির রামায়ণ রচনার পূর্বে যখম রামায়ণের অমৃত নিষ্যন্দী কাহিনী সংস্কৃত ভাষার আবরণে আবৃত ছিল তখনও বাঙ্গালীর জীবনে রামায়ণ চর্চা ব্যাহত হয়নি। বাঙ্গালীর লোকসঙ্গীতে লোক কথায়, যাত্রা পালা-গান, পুঁথিপত্রে কথকথায় পটুয়া সঙ্গীতে, সর্বত্রই রামায়ণ কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল।

সংস্কৃত ভাষায় বাঙ্গালীর প্রথম রামায়ণ চর্চা শুরু হয় অভিনন্দের রামচরিত গ্রন্থে। গ্রন্থটিতে রামচন্দ্রের পূজার দ্বারা নয়—হনুমানের মুখে স্তবে দেবী মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। রামপালের মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দীও একটি রামচরিত কাব্য লিখেছিলেন। আত্ম-পরিচয়ে তিনি নিজেকে কলিকাল-বাল্মীকি বলে অভিহিত করেছেন। এই গ্রন্থখানি এক অর্থে রামায়ণ কাহিনী, আর এক অর্থে রামপালের কীর্তি। মুরারী মিশ্রের 'অনর্ঘ রাঘব' গ্রন্থটিও বাঙ্গালীর রামায়ণ চর্চার আর একটি বিশেষ নিদর্শন। এ ছাড়া রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে কৈকয়ীভরত, কৃত্যারাবণ ও বালিবধ প্রভৃতি নাটকও রচিত হয়েছিল।[১]

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বাংলা ভাষা যখন মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রূণের ন্যায় প্রাকৃতের খোলসের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তখনও বাঙ্গালী সাহিত্য রচনায় রঘু-কুলপতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন। পিঙ্গলাচার্যের প্রাকৃত ভায়ায় রচিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' গ্রন্থের আশীর্বচন পুষ্পিকায় রাধাকৃষ্ণ,হরগৌরী,গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকেও বন্দনা করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র এখানে মানবশ্রেষ্ঠ নহেন—তিনি মানবজীবনের বিঘ্নহন্তা, বিপদতারণ, কল্যাণের দেবতারূপে বন্দিত হয়েছেন—

''দীহা বীহা কামো রামো ।। ৩ ।।
জহা জুঝ্ঝে সুভভং দেউ[১] ।। ৪ ।। কাম।

অনুবাদ—হে পরম পুরুষ পরম সুন্দর রাম, যেখানে দুঃখ যেখানে যুদ্ধ বা জীবন সংগ্রাম সেখানেই তুমি চির মঙ্গলময়ী রূপে বিরাজ কর।

অন্যত্র আছে—

''জহা, বপণতা উক্তি সিরে তিনি লিজ্জতা
তেজ্জিতা রজ্জ বণন্ত চলে বিণু
সোঅর সুন্দরি সঙ্গহি লগ্গিতা
মারু বিরোধ কবন্ধ তহা অণু।
মারুই মিল্লিতা বালি বিংহভিতা
রজ্জ সুগীবহ দিজ্জ অকণ্ট অ
বন্ধু সমুদ্দ বিনাসিতা রাঅণ
সো তুতা রাহব দিজ্জউ নিভভতা'' ।।
।। কিরীট ।।[২]

অনুবাদ—পিতৃবাক্য শিরোধার্য করে সোদর ও সুন্দরী (শ্রী) সঙ্গে লয়ে যিনি বনান্তে চলেছিলেন, বিরাধকে, কবন্ধকে মেরেছিলেন, মারুতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বালি বধ করে অকণ্টক রাজ্য সুগ্রীবকে দিয়েছিলেন এবং সমুদ্র বন্ধন করে রাবণকে মেরেছিলেন সেই রাঘব তোমাদের নির্ভয় দান করুন।

১। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্, পিঙ্গলচার্য,
With Commentaries of Biswa Nath Panchanan,
Baptist Mission Press, 1902.পৃঃ ৩৪৪

২। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ৫৭৬।

গাথাসপ্তশতী দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন নৃপতি হালের রচিত বলে পরিচিতি লাভ করলেও বহুলোকের হস্তাবলেপে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বহু বৈচিত্রপূর্ণ লৌকিক প্রেমকাহিনীর মধ্যেও কবি এখানে রামায়ণের আদর্শ চরিত্র লক্ষ্মণের কথা স্মরণ করেছেন—

"দিঅরস্স অসুদ্ধ-মনস্স কুলম্বহু নিজ কুড্ভ লিহি আইং।
দিঅহং কহেই রামানুলগ্ন-সৌমিত্তি-চরি আইং [১] ॥ ৩৫ ॥

এখানে দুষিত চিত্ত দেবরের কাছে কুলবধূ, রামানুরক্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের চরিত্র বর্ণনা করে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করছে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে সেন রাজাদের রাজত্বকালে রাজসভায় ও সমস্ত সভায় বাঙ্গালীর রামায়ণ চর্চা অব্যাহত ছিল। বাঙ্গালীর সমস্ত সাহিত্য কৃতিতে রামায়ণের কাহিনী উপাদান যুগিয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্রের সংকলন গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক, গল্প ও কাহিনীর মধ্যে রামায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেক শুভোদয়ার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে যে মুসলমান ফকির জলালউদ্দীন ভাব্রিজি সেক সাহেব রাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রীকে কর্মের পরিণতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে রামায়ণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন—

সেক—"রাম রাজা বর্ত ইন্দ্র বর্ষে জল।
যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য ধরে ফল"॥
মন্ত্রী—যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ
যদি না শীঘ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস [২] ॥

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় সাহিত্যের দুই পাদস্তম্ভ। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বাংলায় রচিত হয়েছিল এবং বাংলায় রচিত রামায়ণ কাহিনী প্রধানতঃ গেয় ও পাঞ্চালী কাব্য হলেও বাঙ্গালীর সকল সাহিত্য কৃতি রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবিত। চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে মনসা মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল পর্যন্ত সর্বত্রই কি চরিত্র চিত্রনে, কি ঘটনা সন্নিবেশনে রামায়ণের উল্লেখ দেখা যায়।

১। হালের গাথা সপ্তশতী, ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক প্রণীত, ১৯৫৬, পৃঃ ১৫।
২। সেক শুভোদয়া—হলায়ুধ মিশ্র দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৬১।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে মায়ামোহময় জগৎ প্রপঞ্চে মোহতরু ছিন্ন করে নির্বাণ বা বোধিলাভের কথা বলা হয়েছে। আর রামায়ণে মানবজীবনেরই জয়গান করা হয়েছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় চর্যাপদের কবি রামায়ণী ভাবনা বিযুক্ত; কিন্তু চর্যাপদগুলির গভীরে প্রবেশ করলে রামায়ণী প্রভাব বিরল দর্শন নয়। 'দশদিশ', 'দশবল', রাজা' প্রভৃতি শব্দ চয়ণে কবি রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে অনেকে মনে করেন। শুধু শব্দ চয়নে নয়, তত্ত্বগতভাবেও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সঙ্গেই চর্যাপদের সমধিক মিল রয়েছে।[১]

৩৪ সংখ্যক চর্যায় 'রাআ রাআ রাআরে অবর রাআ মোহেরে'[২] বলতে যে মোহবিষ্ট রাজাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের লীলার কাহিনীরই রূপান্তর মাত্র। লীলার আরাধ্যা দেবী জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীকে ২ সংখ্যক চর্যায় 'বিআতী' দেবী[৩] বা অবধূতিরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর সমাধিস্থ লীলার প্রতি দেবী সরস্বতীর উপদেশ—

"চিদাকাশং চিদাকাশমাকাশং চ তৃতীয়কম্
দ্বাভ্যাং শূণ্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং বরাননে ।।১০
তশ্চিদাকাশ কৌশাত্ম চিদাকাশৈক ভাবনাৎ।
অবিদ্য মানসপ্যাশু দৃশ্যতেহথানুভূয়তে ।।১১
দেশাদ্দেশান্তর প্রাপ্তৌ সংবিদো মধ্যমেব যৎ।
নিমিষেণ চিদাকাশং তদ্বিদ্ধি বরবর্ণিনি[৪] ।।১২

এই শ্লোকটিরই প্রতিধ্বনি করে ৫০ সংখ্যক চর্যায় বলা হয়েছে—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ।।
ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ-মেহেলী ।।
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড় এ সেরে কপাসু ফুটিলা[৫] ।।

১, ২, ৩। চর্যাপদ, শ্রীমনীন্দ্র মোহন বসু, কমলা বুক ডিপো, ভূমিকা পৃঃ ২ ।। ২, পৃঃ ১৬৬, ৭।

৪। যোগবাশিষ্ঠ—শ্রীমদ্বাল্মীকি মহর্ষি প্রণীতেষ, বাশুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পাণিক্‌কার সম্পাদিত ১৫শ ২০শ সর্গ পৃ ১৭১।

৫। চর্যাপদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২২১।

অর্থাৎ বাশিষ্ঠ রামায়ণে যে চিত্তাকাশ, মহাকাশ ও চিদাকাশ বা সর্বব্যাপী মহান চৈতন্যের কথা বলা হয়েছে চর্যাপদে তাকেই শূন্য, অতিশূন্য বলা হয়েছে। চিত্তস্থ সমুদয় বাসনা নিবৃত্ত করে এই চিদাকাশ বা মহাশূন্যে অবস্থান করতে পারলেই সর্বাধার অর্থাৎ সর্বাত্মক তত্ত্ব লাভ করা যায়। বাশিষ্ঠ রামায়ণের এই মূল তত্ত্ব চর্যাপদের প্রায় প্রতিটি ছত্রে অনুসৃত হয়েছে। এছাড়া ৫নং চর্যায় বর্ণিত—

''ভবণই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী।
দুআন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙকম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই [১]॥

এর সঙ্গে তুলনীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণোক্ত—

"রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা [২]॥

অর্থাৎ নদীরূপ এই ভবে দিনরাত্রি কামনাময় বিষয় তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, লয় পাচ্ছে বলে ইহা অতিশয় ভয়ংকর। কামনাময় এই ভবনদী পার হওয়ার জন্য সিদ্ধাচার্য চাটিল এক সাঁকো নির্মাণ করেছেন। চিত্তের বিষয় তৃষ্ণা দূর করে জ্ঞানলোকে এই সেতু নির্মাণ করা হয়। এই সাঁকো বেয়ে অজ্ঞান-আঁধার রূপ ভবনদী পার হওয়া যাবে।

অনুরূপভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামনামের ভেলা বেয়ে ভবসিন্ধু পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম কাহিনী হলেও রাধাকৃষ্ণকে রাম-সীতার অবতাররূপে দেখান হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কালীয় দমন খণ্ডে বলভদ্র কৃষ্ণকে পূর্বকথা স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন—

"বামনরূপেঁ তোহেম বলিক ছলিলে।
পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ॥
শ্রীরাম রূপেঁ তোহেম বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলে নিরঞ্জন॥

১। চর্যাপদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭।

কল্কিরূপে তোহ্মে দলিলে দুষ্টজন।
এবে উপাজিলা কংস বধের কারণ ॥[১]

শ্রীকৃষ্ণকে রামচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখান হলেও শ্রীরাধিকাকে সীতার সম মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বড়ায়ি শ্রী রাধিকাকে সীতার সম মর্যাদা দিতে রাজি নহেন—

"আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।
সোঁক রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥
আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।
তাক লইয়া যাই আহ্মে রাধিকার থানে[২] ॥

অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে রামচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে শ্রীরাধিকাকে বলেছেন—

"রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
আহ্মার শুন তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল।
তাহার কাটিলোঁ দশমাথা ॥
রাধা ল। আহ্মে চিন্তু নেবারিল তোরে।
বাপ বসুদেব মাত্র দৈবকী ইল মোরে[৩] ॥

রাধা বিরহ খণ্ডে, বিরহিনী রাধাকে কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করলে যুক্তিস্বরূপ রাধা বলেছেন—

বিণি দোষে কেহ নাহি তেজে রমনী।
সিতারামে দুঃখ পাইল সুন চক্র পাণি ॥[৪]

ভারতীয় নারীর সতীত্বের চরম আদর্শ সীতা। তাই সাহিত্যে যখনই নারীর সতীত্বের চরম আদর্শ দেখান হয়েছে সেখানেই সীতা চরিত্রের প্রভাব পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আইহন গৃহিনী শ্রীমতী রাধিকার চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। শ্রীরাধিকা সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী। কৃষ্ণকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। সীতা পরম- ঘৃণা ভরে রাবণের আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য

১, ২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাস, ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত, পৃ ১৩২, ১৪।

৩, ৪। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৪, ৩৩৭।

করেছেন, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় রাবণকে সিংহের কাছে শৃগালের ন্যায় মনে করেছেন। শ্রীরাধিকাও প্রথম দিকে শ্রীকৃষ্ণের অসামাজিক প্রেম ও বড়াই কর্তৃক আনীত শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুল উপহার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। চরিত্র বিকাশের প্রথম স্তরে রাধা নারীসুলভ সতীত্বের তেজে সীতার মতই তেজস্বিনী ছিলেন।

রামায়ণের কাহিনী কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে সর্বকালের সর্ব-মানবের জাতীয় সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। এই সব কাহিনী সব দেশের, সব সাহিত্যেরই আদরণীয় এবং সব দেশের, সব কবির কাব্য প্রেরণার মূল উৎস। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও মঙ্গল কাব্যের কবিগণ রামায়ণের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বাংলা দেশে রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যগুলি যেন পরস্পরের পরিপূরক। রামায়ণে যেমন দৃঢ় ও অনমনীয় পৌরুষ চরিত্রের প্রতীক রাবণ, মনসা মঙ্গলেও তেমনি চাঁদসদাগর একটি দৃঢ় অনমনীয় কঠিন চরিত্র। চাঁদের শৌর্য-বীর্য ও কাঠিন্যের সঙ্গে একমাত্র রামায়ণের রাবণ চরিত্রের তুলনা চলে। রাবণ যেমন মারীচের হিতোপদেশ, মাতামহ মাল্যবাণ, সুমালী, ভ্রাতা বিভীষণ, জননী নিকষা, ও সর্বশেষে পত্নী মন্দোদরীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছে তেমনই চাঁদসদাগর পত্নী সনকা ও পুত্র বধূ বেহুলার অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করেছে। তা ছাড়া শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীর সঙ্গে ও হনুমানের কাহিনীর মিল পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী কবি দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নারী চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে নারীর সতীত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে সীতা চরিত্রের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলার অপরিসীম দুঃখের সঙ্গে একমাত্র জনক-নন্দিনী সীতার দুঃখের তুলনা চলে। বাসরগৃহে বেহুলা হারালেন তাঁর স্বামী লখিন্দরকে। রাজনন্দিনী রাজবধূ সীতা রাবণের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও শেষপর্যন্ত রামচন্দ্র তাঁকে রাজপুরী থেকে নির্বাসিত করলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার চিরবিচ্ছেদ সূচিত হল।

সীতা রাবণগৃহে, বেহুলা জলপথে বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। বাঙ্গালী কবির বেহুলা বাল্মীকির সীতারই প্রতিচ্ছবি। অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রামায়ণের সঙ্গে মনসা মঙ্গলের তুলনা করে বলেছেন—

"মনসা মঙ্গল বাঙ্গালীর রামায়ণ। বেহুলা ইহার সীতা। চাঁদসদাগর ইহার রাবণ। সেইজন্যই ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য।[১]

মনসামঙ্গলের ন্যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও রামায়ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনা চরিত্রের সঙ্গে রামায়ণের সীতা চরিত্রের তুলনা চলে। জনম দুঃখিনী সীতা নিজের আজীবন দুঃখের জন্য কখনো স্বামী রামচন্দ্রকে দায়ী করেন নি বরং নিজের মন্দ অদৃষ্টবেই তিনি দায়ী করেছেন। খুল্লনাও জীবনের কঠোরতম দুঃখের মধ্যে স্বামীর প্রতি তাঁর প্রেম ও নিষ্ঠাকে কখনো ম্লান হতে দেননি। একটি সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে খুল্লনা চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লহনা ও খুল্লনা পরস্পরকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন। রামায়ণের মন্থরার মত দুর্বলা দাসী খুল্লনাকে নির্যাতন করার জন্য লহনাকে কুপরামর্শ দিল। দুর্বলার উপদেশ কাজে লাগল। খুল্লনাকে স্বামীর চোখে বিষ করার জন্য লহনা নানারকম মন্ত্রপুত ঔষধের ব্যবস্থা করলেন। লহনা যেন রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র। কৈকেয়ী স্বপত্নীপুত্র রামচন্দ্রকে জটাবল্কল পরিয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন। লহনা স্বামীর একটি জাল চিঠি দেখিয়ে স্বপত্নী খুল্লনাকে ঢেঁকিশালে শয়ান, একবেলা আধ পেটা আহার এবং খুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়ে বনে ছাগল চরাতে পাঠিয়েছিল। গৃহের নিরাপদ আশ্রয় থেকে যুবতী খুল্লনা বন্য প্রকৃতির শ্যামল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতা তরু-পল্লব-নদনদীর কাছে রামকে সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুনয় বিনয় করেছেন—

"আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধবং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
হংস সারস সঙ্ঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধবং সীতাং হরতি রাবণঃ[২] ॥

অনুবাদ—হে জনস্থান! হে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষসকল। আমি তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তোমরা রামকে শীঘ্র সংবাদ দাও যে রাবণ

১। বাইশ কবির মনসামঙ্গল, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ও শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৪, পৃঃ ভূমিকা ১

২। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্তই, অরণ্য কাণ্ড, পঞ্চদশ সর্গ পৃঃ ৩০-৩১।

সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। সীতার মত খুল্লনাও কোকিলকে অনুরোধ করেছেন ধনপতি সদাগরের কাছে যাওয়ার জন্য—

"সদাগর আছেন জথা কেহ নাহী জায় তথা
এই বনে ডাক অকারন ১।

সীতা ও খুল্লনা উভয়ে প্রকৃতি-দুহিতা। প্রকৃতির শ্যামশ্রীর মধ্যে উভয়েব চরিত্র মাধুর্য আরও বিকশিত হয়েছে। রাবণগৃহে বাস করার জন্য সীতাকে বার বার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। খুল্লনাকেও অন্তঃপুরের বাইরে বনে ছাগল চরানোর জন্য নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সামনে নানান পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। তাঁকে জলে ডুবান হল, সর্পদ্বারা দংশন করান হল। অবশেষে জতুগৃহে রেখে অগ্নিসংযোগ করা হল। কিন্তু তাঁর কিছুই হলনা, তিনি সতী। সতীত্বের জোরে সকল পরীক্ষায় তিনি জয়লাভ করলেন। সীতা. বেহুলা ও খুল্লনা এরা তিনজনেই প্রায় সমজাতীয়া নারী। সীতা দুঃখের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। খুল্লনা বিপদে ধৈর্যশীলা, আর বেহুলার সতীত্ব বেহুলাকে মরণ-সাগর উত্তীর্ণ করেছে।

এইভাবে দেখা যায় প্রাক্‌চৈতন্য যুগে চণ্ডী, মনসা, শিব প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বাঙ্গালী কবিরা রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রের দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এযুগের মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে কানাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত. নারায়ণ দেব, কবি জনার্দন চক্রবর্তী, মানিক দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্য পূর্ববর্তী পদকর্তাদিগের মধ্যে একমাত্র মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রামায়ণের বিষয় নিয়ে পদ রচনা করেন। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হলেও বাংলা দেশেই তাঁর অধিকাংশ পদ সংরক্ষিত হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে রস সমৃদ্ধ করেছে। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে হরগৌরী ও রামসীতার বিষয় নিয়েও কয়েকটি পদ রচনা করেছেন। রামায়ণ বিষয়ক পদগুলির মধ্যে রামসীতার বন্দনা ও রাবণের খেদোক্তি বিষয়ক পদগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"জানকী বন্দনায়" সীতার জন্ম, বিবাহ ও পাতাল প্রবেশ অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

১। কবি কঙ্কন মুকুন্দ রাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, পৃঃ ১৪৩।

"হে নর নাহ সতত ভজ্‌ তাহী।
তাহি, নহি জননী জনক নহি জাহী ॥২
বসু নই হরা সুসুরাকে নাম।
জননিক সির চাঢ় গেলি বহি গাম ॥৪
সাসুক কোর মে' সুজল জম্মায়।
সম্মধি বিলহ তো বিলহন জায় ॥৬
জাহি ওদর সে বাহর ভেলি।
সে পুনি পলটি ততয় চলি গেলি ॥৮
ভন বিদ্যাপতি সুকবী ভান।
কবিকে কবি কহ কবি পহচান[১] ॥১০

অনুবাদ—হে নরনাথ যাঁর জনক জননী নেই সতত তাঁকে ভজনা কর। বাপের বাড়ীতে বাস করে জননীর মাথায় চড়ে (পৃথিবীর মাথায় পা দিয়ে) তিনি প্রসিদ্ধ শ্বশুরের গ্রামে গেলেন। শ্বশুরের কোলে জামাই শুলেন। যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নির্দিষ্ট থাকে তার সঙ্গেই সম্বন্ধ হয়। যে গর্ভ থেকে তিনি বের হয়েছিলেন আবার সেই গর্ভেই তিনি ফিরে গেলেন। অর্থাৎ (ভূতলে প্রবেশ করলেন) সুকবি বিদ্যাপতি বলেছেন—কবিকে কবি বলেন, কবি তাহা বোঝেন।

অপর একটি পদে শ্রীরাধার বিরহ বর্ণনার অনুবরণে কবি জানকীর বিরহ বর্ণনা করেছেন—

"কুসম রস অতি মুদিত মধুকর
কোকিল পঞ্চম গাব।
ঋতু বসন্ত বিদেস বালভ্‌
মানস দহো দিস ধাব সাজনিআ।
তেজল তেল তমোল তাপন
সপন নিসি সুখ রঙ্গ।
হেমন্ত বিরহ অনন্ত পাবিতা
সুমরি সুমরি প্রিয়া সঙ্গ সাজনিয়া ॥৪

১। বিদ্যাপতি, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র সম্পাদিত, ২য় সং, পৃ ৩২৮।

মোর দাদুর সোর অহনিসি
রিরিস বুঁধ সবুন্দ।
বিসম বারিস বিনা রঘুবর
বিরহিনি জীবস অন্ত সাজনিআ ॥ ৬
সুমুখি ধৈরজ সকল সিধি মিল
সুনহ কত সুবাণ।
সিসির শুভদিন রাম রঘুবর আওব।
তুআ গুণ জানি সজনিআ [১] ॥ ৮

অনুবাদ—কুসুম রস পানে মধুকর অতি আনন্দিত। কোকিল পঞ্চম সুরে গান করে। ধাতু বসন্ত, বল্লভ বিদেশে। হে সজনি মন দশদিকে ধাবিত হচ্ছে। তেল, তাম্বুল, রৌদ্র এবং নিশাকালে আনন্দময় সুখ স্বপ্ন ত্যাগ করলাম। হে সজনি, প্রিয়তমের সঙ্গ স্মরণ করে হেমন্তের অফুরন্ত বিরহে ময়ূর দদুর্ অহর্নিশি রব করে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ছে। হে সজনি রঘুবর বিনা বিষম বর্ষা ঋতু বিরহিনীর জীবনান্ত করছে। হে সুমুখী ধৈর্য ধারণ করলে সকল সিদ্ধি মেলে। কত সুবাণী শুন। তোমার গুণ জেনে রামরঘুবর শিশিরের শুভদিনে আসবেন।

এই পদটিতে কবি বিরহিনী জানকীর বিরহ বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঋতু পর্যারের বর্ণনা করেছেন।

আর একটি পদে বিদ্যাপতি দশানন রাবণের আক্ষেপ বর্ণনা করেছেন। রাবণ শিব-দুর্গার ভক্ত। রাম-রাবণের মহাসমরে যতক্ষণ শিবদুর্গা রাবণের পক্ষে ছিলেন ততক্ষন রাবণ রামের অজেয় ছিল। যে মুহূর্তে শিবদুর্গা দশাননকে পরিত্যাগ করলেন তখন থেকেই রাবণের পরাজয়ের সূত্রপাত। শিবভক্ত রাবণ তাই খেদোক্তি করছে—

"জোঁ হম জাণিত হুঁ ভোলা ভেলা ঠেকনা।
হোই তহুঁ রাম গুলাম গে মাই ॥
ভাই বিভীখন বড় তপ কৈলহি।
জপলক রামকা নাম গো মাঈ ॥ ২
পুরুব পাছিম একো নহি গেলা।
অচল ভেলা যহি ঠাম, গে মাঈ ॥

১। বিদ্যাপতি—প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৭।

বীস ভুজা দস মাথ চড়াওলি।
ভাগ দিহল ভর গাল, গে মাঈ ।। ৪
এক লাখ পুতা সবা লাখ নাতী।
কোটী সোবরনক দান, গে মাঈ ।।
গুণ অবগুন সিব একো নহি বুঝলহি।
রথলহি রাবণক নাম, গে মাঈ ।। ৬
ভন বিদ্যাপতি সু কবি পুণিত মতি।
কর জোরি ধিনও মহেশ গে মাঈ [১] ।। ৮

অনুবাদ—হে মা, আমি যদি জানতাম ভোলা আমাকে এমন প্রতারণা করবেন তবে আমি রামের গোলাম হতেম। ভাই বিভীষণ অনেক তপ করেছিল তাই কোনস্থানে না গিযে রামের নাম নিয়ে অচল হয়ে রইল। আমি বিশ হস্তে দশমাথায় শিবকে পূজা করলাম, গালভরে ভাঙ্ দিলাম এক লক্ষ নাতি। কোটি সুবর্ণের দান দিলাম। গুণ দোষ শিব কিছুই দেখলেন না। রাবণের নাম লুপ্ত করলেন। সুকবি বিদ্যাপতি বলেছেন হর দোষগুণ কিছুই মনে রাখেন না। এই পদটির মধ্যে বাংলা লোক সাহিত্যের পূর্বাভাস রয়েছে। এখানে শিব লোক সাহিত্যের শিব—ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, আপন ভোলা মহেশ্বর।

বাংলার লোক সাহিত্য বাঙ্গালীর প্রাণের সাহিত্য। এই লোকসাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যায়। পল্লী জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে লোক সাহিত্যগুলি গড়ে উঠে। বাংলার লোসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী ও হর গৌরীর গৃহস্থালী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। রামসীতার কাহিনী এখানে অনেকটা গৌণ হলেও সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা দেশে রামায়ণের একটি লোকায়ত ধারা চলে আসছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর লোকসাহিত্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে বলেছেন—

"বাংলার গ্রাম্য ছড়ায় হর গৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতা রাম ও রামরাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প।...... বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার

১। বিদ্যাপতি, প্রগুক্ত, পৃঃ ৩২৮

উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।"[১]

রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর কাহিনী বাংলার লোকসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করলেও জন্ম দুঃখিনী সীতার বারমাসী, রত্নাকর দস্যুর কবি বাল্মীকিতে পরিবর্তনের কাহিনী, রাবণ ও হনুমানের বীরত্ব পল্লী কবিকে মুগ্ধ করেছে। পল্লী বাংলার গো-চারণের মাঠে, চণ্ডীমণ্ডপে যাত্রা গানের আসরে এগুলি সুদূর অতীতকাল থেকে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলার পল্লী কবিরা মনসার গীতের মত রামায়ণ গানের মাধ্যমে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা প্রকাশ করেছেন। রাধা কৃষ্ণর প্রেম কাহিনী অপেক্ষা এইগুলি তাঁদের হৃদয়কে অধিক নাড়া দেয়। রামায়ণের সীতা চরিত্রের আদর্শ সকল বাঙ্গালীরই অন্তরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সীতার অসামান্য দুঃখ থেকে পল্লী কবিরা সীতার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী, রাধার বারমাসী বা বেহুলার অষ্টমাসী বা আট মাসের দুঃখ বর্ণনার প্রেরণা লাভ করছেন। এই বারমাসী গুলির মধ্যে চির দুঃখিনী পল্লীবালাদের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পল্লীকবির হাতে সীতা দরিদ্র বাঙ্গালী ঘরের বধূ। রত্নাকর দস্যুর কবি বাল্মীকিতে পরিবর্তনের কাহিনী বাংলার পল্লী কবিদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। এই কাহিনীটি বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসাহিত্যের মধ্যে দিয়া বিভিন্নরূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। এভাবে মৈমনসিংহ গীতিকায় দস্যু কেনারামের পালা ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে নিজাম ডাকাতের পালার উৎপত্তি হয়েছে। শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে পল্লী গ্রামে রামসীতাকে অবলম্বন করে ছড়া কাটা হয়। পুত্র সন্তান জন্মালে রামের বৃত্তান্ত কন্যা সন্তান জন্মালে সীতার জন্ম বৃত্তান্ত গান করা হয়। যেমন—

"দশমাস দশদিন গো পূর্ণিত হইল।
সর্ব সুলক্ষণ গো শিশু ভূমিষ্ট হইল॥
সুবর্ণ কাটারিতে গো ধাই নারিচ্ছেদ করে।
জয়াদি জোকার পড়ে গো কৌশল্যার মন্দিরে॥

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড,
জন্ম শত বার্ষিকী সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, পৃঃ ৭৩৩—৭৩৪

দূতে গিয়া বার্তা কইল গো দশরথের আগে।
হীরামণ মানিক্য দিয়া গো রাজা পুত্রমুখ দেখে ॥[১]

রাধাকৃষ্ণের প্রণয় সঙ্গীত লোক সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করলেও বাঙ্গালীর বিবাহ সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় প্রসঙ্গ অপেক্ষা রামসীতা ও হরগৌরীর বিবাহ বিষয়ক ছড়াগুলিই বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। কারণ বাঙ্গালী দাম্পত্য জীবনে উন্নততর আদর্শ হিসাবে রামসীতার দাম্পত্য জীবনকেই গ্রহণ করেছে। রামসীতার বিবাহ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে বাঙালীর বিবাহ অনুষ্ঠানে বহু লোকগীতি রচিত হয়েছে ঃ—

"সীতারে সাজইল রে সখীগণ মেলি।
বাজু দিল, খাড়ু দিল, দিল পাঁচ লহরী ॥
সীতারে সাজাইল রে আইয়গণ মেলি।
মাথায় ঘটুক দিল অগ্নি পাটের চেলি ॥
সীতারে সাজাইল রে মায় সুমিত্রা রানী।
লজ্জাবস্ত্র দিয়া মুছে নয়ণের পানি" ॥[২]

এখানে বাঙ্গালীর কনে সজ্জার গানে সীতার বিবাহ সজ্জা বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যত্র আছে—

"আইজ রাণী হরষিত মনে, লক্ষ্মণরে পাঠাইয়া দিল দুর্গার কারণে।
জোর হস্ত কইর‍্যা লক্ষ্মণ নিমন্ত্রন করে, যাইতে হবে দুর্গামাগো শ্রীরামের উৎসবে তোমায় যাইতে হবে।"[৩]

এভাবে লক্ষ্মণকে দিয়ে গঙ্গা, পদ্মা, কালী, লক্ষ্মী প্রভৃতি সব দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। গায়ে হলুদের তত্ত্ব পাঠানোর সময়ও গ্রাম্য মহিলারা রামায়ণ প্রসঙ্গ অবলম্বন করে গান করেন—

"রামের মা কৌশল্যা রানী বুলে তোরা আয়।
তৈল কাপড় আর্ঘিবার শুভ সময় বইয়া যায় ॥
যাইতে ঐব মিথিলাতে জনক রাজার বাড়ী।
সেইখানে হইব বিয়া তাহার কুমারী ॥ [৪]

১। বাংলার লোকসাহিত্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃঃ ৩০৩।

২, ৩, ৪। বাংলার লোক সাহিত্য, প্রাগুক্ত, ৩য় খঃ, ১ম সং, পৃঃ ৪০৫, ৮১-৮২, ৩৭৮

পাশা খেলা বাঙ্গালী বিবাহের একটি বিশেষ আনন্দানুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে সবসময়ে বর হারে, কনে জিতে। এখানেও রামসীতার পাশা খেলায় রাম হারলেন, সীতা জয় লাভ করলেন—

"ছি, ছি, ছি লাজে মরি,
শ্রীরাম হারিল খেলায়,।
জিতল জানকী"।[১]

নৌকা বাইছে জয়লাভ করে বিজয়ী বীর আসার সময় নৌকা চলার শব্দের তালে তালে রামায়ণ প্রসঙ্গ গান করা হয়ঃ—

"জয় দেলো রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে।
ধানদূর্বা বরণকুলো দেলো ঐ গলুয়ার কপালে" ॥[২]

বরের সঙ্গে সখীদের রহস্যালাপে ও রামসীতা বিষয়ক গ্রাম্য ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে—

সখী—"শুনিয়াছি অজ নাকি তব পিতামহ।
মানুষ করেছ রাম ছুঁইয়া পাথর।
বিদ্যাবুদ্ধি সব দিক দেখিলাম ভাই ভালো।
জানকী সুন্দর কিন্তু তুমি সখা কালো॥
রাম—সুন্দর জ্যোতি যদি মাখি সর্বগায়
সুন্দর করিব সখী এ কৃষ্ণ কায়" ॥[৩]

কন্যা বিদায়ে জননীর ব্যথা প্রকাশ পেয়েছে সীতার শ্বশুর বাড়ী যাত্রা বিষয়ক কয়েকটি ছড়ায়, যেমন,

সীতা কি মোর ঘর যাইবে গো।
বড় পুকুরের ভদই চিংড়ি কে খাইবে গো
মাছের তলায় ছাতুর হাঁড়ি কে খাইবে গো
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।

১। বাংলার লোকসাহিত্য প্রাগুক্ত, ২য়, পৃঃ ৩০৭
২। ঐ, ৩য় খঃ, পৃঃ ৫৯২
৩। বাংলার গ্রাম্য ছড়া, বিমলা চরণ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫০

সাত গাইয়ের দুধ খাবিয়ে।
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো ।১

কৃষিপ্রধান বাংলা দেশে রাবণের নামে কয়েকটি হেঁয়ালী ছড়া প্রচলিত আছে। অবশ্য এই ছড়াগুলির সঙ্গে রামায়ণের রাবণের কোন সম্পর্ক নেই একটি ছড়ায় শুনতে পাওয়া যায়—

"ভাদ্র মাসে রোয়ে কলা
সবংশে মলো রাবণ শালা" ॥২

সীতাহরণের কোন কোন পালায় রাবণ রাজা পল্লী কবির হাতে ডোমরাজায় পরিণত হয়েছে—

"রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত চড়ি যায়।
পথত্ পাইয়ে লাল কেঁয়রা,
সীতারে হরি নিয়ে রাজা ডোম যায় ॥৩

এভাবে বাঙালীর জনজীবনে রামসীতা প্রসঙ্গ ওতপ্রোত জড়িয়ে মিশিয়ে আছে।

পটুয়া বা পটচিত্র লোক সাহিত্যের আর একটি বিশেষ অঙ্গ। বাংলা দেশের সর্বত্র সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে পটুয়া বা পটশিল্পীরা পট দেখিয়ে গান করেন। এঁদের মধ্যে একদিকে শিল্প প্রতিভা ও অপরদিকে কবিত্ব শক্তির পরিচয় রয়েছে। সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যের কাহিনী এই চিত্রগুলিতে অঙ্কন করা হয়। চিত্রগুলি নির্বাচন করার সময় চিত্রকর সমাজের উন্নততর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কৌতুককর বা লঘু হাস্যরসোপযোগী কোন বিষয়ই এতে থাকে না। এই চিত্র ও গানগুলি পরস্পরের হুবহু অনুকরণ নহে। চিত্রকর চিত্রের সাহায্যে যা প্রকাশ করতে পারেননা গানের সাহায্যে তা ফুটিয়ে তোলেন। ইহাই বাংলা লোকসাহিত্যে পটুয়া সঙ্গীত নামে পরিচিত। রামায়ণের মধ্যে পারিবারিক জীবনের যে আদর্শের কথা আছে সেই আদর্শকে ভিত্তি করে পটুয়া চিত্র অঙ্কিত হয়। তার ফলে সহজ সরল পল্লীবাসীরা এর মধ্যে

১। বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৭
২, ৩। ঐ ২য়, ১১৮, ৫০০

একটা গার্হস্থ্য জীবন রসের সন্ধান পায়। পটুয়ারা নিরক্ষর। রামায়ণের মূল কাহিনীর সঙ্গে তাঁরা পরিচয়হীন। সুতরাং রাম-লক্ষ্মণ সীতার মধ্যে দিয়ে তাঁরা বাঙ্গালী পরিবারের পতি-পত্নীরও ভ্রাতায়-ভ্রাতায় সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কের কথাই প্রকাশ করেছেন। ফলে পটুয়াদের অংকিত ও গীত রামায়ণ কাহিনী বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবনায়ন হয়েছে। এই পটুয়া সঙ্গীতে কোন পরমার্থিক জগতের কথা নেয়। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে অপরিসীম মাধুর্যের স্বাদ আছে পল্লী কবি তাই চিত্র ও সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এমন কি ভাগবত পুরাণের মধ্যেও নিরক্ষর পটুয়ারা ভক্তিবাদের কোন সন্ধান পাননি। ভাগবতের বাৎসল্য রসটুকু মাত্র তাঁরা চিত্রে অঙ্কিত করেছেন। চিত্রগুলিও বাৎসল্য রসের উপযোগী ছিল। অন্যত্র বেহুলা এবং সীতার দুঃখ বেদনার কথা স্মরণ করে পল্লী রমনীরা নিজেদের জীবনের দুঃখ বেদনা উত্তরণের শক্তি সঞ্চয় করতেন। এভাবে পটুয়া সঙ্গীত গুলি যেমন সরল পল্লীবাসীর জীবনে আনন্দ পরিবেশন করত অন্যদিকে তেমনই লোকশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারের একটি শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল। লোকশিক্ষা প্রচারে পটুয়া সঙ্গীতের স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও বলেন—"চিত্র ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সমাজ শিক্ষার বিষয় যে ভাবে পরিবেশন করা হইত তাহাতে শিক্ষা ও আকর্ষনীয় হইয়া উঠিত এবং ইহার ভিতর দিয়া সমাজ যে শিক্ষা লাভ করিত জীবনে তাহার ফল সুদূর প্রসারী হইত"।১

১। বাংলার লোক সাহিত্য, ১ম, প্রাগুক্ত, ভূমিকা পৃঃ ৮১
রামায়ণের লৌকিক ধারা সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃত্তিবাস

মধযুগে বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ নামে পরিচিত। এই যুগে মুসলমান বিজেতারা বাংলা দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেও তাঁরা সুদৃঢ় স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেননি। বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন শাসন কর্তার অধীন ছিল বলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। বখতিয়ারের মৃত্যুর পর হোসেন শাহের রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত পাঠান খিলজী বলবন, মাহমুদ ও হাবসী সুলতানদের মধ্যে বাংলা দেশের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে বর্বর চণ্ডনীতি ও পরস্পর হানাহানি চলতে থাকে। বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া গ্রামের হিন্দু জমিদার গণেশ ও তাঁর পুত্র যদু জালালউদ্দীন নাম ধারণ করে কিছুদিন বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কৃত্তিবাস রাজা গণেশের রাজসভায় এসেছিলেন।[১]

যদু বা জালালউদ্দীনের পর গৌড়ের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে আবার অরাজকতা, তাণ্ডব হত্যালীলা চলতে থাকে। এই অবস্থায় গৌড়ের আমীর ওমরাহরা ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দীন নামে অখ্যাত একজনকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করেন। নাসিরুদ্দীনের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র রুকনুদ্দীন বারবাকশাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন। সাহিত্য চর্চায়ও তিনি উৎসাহ দিতেন। ১৪৫৬-১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে কবি কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন।[২]

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্রসেন, ষষ্ঠসং, ১৮৯৬, পৃঃ ১০৪

২। বাংলাদেশের ইতিহাস রমেশ চন্দ্র মজুমদার, মধ্যযুগ, ২য়, ১৩৮০ পৃঃ ৫৮

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। রাষ্ট্রশক্তির বিপর্যয় ও উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও বিপর্যয় দেখা দেয়। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পরে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা স্থিরতা প্রাপ্ত হলেও হিন্দু সমাজের ভাঙ্গন রোধ করতে পারা যায়নি। রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবে বিপর্যস্ত বাঙ্গালী চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আত্মবিশ্বাস ও জীবনের মূল্যবোধ ফিরে পায়নি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মুসলমান শাসক ও তাদের অনুগামী ফকির এবং আমীর ওমরাহদের অত্যাচারে বাঙ্গালী হিন্দুর কোন রকমে আত্মরক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ল। এ সময়ে হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত চাঁড়াল, বারুই, চামার, দুলে, মালো প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অত্যাচারে দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমানরাও ছলে বলে কৌশলে হিন্দুদের ধর্মান্তর করণ করতে লাগল। হিন্দুর দেবমন্দির, বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মসজিদে মিনারে পরিণত হল। স্যার যদুনাথ সরকার এই সময়ে হিন্দুর জাতীয় জীবন বিপর্যয়ের এক সুন্দর চিত্রাঙ্কন করেছেন—

"The great Mosque of Damascus was built by the spolia-tion of Hindu and Buddhist Shrines accordiug to R. K. Chakraborty,a Buddhist stupa was dismantled to secure the necessary materials for its building, but the remains of Hindu images as well ate visible to day in every part of this Mosque.[১]"

রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবের এই ঘূর্ণাবর্তে পড়ে হতভাগ্য হিন্দু জাতির ধর্মান্তর গ্রহণ অথবা মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ রইল না। স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা হিন্দুর জাতিকুল রক্ষার জন্য সমাজে নানারকম বিধিনিষেধ অবতারণা করতে লাগল। ফলে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ আচারের বেড়াজালে দুর্বল হয়ে পড়ল।

বরেন্দ্রবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবি ভারতী বৌদ্ধ হয়েছিলেন বলে তাঁকে স্বদেশ ছেড়ে সিংহল যাত্রা করতে হয়েছিল।[১] গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রায়শ্চিত্তের পরও হিন্দু সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি হিন্দু সমাজের এই অবজ্ঞা অবহেলার তিনি যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়েছিলেন। তাঁরই প্ররোচনায় পীর ফকির ও আমীর ওমরাহরা হিন্দুসমাজের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। কালাপাহাড়ের হিন্দু বিদ্বেষ ও মঠ মন্দির ধ্বংস করার কাহিনীও হিন্দুসমাজের এই অনুদার নীতিরই ফল।

কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণেও এই সমসাময়িক যুগের রাষ্ট্র ও সমাজজীবন বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় মুসলমান নৃপতিদের সঙ্গে হিন্দু রাজাদের যুদ্ধের কাহিনী ও হিন্দু জনসাধারণের উপর মুসলমান শক্তির অত্যাচারের কাহিনীর আভাস পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে মকরাক্ষের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনায় গো বৎস সামনে রেখে গো চর্মে রথ ঢেকে যুদ্ধ করার ঘটনাটি অনুপস্থিত। কৃত্তিবাস সমসাময়িক যুগ প্রভাবে পরম বৈষ্ণব শ্রীরামচন্দ্রকে পরাজিত করার জন্য গোবৎস সামনে রেখে গো-চর্মে রথ ঢেকে মকরাক্ষকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়েছেন।

নব নব বৎস সব রথে লয়ে তোলে।
রথের চৌদিকে ধেনু বান্ধে পালে পালে ॥[২]

গোমাংসের দ্বারা হিন্দু জাতির ধর্ম বিনষ্ট করা, জোর করে হিন্দুকে মুসলমান করা প্রভৃতি ঘটনা মধ্যযুগে মুসলমান সুলতানদের একটি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ছিল। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ রাজ্ঞীর অনুরোধে তাঁর প্রতিপালক সুবুদ্ধি রায়কে মুখে গোমাংস দিয়ে জাতিচ্যুত করেন।[৩]

'তোয়ারিখে জলালিতে' বর্ণিত হয়েছে যে সিকন্দর শাহ্ মহামায়ার সেবক অসমীয়া নৃপতি গৌড়গোবিন্দ শ্রীহট্টের কাছে বার বার পরাজিত হয়ে গোমাংসের দ্বারা মন্দির অপবিত্র করে শাহজলাল নামক এক ফকিরের সাহায্যে শ্রীহট্টরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও মুসলমান করেন।[১]

এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখান যায় যে, বাল্মীকি রামায়ণ বহির্ভূত গরুর পাল সম্মুখে রেখে মকরাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করার কাহিনীটি কবি কৃত্তিবাস সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রাজসিংহ উপন্যাসে, কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মকরাক্ষের যুদ্ধ কৌশলের অনুরূপ একটি উদ্ধৃতি নির্মলকুমারীর মুখ দিয়ে বের করেছেন। নির্মলকুমারী মোগল বাদশাহের হারেমে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক বন্দী হলে বাদশাহের সঙ্গে বাদানুবাদ করার সময় বলেছেন—"জানি, গরুর পাল সম্মুখে রাখিয়া লড়াই করিয়া মুসলমান হিন্দুকে পরাস্ত করিয়াছে—নহিলে রাজপুতের বাহুবলের কাছে মুসলমানের বাহুবল সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ"।[২]

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, রাজা গণেশ, সুলতান মাহমুদ প্রভৃতি সুলতানদের হিন্দুমুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টি ও উদারনীতির ফলে সুদীর্ঘ দুই শত বৎসরের অরাজকতা ও পরস্পরের প্রতি হানাহানি দূর করে বাঙ্গালীর জীবনে কিছুটা শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল। মুসলমান সুলতানের রাজসভায় যোগ্য হিন্দু আবার উচ্চাসন অধিকার করল। হিন্দু জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমান শাসকদের অধীনে মুসলমান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে স্বধর্মী স্বদেশ আক্রমনকারীদের বিতাড়িত করতে অগ্রসর হয়েছে। উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণ বরেন্দ্রভূমি আক্রমন করলে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান শাসকদের অধীনে স্বধর্মী ভিন্ন দেশীয় শত্রুদের বিতাড়িত করেছেন। ইলিয়াস শাহ ও আলিমুবারক হিন্দুদের সাহায্যে পূর্ব বঙ্গ

১। বৃহৎ বঙ্গ (২য়), দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত পৃ, ১০৮০-১০৮৯।
২। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৩, পৃ, ৬৭৪।

অধিকার করেন। দিল্লীর সুলতান কর্তৃক আক্রান্ত হলে সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ হিন্দুদের নিকট থেকে প্রভূত উপকার পান। গৌড় রাজদরবারে এখন থেকে গুণীজন সম্বর্ধনা শুরু হল। জালালউদ্দীন প্রসিদ্ধ টীকাকার বৃহস্পতি মিশ্রকে আচার্য 'কবি চক্রবর্তী', 'পণ্ডিত সার্বভৌম' ও 'কবি পণ্ডিত' প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত করেন। রুকনুদ্দীন বারবাকশাহ মালাধর বসুকে গুণরাজখান উপাধি দেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কবি কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবাকশাহের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। কেবল রাজদ্বারে নহে, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান, পরমত সহিষ্ণুতা প্রভৃতি উদারনীতির ফলে সমাজে একটা সাম্য ও স্থিতাবস্থা এসেছিল। হিন্দু মুসলমানের এই মিলিত সাধনা লক্ষ্য করে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলেন—

"হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলিয়া শুধু সাহিত্যই সৃষ্টি হয় নাই, আমাদের উৎসব প্রভৃতিতেও উভয় সম্প্রদায়ের দান আছে। পশ্চিমে মহরম প্রভৃতি মুসলমানী পর্বে এবং হিন্দুদের মেলায় ও যাত্রায় হিন্দু-মুসলমান উভয়ে চিরদিন যোগ দিয়া আসিয়াছেন। আমাদের আগমনী গানে, ভাসানে, যাত্রায়, গম্ভীরায়, নীলপূজায় গ্রাম্য গীতে, মালসীতে, কবি-গানে সাহিত্যের কোন্ ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান একত্রে না সাধনা করিয়াছেন"।[১]

ধর্মের ক্ষেত্রে নিবিড় ঐক্যের ফলে হিন্দু মুসলমানের মিলিত দেবতা সত্যপীর ও মানিকপীরের হল আবির্ভাব। মুসলমানের দরগায় হিন্দুরা শিন্নী দিতে ও মানত করতে শুরু করল। আবার অনেক মুসলমান পরিবারেও শীতলা, মনসা প্রভৃতির পূজা প্রচলন হল। হিন্দুর দোল-দুর্গোৎসবে মুসলমানরা অংশ গ্রহণ করতে লাগল।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হল। মোগল শাসন যুগে বাংলার রাজস্ব দিল্লীর সাম্রাজ্য বিস্তারে যুদ্ধের খরচায় বাইরে চলে যেত। ইংরাজ আমলে এই অর্থ নানা খাতে বিদেশে চলে যেতে। কিন্তু পাঠান আমলে দেশের এই অর্থ দেশে থেকে যেত বলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পরতে পারেনি। বরং আরও সুদৃঢ়

১। হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬, পৃ ৬৪।

হয়েছিল। শিল্পজাত দ্রব্য বাংলার বাইরে রপ্তানী হওয়ার ফলে বিদেশী মুদ্রা স্বদেশে আহরণ করা হত। কায়িক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে দেশের সাধারণ লোকের ঘরে এই অর্থ কিছুটা যেত বলে এ দেশে মোটামুটি একটা সচ্ছল অবস্থা বিরাজ করতো। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দী বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে কেবল অরাজকতা ও বিচ্ছিন্নতার যুগ নয়— এই যুগে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ও সাঙ্গীকরণ ঘটেছিল। এক কথায় এযুগকে সমন্বয়ের যুগ বলা যায়। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর এই নব জাগৃতি সম্বন্ধে বলেছেন—

"It was during this period that the impact of Hinduism and Islam set in motion the new forces which tended to bring the Hindus and Muslims nearer and gave a new colour to Hindu religion[১]".

কৃত্তিবাসের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে, বাঙ্গালীর চিন্তায়, মননে এবং বাঙ্গালী মনীষীদের গবেষণায় আজও কৃত্তিবাস এক বিস্ময়ের আবরণে আবৃত রয়েছেন। কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু কৃত্তিবাস সমস্যা আজও সুষ্ঠু সমাধান হয়নি, কৃত্তিবাসের নামে যে সব প্রচলিত পুঁথি রয়েছে সেগুলিতে তাঁর বংশ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি কোন গৌড়েশ্বরের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন বা কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে কোন সময় নির্ধারক তারিখ পাওয়া যায় না। কবি প্রদত্ত তারিখ বিহীন আত্ম-বিবরণীটি অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী সময় নির্ধারণ করেছেন। বঙ্গভাষার উপন্যাস প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়, কিন্তু তিনি তাঁর পুস্তকে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেন নি। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রন্থে বলেন কৃত্তিবাস ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ রচনা করেন। তিনিও এই সন তারিখের কোন প্রমাণ রাখতে

A Short History of Muslim Rule in India, Ishwari Prasad, Revised Edition. The Indian Press, 1958, Page 143.

পারেন নি। ১৩০৫ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ খণ্ডে কৃত্তিবাসের আত্ম পরিচয় মূলক নয়টি পয়ার পঙক্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি কোন পুঁথি থেকে এগুলি সংগ্রহ করেছেন তার কোন প্রমাণ রাখেননি কৃত্তিবাস রহস্য উদ্ধারের জন্য। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কৃত্তিবাস রামায়ণ সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বৎ বল্লভ, নলিনী কান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি বহু গবেষণার পর কৃত্তিবাসের পরিচয় ও পুঁথি সম্বন্ধে নানান তথ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁরা কেউ একমত হতে পারেন নি বরং কৃত্তিবাস সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছেন। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ বেদানুজ মহারাজার পাত্র বা পুত্র নরসিংহ ওঝার আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। সেখানে রাষ্ট্র বা সামাজিক বিপর্যয়ে কোন বিপদ উপস্থিত হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হন। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী অনুসারে নরসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি, মুরারির অন্যতম পুত্র বনমালী। বনমালীর ছয় পুত্র। তার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কৃত্তিবাস। তিনি মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পুণ্য বা পূর্ণ রবিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১২ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য গৃহত্যাগ করেন। নানান দেশের নানান গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করে তিনি রাজকীয় সম্মান লাভ করার জন্য পাঁচটি শ্লোক রচনা করে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন। রাজসভায় প্রবেশ করে কবি দেখেন গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। তাঁর চতুর্দিকে জগদানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ, দাহিনে নারায়ণ, তরণী, গন্ধর্বরায়, সুন্দর, শ্রীবৎস, মুকুন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি বসে আছেন—আঙিনায় পড়েছে রাঙা মাজুরী. রাজা পাত্র মিত্রসহ মাঘমাসের খরা উপভোগ করছেন। কৃত্তিবাস সাতটি শ্লোক রাজাকে পাঠ করে শোনালেন। রাজা কৃত্তিবাসের ইচ্ছামত তাঁকে যে কোন বস্তু দান করতে চাইলে নির্লোভ পণ্ডিত গৌরব ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করলেন না। রাজসভার বাইরে এলে বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্ধণা জানাল। কৃত্তিবাস কোন রাজার রাজসভায় এসেছিলেন তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি, নিজের জন্ম সন সম্বন্ধেও কবির লেখনী নীরব।

ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী প্রভৃতি কুলজীগ্রন্থ, বৃহস্পতি মিশ্রের কারিকা

ও রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মেলবন্ধন ও সমীকরণ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন কৃত্তিবাসের আবিভার্বকাল সম্বন্ধে একটা আভাস দিয়েছেন। ডঃ সেন দেখিয়েছেন যে কৃত্তিবাস উৎসাহ থেকে অধস্তন নবম পুরুষ। উৎসাহ বল্লাল সেনের সভায় পূজিত হতেন। বল্লাল সেন ১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরলে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃত্তিবাসের জন্মকাল পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস বর্ণিত রাজসভা কোন হিন্দু রাজার রাজসভা মনে করে ডঃ সেন আরও অনুমান করেন যে কৃত্তিবাস রাজা গণেশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।[১]

অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু দীনেশ চন্দ্রের এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে কৃত্তিবাস তাহিরপুরের রাজা কংস নারারণের আদেশে রামায়ণ রচনা করেন, কারণ কৃত্তিবাস তাঁর আত্মবিবরণীতে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত, কেহ বা তাঁর সভাসদ ছিলেন। কুলজীগ্রন্থ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ ভাদুরী কংস নারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ, পুত্রের নাম সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও জগদানন্দ রায়। অধ্যাপক বসুর মতে কেদার খাঁ লিপি প্রমাদে কেশব খাঁতে পরিণত হয়েছে। কেশব খাঁর এক জামাতার নাম ছিল নারায়ণ। অতএব মুকুন্দ, জগদানন্দ, কেদার খাঁ, নারায়ণ এদের সকলকে কংস নারায়ণের সমসাময়িক কালে পাওয়া যাচ্ছে বলে অধ্যাপক বসু অভিমত প্রকাশ করেছেন যে কৃত্তিবাস কংস নারায়ণের রাজসভায় এসেছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশে রামায়ণ রচনা করেছিলেন।[২]

রাজশাহী গেজেটিয়ার অনুযায়ী তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে কংস নারায়ণের পৌত্র ইন্দ্রজিৎ টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে সাহায্য করেছিলেন, ইহা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তিন পুরুষে একশত বৎসর ধরলে কংস নারায়ণের সময় ১৪৮২ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যাবে। কংস নারায়ণ ও কৃত্তিবাস সমসাময়িক হলে কৃত্তিবাসের সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হবে।

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত পৃ, ১০৪

২। বাংলা সাহিত্য, (দ্বিতীয় খণ্ড) মনীন্দ্র মাহন বসু, ১৯৪৭ পৃঃ ১২০

অধ্যাপক বসুর মত ডঃ সুকুমার সেনও মনে করেন যে কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন। সনাতন রূপ গোস্বামীর প্রপিতামহ পদ্মনাভ আর কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা সমসাময়িক। নরসিংহ ও পদ্মনাভ উভয়ে রাজা দনুজমর্দনের আগ্রহে শিখরভূমি বা পঞ্চকোট অঞ্চল ত্যাগ করে নৈহাটির নিকটে গঙ্গা তীরে বাস করতে থাকেন। কৃত্তিবাসের সঙ্গে রূপসনাতনের এক পুরুষের তফাৎ হয়। রূপ সনাতন নৃপতি হোসেন শাহের সমসাময়িক। হোসেন শাহের সময় ১৪৯৩ থেকে একপুরুষে ৩৫ বৎসর বাদ দিলে কৃত্তিবাসের সময় পাওয়া যাবে ১৪৫৮। তিনি আরও অনুমান করেছেন রূপ সনাতন বৈরাগ্য অবলম্বন করলে হোসেন শাহের সভার কোন কোন সদস্য গৌড় পরিত্যাগ করে উত্তরে চলে যান। সেখানে হয়ত জমিদার কংস নারায়ণের সভায় কৃত্তিবাস এদের দেখে থাকবেন।[১] রূপ-সনাতন ও চৈতন্যদেব সমসাময়িক কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সময় নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার একটা শ্রেষ্ঠ পীঠ স্থান ছিল। ফুলিয়া ও নবদ্বীপ গঙ্গার একই পারে। এই সময়ে কৃত্তিবাস আবির্ভূত হলে তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করে অন্যত্র বিদ্যাচর্চা করতে যাবেন কেন? তাছাড়া কৃত্তিবাসকে চৈতন্য সমসাময়িক যুগে টেনে আনার মতও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভটাচার্য কুলজী গ্রন্থ, মহাবংশাবলী, মেলবন্ধন, ও সমীকরণ প্রভৃতি মিলিয়ে দেখেছেন যে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঘমাসের রবিবার। যদি ১২ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাস বিদ্যা শিক্ষা করতে যান তা হলে ১৩৯৮+১২=১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন। কৃত্তিবাস যদি ৮।১০ বৎসর বিদ্যা চর্চা করে রাজসভায় গমন করে থাকেন তবে এসময়ে গৌড়ের সিংহাসনে রাজা গণেশকে পাওয়া যায়, তাছাড়া কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের রাজসভার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কোন হিন্দু রাজার হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ মুসলমান সুলতানদের রাজসভা ঝাঁকজমক প্রিয়তার জন্য বিখ্যাত। এরকম অনাড়ম্বর রাজসভা রাজা গণেশের হওয়াই সম্ভব, এছাড়া, কুলীনদের

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৭, পৃ ১২৩

সমীকরণ, মেলবন্ধন. কৃত্তিবাসের শ্বশুর কুলের পরিচয় ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও কৃত্তিমাসের সময় নির্ধারক কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুলপঞ্জিকানুসারে দেখা যায় ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) কৃত্তিবাসের ভ্রাতুস্পুত্র মালাধর খাঁ এবং খুড়তুতো ভাইয়ের পৌত্র গঙ্গানন্দ ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছিলেন। ঐ কুল পঞ্জিকায় আরও দেখা যায় কৃত্তিবাসের জীবিতকালেই তাঁর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তি, মৃত্যুঞ্জয়, ভ্রাতুস্পুত্র ভরত সমীকরণ দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন কৃত্তিবাস কুলভঙ্গ করেছিলেন বলে তাঁকে বাদ দিয়ে কনিষ্ট ভ্রাতা ও ভ্রাতুস্পুত্রকে দিয়ে কুলক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছিল। কৃত্তিবাস যদি ৭০। ৮০ বৎসর বেঁচে থাকেন তাহলে কুলপঞ্জিকানুসারে ১৩৯৮-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসের জন্ম সন পাওয়া যাবে।[১]

ডঃ ভট্টাচার্যের কুলজি গ্রন্থানুসারে কৃত্তিবাসের শ্বশুরের ভাই উৎসাহের বৃদ্ধ পৌত্র নৈয়ায়িক বনাদ তর্কবাগীশ বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র এবং রঘুনাথ শিরোমনির সহাধ্যায়ী। ১৪৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ শিরোমনির জন্ম হয়েছিল। রঘুনাথের প্রপিতামহের ভগিনীপতি কৃত্তিবাসের জন্ম সন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে হওয়া অসম্ভব নহে। এদিক দিয়েও কৃত্তিবাসের জন্মসন ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশ করা যেতে পারে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র সুষেণ পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২] সুষেণ পণ্ডিত ছিলেন মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত হরিদাসের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। হরিদাস ও সুষেণ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং সুষেণের পিতামহ কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত থাকা স্বাভাবিক। এসব প্রমাণ থেকে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হলেও হতে পারে।[৩]

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী ও কুলজী গ্রন্থের প্রমাণের সঙ্গে রুকনুদ্দীন

বারবাক শাহের রাজত্ব কালের বিবরণ মিলিয়ে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমাণ করেছেন যে কবি কৃত্তিবাস, রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের সমসাময়িক ছিলেন।[১] ডঃ মজুমদারের মত অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ও মনে করেন কৃত্তিবাস পণ্ডিত রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের রাজসভায় এসেছিলেন। বর্ধমান উপাধ্যায়ের দণ্ডবিবেকে উল্লেখিত হয়েছে যে গৌড়েশ্বরের কেদার রায় নামে একজন সভাসদ্ ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল প্রতি শরীর।[২] মনোহর চক্রবর্তী এই প্রতি শরীরের অর্থ করেছেন প্রতিনিধি। এ সময়ে গৌড় রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন নারায়ণ রায়ের নাম পাওয়া যায়। ভরত মল্লিকের চন্দ্র প্রভাতেও এই নারায়ণ রায়ের নাম উল্লেখ আছে।

"নারায়ণো যোহবংসোহন্তরঙ্গ কবীশ্বরঃ ॥[৩]

গৌড়েশ্বরের চিকিৎসকরা অন্তরঙ্গ উপাধিতে ভূষিত হতেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে নারায়ণের পুত্র মুকুন্দের নীলাচলে সাক্ষাৎ হয় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে। এই সময় থেকে ৩৫ বৎসর পূর্বে ধরলে নারায়ণ দাসের সময় পাওয়া যাবে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং এই সময়ে কৃত্তিবাস জীবিত থাকলে কৃত্তিবাসের পরলোক গমনের ৮।১০ বৎসর পর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়।

(আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস গন্ধর্ব রায় নামে একজন রাজসভাসদের নাম উল্লেখ করেছেন—

গন্ধর্ব রায় বসে আছেন গন্ধর্ব অবতার।[৪] পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড় রাজসভায় একজন গন্ধর্ব রায়ের নাম পাওয়া গেছে। গোপীনাথ বসু সুলতানের প্রিয়কার্য সাধন করায় রাজস্ব বিভাগে মন্ত্রীত্ব এবং পুরন্দর খাঁ উপাধি লাভ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ বসু ধনাধ্যক্ষ হয়ে

১। বাংলাদেশের ইতিহাস, ডঃ রমেশ মজুমদার, ১ম সংস্করণ, মধ্যযুগ। পৃঃ ৩৮

২। Danda Viveka of Vardhamana, edited by Kamal Krishna Smrti Sastri, Bhatpara, Oriental Institute, Barada, 1931,

৩। চন্দ্রপ্রভা, ভরত মল্লিক, বিনোদলাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ১২৯৯, পৃঃ ৩২০।

৪। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ১।

গন্ধর্ব খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন। কুলজী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে পুরন্দর খাঁ ও গন্ধর্ব খাঁ মালাধর বসুর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। মালাধর বসু যে রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লিপিকর প্রমাদে গন্ধর্ব রায় গন্ধর্ব খাঁ হয়েছেন মনে করা যেতে পারে। গন্ধর্ব রায় ও গন্ধর্ব খাঁ যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ছিলেন। রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ ১৪৫৫—৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন ১৪৫৯—১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এককভাবে রাজত্ব করেন এবং ১৪৭৪ থেকে ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুত্র সামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন। সুতরাং ১৪৫৫ থেকে ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের রাজসভায় এসেছিলেন বলে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন।[১]

ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর বিবরণ থেকে জানা যায় বারবাক শাহ ঘোড়া দানকরতে খুব ভালবাসতেন। বৃহস্পতি মিশ্রের চন্দ্রপ্রভায় উল্লেখিত হয়েছে যে রায়মুকুট উপাধি লাভ করার সময় তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট থেকে ঘোড়া উপহার পান। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকেও জানা যায় সমসাময়িক গৌড়েশ্বর তাঁর পিতৃব্যকে ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন—

রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥[২]

কৃত্তিবাসের পিতৃব্যকে গৌড়েশ্বরের ঘোড়া উপহার দান থেকে মনে করা হয় এই গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ ছাড়া আর কেহ নন।

কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র সুষেণ পণ্ডিত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত থাকলে কৃত্তিবাস চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৫১৬ – ৭০ = ১৪৪৬) সময়ে জীবিত ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতানুযায়ী কৃত্তিবাস ১৪৫৫—৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের রাজসভায় এসেছিলেন। ১১ পার হয়ে বার বৎসর বয়সের সময় তিনি

বিদ্যা শিক্ষা করতে যান। অন্ততঃ ৮।১০ বৎসর যদি বিদ্যা চর্চা করে থাকেন তবে তাঁর রাজসভায় আসার বয়স হবে ২০।২২ বৎসর। কৃত্তিবাস অন্ততঃ যদি ৬০।৭০ বৎসরও বেঁচে থাকেন তাহলে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। (১৪৫৫+৪০=১৪৯৫, ১৪৭৪+৪০=১৫১৪) অথবা ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাস বারবাক শাহের রাজসভায় এসে থাকবেন, কিন্তু এর কোনটাই সম্ভব নহে। কারণ তিনি ৪০।৪৫ বৎসরের প্রৌঢ় নবীন পণ্ডিত নহেন। আবার চৈতন্যর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত সুষেণ পণ্ডিতের সময়ের সঙ্গে কুলজী-গ্রন্থ, সমীকরণ, মেলবন্ধন প্রভৃতিতে উল্লিখিত সময় ও কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে কবির একটা সম্ভাব্য আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা যায়। সুষেণ পণ্ডিত যদি ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত থাকেন তবে তাঁর পিতামহ স্থানীয় কৃত্তিবাস ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ১৪৮০-খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের ভ্রাতুস্পুত্রের নামে ফুলিয়া মেল প্রবর্তিত হয়। এ সময়ে কৃত্তিবাস বেঁচে থাকলে তাঁরই নামে 'মেল' প্রবর্তিত হত। অতএব কৃত্তিবাস ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে দেহত্যাগ করেন। কৃত্তিবাস যদি ৭০।৭৫ বৎসর বেঁচে থাকেন কৃত্তিবাসের সম্ভাব্য আবির্ভাব কাল হবে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কৃত্তিবাস যদি ১২ বৎসর বয়সে বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং ৮।১০ বৎসর বিদ্যা চর্চা করেন তবে ২০।২২ বৎসর বয়সে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় এসে থাকবেন। এখন যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধির জ্যোতিষ গণনা যদি নির্ভুল হয় তবে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে একটা রবিবার পাওয়া যায়। এই তারিখটির সঙ্গে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীরও সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হতে পারে। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হলে তাঁর রাজসভায় আসার সময় হবে ১৪১৮-২০ খ্রীষ্টাব্দ। এসময়ে আমরা রাজা গণেশকে গৌড়ের সিংহাসনে পেয়ে থাকি। কৃত্তিবাস বর্ণিত রাজসভার বিবরণ থেকেও মনে হয় ইহা কোন হিন্দু রাজার অনাড়ম্বর রাজসভা। অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন কৃত্তিবাস রাজা গণেশের রাজসভায় এসেছিলেন।

এখন প্রশ্ন আসে বর্ধমান উপাধ্যায়ের দণ্ডবিবেক, মোল্লা তাকিয়ার বয়াজ

অনুযায়ী কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে উল্লেখিত নারায়ণ রায়, গন্ধর্ব রায় প্রভৃতিকে কি করে বারবাক শাহের রাজসভায় পাওয়া যায়? এর কারণ সম্ভবতঃ মনে হয় গৌড়ের সিংহাসনে স্বল্পকালের জন্য যখন গণেশ উপবিষ্ট ছিলেন তখন এরা রাজা গণেশের সভা অলংকৃত করেছিলেন। তরুণ পণ্ডিত কৃত্তিবাস তখন এঁদের দেখে থাকবেন। গণেশের পর গৌড়ের সিংহাসনে একমাত্র বিদ্যোৎসাহী, সদাশয় সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ। দীর্ঘদিন পর এঁরা হয়তো আবার বারবাক শাহের রাজসভায় স্থানলাভ করেছিলেন। রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের সময়ে কবি কৃত্তিবাস বেঁচে থাকতে পারেন কিন্তু নবীন পণ্ডিত কৃত্তিবাস বারবাকশাহের রাজসভায় সম্বর্ধনা লাভ করেন নি। অন্যথা চৈতন্যপূর্বযুগে কৃত্তিবাসকে পাওয়া যাবে না।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের পরে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে স্থিতাবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর শিল্প সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন দেখা দিল। বৈষ্ণব গীতি কবিতা বাদ দিলে এতদিন পর্যন্ত পল্লী কবির লোকগীতি ও মঙ্গলকাব্য ছাড়া বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা ভাষা গ্রন্থ প্রচারেও বিরোধী ছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করায় কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসকে তাঁরা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দেশ করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের গতি বহতা নদীর মত। সে তার আপন গতি পথে এগিয়ে চলবেই। একই নিয়মে বঙ্গ সরস্বতীও একদিন গৌড়রাজ দরবারে এসে প্রবেশ করলেন, গৌড়ের সুলতানগণও তাঁকে জানাল স্বাগত। ইরান, তুরাণ তুর্কি, যেখান থেকেই তাঁরা আসুননা কেন দীর্ঘদিন এদেশে বাস করার ফলে বাংলার নদী-জল, মেঘ-রৌদ্র, আকাশ-বাতাস, মাটি তাঁদের ভাষা ও অনুভূতিকে একটা বিশিষ্ট রূপ দান করেছিল। মানুষ নিজের সত্তার মধ্যে যখন এই বিশিষ্ট রূপটির সন্ধান পায় তখনই জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়। বাংলার মুসলমানগণ দীর্ঘদিন এদেশে বাস করার ফলে বাংলা ভাষা হল তাঁদের মাতৃভাষা। বাঙ্গালীর শিক্ষা-সংস্কৃতিকে তাঁরা ক্রমশঃ আপন করে নিতে লাগলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ গ্রন্থ এবং বাঙ্গালী তথা হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতির রসাস্বাদনে ও তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাই গৌড় রাজ দরবারে কবি ও সাহিত্যিকদের কদর বেড়ে গেল।

গৌড়েশ্বর নাসির খাঁ মহাভারতের অনুবাদ সংকলন করান। পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত অনূদিত হয়েছিল। পরাগলের পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালেও একই ভাবে কবি আলাওল আরকান রাজ্যের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদ করেন। এইভাবে রাজদরবার ও বাংলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের আনুকূল্যে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষার চর্চা শুরু হল। হিন্দু রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও রাজানুগৃহীত এই বঙ্গ সরস্বতীকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না।

বৈষ্ণব গীতি কবিতার মাধ্যমে আত্মমুগ্ধ বাঙ্গালী জাতির রোমাণ্টিক ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করে। রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্যস্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙ্গালী মঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে ভবিতব্য ও দৈবী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে কতকটা সান্ত্বনা লাভ করেছিল কিন্তু বাঙ্গালী জাতিকে পথ দেখাতে পারে মত এমন কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ বাঙ্গালীর সামনে ছিল না। মহৎ উচ্চ জীবন আদর্শই জাতিকে সকল সঙকীর্ণতা ও গ্লানির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। পারিবারিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক বন্ধন সমাজ জীবনেও স্থিতাবস্থা আনয়ণ করে। (মুসলমান আক্রমনে বিপর্যস্ত বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের বন্ধনও হয়ে পড়েছিল শিথিল। এই অবস্থায় রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনেও উচ্চ নৈতিক আদর্শের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ এই যুগ চাহিদারই ফল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী জাতি তার আত্মস্বরূপকে প্রথম উপলব্ধি করতে শিখল) (রামায়ণে কবি কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার জীবনকে এক অখণ্ড যোগসূত্রে গ্রথিত করলেন। বাল্মীকি রামায়ণের অমর কাহিনী অবলম্বন করে আমাদের গৃহ জীবনেরই ঘরোয়া চিত্র আঁকলেন কবি কৃত্তিবাস। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করেছিল। এক কথায় বাঙ্গালীর আদর্শায়িত পারিবারিক জীবনের সুমধুর চিত্ররূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ) রামায়ণের রাম-সীতা, লক্ষ্মণ-ভরত প্রভৃতির চারিত্রিক মহিমার মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালী তার গৃহজীবনের শান্তি খুঁজে পেয়েছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের এই হল প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের শৌর্য বীর্য ও বীরত্বের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে একখানি ভক্তির আকর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে অথচ কৃত্তিবাসের সামনে বীর রসাত্মক কাব্য রচনার মত উপাদান ও সামাজিক পরিবেশ যথেষ্ট ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান শাসনে অত্যাচারিত বাঙ্গালীকে কেন্দ্র করে কবি রাবণের ভয়াবহ অত্যাচার বর্ণনা করতে পারতেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে ও কবি উভয়ের অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথে গেলেন না। রাষ্ট্র বিপ্লবে বিপর্যস্ত বাঙ্গালীর কাছে তিনি রাম নামের মাহাত্ম্য প্রচার করে তাকে অভয় মন্ত্র দিলেন। নামের এমনই মাহাত্ম্য যে রাম নাম জপ করে দস্যু বাল্মীকি সর্ব পাপমুক্ত হয়ে মুনি বাল্মীকি হলেন।

"রাম নাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে ॥
যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে।
রাম নাম স্মরণে সকল গেল দূরে ॥[১]

রাম নাম সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। রাজা দশরথ ভ্রম বশতঃ অন্ধমুনির পুত্র বধ করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য বশিষ্ঠ পুত্র বামদেবের শরণাপন্ন হন। বামদেব রাজা দশরথকে তিনবার রাম নাম জপ করিয়ে মহাপাতক থেকে মুক্ত করলেন। একবার রামনামই দশরথের পাপ মোচনের পক্ষে যথেষ্ট। বামদেব রাজা দশরথকে তিনবার রামনাম জপ করানোর জন্য পিতা বশিষ্ট তাঁকে অভিশাপ দিলেন—

"এক রাম নাম জপে কোটি ব্রহ্ম হত্যা করে
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে।
মোর পুত্র হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল।
দূর হরে বামদেব হওরে চণ্ডাল ॥[২]

লঙ্ককাণ্ডে আতিকায়, তরণী সেন, বীরবাহু ও রাবণ প্রভৃতিকে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব স্তুতি করিয়ে কবি রাম ভক্তিবাদের চরম পরাকাষ্টা দেখিয়েছেন।

রামনাম শত্রুকেও অন্তিমকালে মোক্ষ দান করে। 'রামে মার' এই শব্দ উচ্চারণ করে রাক্ষসগণ মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেছে।

১, ২ রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৯৮, ৪০৭

"রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।
রাম নাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস ॥[১]

শত্রুভাবেই হোক বা মিত্রভাবেই হোক রামনাম উচ্চারণেই মুক্তি, কবি নিজেও রাম নাম উচ্চারণ করে মুক্তি কামনা করেন—

রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রাম বিনা মিছে ॥

... ...

রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা ॥

. ...

রামনাম স্মরণে যমের দায় এরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম তরী ॥[২]

অন্যত্র আছে—রাম নাম বল ভাই মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাই আর ॥[৩]

বাঙ্গালী চিত্তে সাধারণতঃ ভক্তি প্রবণতা বেশী। বাঙ্গালী যা কিছু ভাবে যা কিছু করে তাই ভক্তির তুলসী বিল্বদলে ধৌত করে নেয়। পরম শত্রুকেও সে তার উপাস্য দেবতা করে নিতে পারে। লক্ষ্মণের হাতে রাবণ পুত্র অতিকায়ের মুণ্ড কাটা গেলে সেই কাটামুণ্ড রাম নাম উচ্চারণ করেছে। বাইরে যিনি পরম শত্রু অন্তরে তিনিই আরাধ্য দেবতা। তাই এই শত্রুর হাতে মরণেও মুক্তি।

পেয়েছি পরম রিপু পরম ঈশ্বর ॥
রাজ্যধন পরিজন কিছুই না চাই।
মরিয়া রামের হাতে গোলাকেতে যাই ॥[৪]

লংকাপুরীতে শ্রীরামচন্দ্রের আর একজন ভক্ত বিভীষণ পুত্র বালক তরণী সেন। সাক্ষাৎ নররূপী নারায়ণকে দেখবার জন্যই সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগমন করেছে। বালক তরণীসেন যুদ্ধক্ষেত্রে বালকোচিত সাজসজ্জাই করেছে। রাম নামের নামাবলী তার সমস্ত দেহে।

১, ২, ৩, ৪,। রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৭-১৫৮, ১৮৭, ৩২৪, ৩২০

অঙ্গে লেখা রাম নাম রথ চারিপাশে
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ॥[১]

কপিগণের হসিবারই কথা। ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রকে তরণীসেন কীর্তনের আসর করে তুলেছে। কীর্তনীয়াদের মতই রাম নামের নামাবলী পরে যুদ্ধক্ষেত্রে সে দেখা দিল। তরণীসেনের মত চিত্রাঙ্গদা নন্দন বীরবাহুও পরম বৈষ্ণব, যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ধনুঃশরের ব্যবহার বোধ হয় সে ভুলে গেছে। রামচন্দ্রকে বহু স্তবস্তুতি করে নিজের মরণের পথ নিজেই সে জানিয়ে দিয়েছে—

চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার।
বৈষ্ণবাস্ত্রেতে আমায় করহ সংহার ॥[২]

এহেন ভক্তের গায়ে শ্রীরামচন্দ্র আঘাত হানতে পারেন না। তিনি সীতাদেবী ও রাজ্য ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু ভক্ত বৎসল ভক্তের গায়ে হাত তুলতে পারেন না—

"কণ্টক ফুটিলে মোর ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ॥
ভক্ত মোর পিতা মাতা ভক্ত মোর প্রাণ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ ॥[৩]

রাক্ষস রাজ রাবণও শ্রীরামচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ভক্ত। তিনিও রামচন্দ্রকে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু বলে জানতেন। রাবণের যুদ্ধ যাত্রাকালে রাণী মন্দোদরী অশুভ লক্ষণ দেখে বিলাপ করতে শুরু করলে রাবণ তাঁকে বলেছিলেন—

"মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে।
বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবনে মরণে ॥[৪]

বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির ন্যায় রাবণও তাঁর মহাপরাক্রমশালী শত্রুকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দনা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের বাণে জর্জরিত তনু রাবণ আসন্ন মৃত্যুর সময় ধনুকবাণ মাটিতে ফেলে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করেছেন।

১, ২, ৩, ৪। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২০, ৩০১, ৩২০, ৩৭৬।

বান খেয়ে দশানন ভাবে মনে মন।
যোড় হাতে স্তব করে শ্রীরামে তখন ॥[১]

শ্রীরামচন্দ্র এমন ভক্তের গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারেন না।

কার্য নাই রাজ্যপাটে পুনঃ যাই বনে।
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমন ॥
কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রাম নাম না করিবে আর ॥[২]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন ভক্তকে রামচন্দ্র সংহার করলেন। রাবণ তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতির মত তাঁর ইষ্ট দেবতার হাতে ঈপ্সিত মৃত্যু লাভ করে ধন্য হলেন। রাবণ রণস্থলে মূর্ছিত হয়ে পড়লে ভক্ত বৎসল রামচন্দ্র তাঁর মুমূর্ষ ভক্তকে দর্শণ দেওয়ার মানস করলেন—

আমার পরম ভক্ত রাজা দশানন।
শাপেতে রাক্ষস যোনী হয়েছে এখন।
শরাঘাতে জর জর পড়ে রণস্থলে
একবার দরশণ দিব এই কালে ॥[৩]

রাবণ ও অন্তিম সময়ে রামচন্দ্রের মধ্যে ব্রহ্মসনাতনকে প্রত্যক্ষ করে ভক্ত হৃদয়ের অন্তিম প্রার্থনা নিবেদন করলেন,

অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়াকরে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষস কুলে জনম আমার ॥[৪]

এ ছাড়া কবি কৃত্তিবাস হনুমানের দাস্যভক্তি এবং গুহক ও বিভীষণের সখ্য ভক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র ভক্তের ভগবান। ভক্ত চণ্ডাল গুহককেও তিনি বুকে টেনে নেন। অগ্নি প্রজ্বলিত করে তিনি গুহকের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছেন। গুহক ও রামচন্দ্রকে জোর হাতে স্তব করেছে—

১, ২, ৩, ৪। রামায়ণ, প্রগুক্ত পৃঃ ৩৮০, ৩৮০, ৩৯৩, ৩৯৪, ৬৩

"অনাথের নাথ তুমি ভকত বৎসল।
করুণা সাগর হরি তুমি যে কেবল ।।
চণ্ডাল বলিয়া যদি ঘৃণা কর মনে ;
পতিত পাবন নাম তবে কি কারণে"।[১]

বনবাস যাত্রাকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সহ এক রাত্রি মিতা গুহকের গৃহে বাস করেছেন। গুহকের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের মিতালি স্থাপনের মধ্যে পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের জাতি ধর্ম বর্ণনির্বিশেষে প্রেম ধর্ম প্রচারের পূর্বাভাস মেলে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যা কাহিনী আকারে বর্ণিত হয়েছে, শ্রীচৈতন্যের জীবনে তাই প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হয়। তিনি যবন হরিদাসকে প্রেম ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং নীলাচল ভ্রমনের সময় নিজের সঙ্গী করেছিলেন।

বিভীষণ সখ্য ভক্তিতে সম্পূর্ণ আত্ম অবলুপ্তির এক বিস্ময়কর উদাহরণ। বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য নিজের ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন সকলকে ত্যাগ করেছেন। এমন কি নিজের আত্মাকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর একমাত্র দুঃখ শ্রীরামচন্দ্রের হাতে অন্তিম গতি লাভ করে পরিণামে বৈকুণ্ঠ বাস করতে পারবেন না।

ভক্তের কাছে যেমন ভগবান মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু ভগবানের কাছে ভক্তও তাই। বিভীষণ যেমন শ্রীরামচন্দ্রের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, শ্রীরামচন্দ্রের কাছেও তিনি সহোদর ভ্রাতার মত।

"বিভীষণে কন রাম করিয়া আদর।
আজি হতে তুমি মম ভাই সহোদর ।।
চারিভাই ছিলাম হৈলাম পঞ্চজন।
পঞ্চজন মিলি রাজ্য করিব পালন ।।[২]

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দাস্যভক্তির চরম বিকাশ দেখা যায় রামভক্ত হনুমানের মধ্যে। রামনাম কেবল তাঁর মুখে নহে, অন্তরের অন্তঃস্থলে—বুকের অস্থিপাঁজরেও রাম নাম রয়েছে লেখা।

১, ২। রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩ ৪২৩

"সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ" ।।[১]

শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যার সিংহাসন আরোহণ করার পর সীতা হনুমানকে নিজের গলার বহুমূল্য হার উপহার দিলেন। হনুমান তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলেন। রাম নাম লেখা নেই এমন জিনিস হনুর কাছে মূল্যহীন।

লক্ষ্মণ ঠিকই বলেছিলেন—

তোমারে জানেন রাম রামে জান তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি ।।[২]

সত্যিই রামের মহিমা হনুমান বোঝেন, হনুমানকে বোঝেন রাম। হনুমান অনুক্ষণ রামচন্দ্রের মূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করেন। সমুদ্র পারে সীতা অন্বেষণে যাওয়ার সময় তিনি মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করেছেন।

চিন্তামাত্র হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর।
দেখিয়া মারুতি মনে করেন আদর" ।।[৩]

কেবল ভক্তই ভগবানের অধীন নহেন। ভগবানও ভক্তাধীন। ভারতীয় ভক্তিবাদে ভক্ত ভগবানের যে সাযুজ্য লক্ষিত হয় রামচন্দ্র ও হনুমানের মধ্যেও সেই সম্পর্ক।

কি দিব তোমারে আমি আমিই তোমার ।।
অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন ।।[৪]

এইভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে দাস্যভক্তি, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সমস্ত মলিনতা দূর করে তাতে উজ্জ্বল কিরণ সম্পাত করেছে। হনুমানের দাস্যভক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"এই দাস্য ভক্তি বাংলা দেশে যে মাধুর্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহা দাস মনোভাবকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়া প্রভুভৃত্যের প্রয়োজনের সম্পর্ককে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ভরিয়া দিয়াছে।"[৫]

বাংলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায়ের সমান প্রাধান্য। বাঙালী

—

১, ২, ৩, ৪। রামায়ণ, পৃ ৪২৩, ২০৪, ২৩১।
৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত পৃ ৫৪৬

কেবল বৈষ্ণব ভাবের উপাসক নয়—বাঙ্গালী মাতৃমন্ত্রেরও সাধক। মহাশক্তিকে মাতারূপে, কন্যারূপে বাঙ্গালী উপাসনা করেছে। বাঙ্গালীর শক্তিসাধনা থেকেই কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে দিয়ে দেবীর অকাল বোধন করিয়েছেন। তবে শাক্ত প্রভাব অপেক্ষা কৃত্তিবাসের রামায়ণে বৈষ্ণব প্রভাবই বেশী। কারণ রাজ্যহারা, ধর্মহারা বাঙ্গালীর সেদিন শৌর্যবীর্য প্রকাশের অবকাশ কোথায়? কবি কৃত্তিবাসও তাই তাঁর রামচন্দ্রের সমস্ত শৌর্য ও বীরত্বের মহিমা দূরে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে তুলসী চন্দনে লিপ্ত প্রেমের দেবতা রূপে চিত্রিত করেছেন। রাম রাবণের যুদ্ধক্ষেত্র হয়েছে গৈরিক রেণু রঞ্জিত. খোল করতালের বাদ্য মুখরিত বাংলার সংকীর্তন ভূমি। দুর্ধর্ষ রাক্ষসরা হয়েছে বৈষ্ণবীয় প্রেমে মাতোয়ারা আত্মবিলুপ্ত ভক্তদল। তাছাড়া যুগদ্রষ্টা কবি রামায়ণে পরবর্তী চৈতন্যযুগের প্রেমধর্মেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন।[১] চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যেমন বংশী শিক্ষা খণ্ডে চৈতন্য আবির্ভাবের ইঙ্গিত রয়েছে—

"আজু কেনে দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোহার চরিত।

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে! এইরূপ হইবে কোন দেশে।[২]

ঠিক সেভাবেই চৈতন্যের প্রেমধর্মের ছায়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে, পূর্ণতা বৈষ্ণব পদাবলীতে। সুতরাং ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের অভিমত, শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব থেকে রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব প্রবেশ করেছে।[৩]" একথা সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। বাংলার শস্যশ্যামল পলিমাটিতে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে যে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা প্রবাহিত কবি কৃত্তিবাস দেশকাল, জনজীবনও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিলিয়ে তাই তাঁর রামায়ণ পাঁচালীতে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁদেরই উত্তর সাধক। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সীতা বিরহে আত্ম বিস্মৃত শ্রীরামচন্দ্রের করুণ বিলাপের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির শ্যামবিরহিণী শ্রীরাধার নিদারুণ মর্ম বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছে।

১, ৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত পৃ, ১১৯।

২। চণ্ডীদাস পদাবলী, ১ম খণ্ড, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৪১, পৃঃ ১৪২

বিদ্যাপতির রাধার উক্তি—

সুর তরুতল তব ছায়া ছোড়ল
হিমকর বরিখয় আগি।
দিনকর দিন কলে সীত ন বারল
হম জীয়ব কথি লাগি ।। ২
সজনি অব নহি বুঝি এ বিচার।
ধনকা আরতি ধনপতি ন পূরল
য়হল জনম দুঃখ ভার [১] ॥ ৪

এবং চণ্ডীদাসের রাধাও যখন বলেন—

"(সই গো) বিষম হইল বড়ি।
এক দণ্ড যারে না দেখিলে মরি
কেমনে রহিব ছাড়ি ।।
কাহারে কহিব মনের মরম
কহিতে বাসিয়ে ভয়" ।। [২]

তখন মানব জীবনের চিরন্তন বিরহী আত্মার আকুল ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যায়। কবি কৃত্তিবাস সীতা বিরহী শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে মানব জীবনের এই বিরহ বেদনাকে আরও বাস্তবায়িত করে তুলেছেন। চণ্ডীদাসের রাধারই প্রতিধ্বনি করে কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র বলেন—

"দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে ॥
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি
সীতা বিনা আমি যেন মনি হারা ফণী ॥"[৩]

১। বিদ্যাপতি, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্র নাথ মিত্র, ২য় সংস্করণ, ১৩৪৮, পৃঃ ২১৮

২। চণ্ডীদাসের পদাবলী, বিমান বিহারী মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২য় সং পৃ, ২৫১

৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, ভূমিকা, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ, ১৫০।

বৈষ্ণবীয় ভাবধারার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। ইন্দ্রজিতের নাগপাশের বন্ধন থেকে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে উদ্ধার করলে রামচন্দ্র পক্ষীকে বর দিতে চাইলেন। নির্লোভ পক্ষী ধন সম্পদ কিছুই চাইল না। ভক্তের কাছে ভগবানই একমাত্র কাম্য বস্তু। শ্রীরামচন্দ্রকে সে ত্রিভঙ্গ মোহন মুরলী ধারীরূপে একবার দেখতে চাইল, ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন-

এতেক মন্ত্রনা করি বিনতা নন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥
ভকত বৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাঁড়াইল ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে ॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।"[১]

শ্রীরামচন্দ্রকে এভাবে বংশীধারীরূপে চিত্রিত করার মধ্যে কৃত্তিবাস কবির বৈষ্ণবীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের শ্রীরামচন্দ্র নরচন্দ্রমা নন, তিনি ভক্তের ভগবান—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। দুর্ধর্ষ রাক্ষসেরা এবং কবি নিজেও এই বিগ্রহের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই দিক দিয়ে কৃত্তিবাস কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমগোত্রীয়। বিলাসকলা কুতুহলী জয়দেব কবিও প্রেমের বিচিত্র বর্ণ সম্ভার থেকে দূরে সরে গিয়ে এক সময়ে পরম প্রিয়ের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করেছেন—

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবণম্।
ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নম্ ॥
ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী।
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নম্ ॥[২]

মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও পূর্বরাগ, অভিসার বিরহ মিলনের দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত হয়ে সর্বশেষে সংসার সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য রাধা মাধবের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। কবির বিনম্র প্রার্থনা—

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬১

২। কবি জয়দেব ও গীত গোবিন্দ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৩য়-সংস্করণ, ১৩৬২, পৃ, ১১৭।

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দএ তুলসীতিল এ দেহ সোঁপল।

করম বিপাক গতাগত পুনঃ পুনঃ
মতি রহ তুঅ পরসঙ্গ ॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরইত ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন"[১]
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ৮

কৃত্তিবাস কবিও একই সুরে সুর মিলিয়ে ভবসিন্ধু পারি দেওয়ার জন্য রাম নামের ভেলা অবলম্বন করেছেন—

"রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা,
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা" ॥[২]

কৃত্তিবাস কবির এই রাম নাম মাহাত্ম্য প্রচারের মধ্যে পরবর্তী চৈতন্য যুগে নাম মাহাত্ম্য প্রচারেরও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুই জাতীয় মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে ভারতবাসী তাঁর আত্মস্বরূপকে করেছে উপলব্ধি। ভারতবাসীর যা চিন্তা, যা ভাবনা রামায়ণ ও মহাভারত তারই বাঙ্‌ময় মূর্তি। বিরাট বনস্পতির মতই এই দুই মহাকাব্য ভারতবাসীকে ছায়া দান করেছে, আশ্রয় দান করেছে। আসমুদ্র হিমাচল ভারত জনপদবাসীর মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। কবি গুরু বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যকে অবলম্বন করে ভারতে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ কাহিনী রচনা করেছেন। এ সকল রামায়ণ কাহিনী দেশকাল ও আঞ্চলিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বভারতীয় রূপ লাভ করতে পারেনি। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসী দাসী রামায়ণ, কম্বনের তামিল রামায়ণ, মাধব কন্দলীর অসমীয়া রামায়ণ প্রভৃতি মূল কাহিনী ছাড়া সর্বাংশেই কবির নিজস্ব সৃষ্টি। বিষয়বস্তু সন্নিবেশের ক্ষেত্রেও তাঁরা

১। বিদ্যাপতি, অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রী খগেন্দ্র নাথ মিত্র, ২য় সং, ১৩৪৮, পৃ ২৭৯।
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭

অনেকস্থলে বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে কেবল বাল্মীকি রামায়ণ বহির্ভূত বহু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা নয়, বাল্মীকি বর্ণিত কাহিনীগুলিও পরিবর্তন ও পরিবর্ধণ করে কৃত্তিবাস সেগুলিতে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছেন।

বাল্মীকি রামারণের প্রথম কাণ্ডটি বালকাণ্ড নামে পরিচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম কাণ্ডটির নামকরণ করা হয়েছে আদিকাণ্ড। বাল্মীকি রামায়ণের শুরু দেবর্ষি নারদের কাছে বাল্মীকির এক প্রশ্ন দিয়ে—

"সমগ্রা রূপিনী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতানরঃ[১]

কোন একটি মাত্র 'নর'কে আশ্রয় করে সমগ্রা লক্ষ্মীরূপ গ্রহণ করেন? নারদ বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে দেবদুর্লভ চরিত্র শ্রীরামচন্দ্রের সমগ্র জীবন কাহিনী বর্ণনা করেন। বাল্মীকি সেই কাহিনী অবলম্বন করে ছন্দোবদ্ধ রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিষ্ণুর এক অংশ চারি অংশ হয়ে মানব জন্ম গ্রহণ করার সংকল্প দিয়ে শুরু—

"মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইবে প্রকাশ" ।।[২]

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্যু রত্নাকর। প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে 'মরা মরা' জপ করতে করতে তিনি রাম নাম জপ অভ্যাস করেন। রাম নাম জপ নিরত দস্যু রত্নাকর মুনি বাল্মীকিতে পরিণত হন। কৃত্তিবাস বর্ণিত মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র, সৌদাস রাজার উপাখ্যান, জহ্নু মুনির কথা, রঘু ও অজ-ইন্দুমতীর কাহিনী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রভৃতির সঙ্গে দশরথের বিবাহ বর্ণনা, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দশরথের ছলনা বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডে নেই। যজ্ঞ রক্ষার্থে বিশ্বামিত্রের রামলক্ষ্মণকে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির অনুসরণ করলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃত্তিবাস একটুখানি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে দশরথ অত্যধিক স্নেহ বশতঃ প্রথমে রামলক্ষ্মণকে দিতে অস্বীকার করলেও পরে বিশ্বামিত্রের অভি-শাপের ভয়ে এবং বশিষ্ঠের অনুরোধে তাঁদের বিশ্বামিত্রের সংগে পাঠালেন।

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত পৃঃ ১

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১

কৃত্তিবাসের দশরথ প্রথমে রাম লক্ষ্মণের পরিবর্তে ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠালেন। পরে বিশ্বামিত্রের উন্মত্ত ক্রোধ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে যজ্ঞোত্থিত চরু রাজা দশরথ তিন রাণীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন চরুর অংশ কৌশল্যা (আটআনা), কৈকেয়ী (দু'আনা), সুমিত্রা (ছয়আনা) পেয়েছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে চরু বিভাজনের এই রীতি নেই, দশরথ চরু দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ কৌশল্যাকে এবং আর এক ভাগ কৈকেয়ীকে দেন। সুমিত্রার সঙ্গে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর চুক্তি হয় যে সুমিত্রার সন্তান কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর সন্তানের সঙ্গী হবে। (কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেন নি। বাল্মীকি থেকে কাহিনী অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করে তার সঙ্গে স্বীয় কল্পনার সংমিশ্রণ করেছেন)

(কৃত্তিবাসী রামায়ণে অহল্যা শুদ্ধচারিণী, পতিগতপ্রাণা। গৌতম বেশী ইন্দ্রকে সে চিনতে পারেনি। তাই গৌতম বেশী ইন্দ্রের কামনা সে পূর্ণ করেছিল—

''গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায় ।।
অহল্যা গৌতম জ্ঞানে করে সম্ভাষণ ।
আজি প্রাতকালে কেন ঘরে আগমন ।।
ইন্দ্র বলে তবরূপ হইল স্মরণ ।
কেমনে করিব প্রিয়ে তপস্যাচরণ'' ।।[১]

কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে অহল্যা ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে মুনিবেশী দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়! ইন্দ্রের কাছে সে সানুনয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে ইন্দ্র যেন নিজেকে এবং অহল্যাকে গৌতমের ক্রোধ থেকে রক্ষা করে—

"মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন ।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজ কুতুহলাৎ ।। ১৯
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো [২] ।। ২০

১। রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯
২। বাল্মীকি রামায়ণম্, আদিকাণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৮৮

(কৃত্তিবাস দশরথের বংশ পরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পূর্ব পুরুষদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করে কবি যেন দশরথের বংশকেই রাবনারি মহাবীর রামচন্দ্রের আবির্ভাবের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।) (কবিগুরু বাল্মীকিও দশরথের বীরত্বের বর্ণনা দিতে কার্পণ্য করেন নি কিন্তু কৃত্তিবাসের দশরথের বীরত্ব সমাধিক বিকশিত হয়েছে।) (অযোধ্যাপতি দশরথকে দেবরাজ ইন্দ্রও ভয় পান, শনির কোপ-দৃষ্টিকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। দেবারি সম্বরকে বধ করে তিনি দেবতাগণকে নির্ভয় করলেন। (সেই দশরথের আত্মজ লক্ষ্মণ বাসববিজয়ী মেঘনাদকে বধ করবেন। তাতে আর আশ্চর্য কি? কৃত্তিবাস রামলক্ষ্মণের মধ্যে বংশানুক্রমিক বীরত্ব আরোপ করেছেন।)

(বাল্মীকি রামায়ণে শৃঙ্গবের পুর সমীপস্থ গঙ্গাতীরে সখা গুহকের সঙ্গে রামের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।) রামের সঙ্গে তাঁর কখন সখ্যতা স্থাপিত হয় তার উল্লেখ নেই। (কৃত্তিবাস গুহক ও শ্রীরামের বন্ধুত্বের বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন।) রাজা দশরথ একদিন তাঁর পুত্রকে সঙ্গে করে শৃঙ্গবের পুর পার হয়ে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করলেন। পথে নিষধাধিপতি গুহক দশরথের পথ রোধ করে দাঁড়ালে দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ হল। রামচন্দ্রকে না দেখালে গুহক কিছুতেই পথ ছাড়তে রাজি হল না। দশরথও রামকে দেখাবেন না। দশরথ গুহককে পাশুপাত অস্ত্রদ্বারা বন্ধন করে রথে তুললেন। গুহক রামচন্দ্রের দর্শণ অভিলাসে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করল। সে পায়ে ধনুক টেনে পায়ে বাণ ছাড়তে লাগল। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন গুহক রামচন্দ্রের কাছে করজোড়ে নিজের পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করল। (এই গুহক ছিল বশিষ্ঠের পুত্র বামদেব। দশরথকে তিনবার রামনাম বলানোর জন্য তিনি পিতার অভিশাপে চন্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। অতঃপর রামচন্দ্র অগ্নি প্রজ্বলিত করে গুহকের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন।) বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রামের অভিষেকের সময় কৈকেয়ী দশরথের কাছে বর প্রার্থনা করলে পাঠককে বিস্মিত হতে হয়। কবি কৃত্তিবাস পাঠককে আগেই জানিয়ে রেখেছেন কি কারণে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর কাছে সত্যবন্ধ ছিলেন। কৈকেয়ী কর্তৃক রাজা দশরথের দূষিত ব্রণের পুঁজ চুষে নেওয়ার কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নেই, এই অংশটি কবির স্বকপোলকল্পিত।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাজা দশরথের উদ্দেশ্যে সীতার দ্বারা বালির পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গু নদীর শ্রীরামচন্দ্রের কাছে মিথ্যা সাক্ষীদান, এদের তিন-জনকে সীতার অভিশাপ ও সত্য সাক্ষীদানের জন্য বটবৃক্ষকে আশীর্বাদ করার ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। (কৃত্তিবাসের সীতা কোমল হৃদয়া বাঙালী ঘরের বধূ। রাবণকে দেখে ভয়ে তিনি কলাপাতার মত কাঁপছেন—

"একাকিনী আমারে পাইয়া বন মাঝ
হরিস আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ॥
করে দুষ্ট কুড়ি পাটি দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি" ॥[১]

বাল্মীকির সীতা অধিকতর দৃপ্ততেজা, ক্ষাত্রিয়ানী; বীরবালা, বীর জায়া তিনি, রাক্ষসাধম রাবণকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় মনে করেন—

"ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্পষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা।
পাদপান্ কাঞ্চনান্ নূনং বহূন পশ্যসি মন্দভাক্
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং যন্তমিচ্ছসি রাক্ষস ॥[২]

আমি সিংহী তুই শৃগাল। তুই আমাকে পাওয়ার যোগ্য নহিস। আমাকে পাওয়ার ইচ্ছা করিস, কিন্তু সূর্য প্রভার ন্যায় আমাকে কখনো স্পর্শ করতে পারবি না। হতভাগ্য রাক্ষস তুই রঘুনন্দন রামের পত্নীকে লাভ করার ইচ্ছা করে নিশ্চয় বৃক্ষসকল স্বর্ণময় দেখেছিস।

(হনুমানের লঙ্কা দাহন বর্ণনায় কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করলেও ঘটনা সংস্থাপনে নূতনত্ব আরোপ করেছেন। বাল্মীকির হনুমান লেজের আগুনে লঙ্কা দাহন করে সাগর জলে আগুন নেবান—

"লঙ্কা সমস্তাং সম্পীড্য লাঙ্গুলাগ্নিং মহাকপিঃ।
নির্বাপয়ামাস তদা সমুদ্রে হরিপুঙ্গবঃ ॥[৩])

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪
২, ৩। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৪, ৮৪৫

এইভাবে বানরপুঙ্গব সমগ্র লঙ্কাপুরী দহন করে সাগর জলে লেজের আগুন নেবালেন।

(কৃত্তিবাসী রামায়ণে সাগর জলে হনুমানের লেজের আগুন নেবেনি। সীতার নির্দেশে হনুমান জ্বলন্ত লেজ মুখের ভিতর পুরে দিলে তবে আগুন নিবল।

সীতা বলে মুখামৃত দেহ হনুমন্ত।
নির্বাণ হইবে জ্বালা নাবে একান্ত ॥
তবে হনু হয়ে অতি জ্বালায় কাতর।
জ্বলন্ত আগুন পুরে মুখের ভিতর ১)॥

/আগুন ত নিবল, কিন্তু মুখপোড়া হনুমান যে জ্ঞাতি বর্গের কাছে হাস্যাস্পদ হবে। তাই মা জানকীর বরে হনুমানের জ্ঞাতিবর্গ সকলে মুখ পোড়া হয়ে রইল।)

(এইভাবে দেখা যায় কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে কোথাও বাল্মীকিকে হুবহু অনুসরণ করেন নি। বাল্মীকি রচিত কাহিনীর তিনি অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে তাকে পত্রপুষ্প পল্লবে সুশোভিত করেছেন কিন্তু কোথাও বাল্মীকি রামায়ণের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারেন নি।) দেশকাল ও জন জীবনের প্রভাবেও দুই কবির কাব্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রাক্ বৌদ্ধযুগে শান্তস্নিগ্ধ তপোবন পরিবেশে বাল্মীকি রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন। আর (কৃত্তিবাস পণ্ডিত মধ্যযুগীয় এক অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশে রামায়ণ পাঁচালী রচনা করেছেন। কবিগুরুর ভাষা গুরুগম্ভীর সংস্কৃত, ছন্দ অনুষ্টুপ। কৃত্তিবাসের ভাষা মধ্যযুগীয় বাংলা। ছন্দ পয়ার, চৌপদী ও লাচাড়ী। কাজেই কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের অনুরূপ গাম্ভীর্য ও বীর রস প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।)

(কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ নহে। বাল্মীকি থেকে কাহিনী মাত্র সংগ্রহ করে তিনি স্বীয় কল্পনা ও সৃজনী শক্তির সাহায্যে তাকে নবরূপ দান করেছেন। কাজেই কাহিনী অংশটুকু ছাড়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ সর্বাংশেই কবির নিজস্ব সৃষ্টি। বাল্মীকি ছাড়া কৃত্তিবাস অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, পুরাণ, স্মৃতিগ্রন্থ ও

১। রামায়ণ বিরচিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭

সংস্কৃত কাব্য, নাটক প্রভৃতি থেকে তাঁর রামায়ণ কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে কবির নিজের মুখে তা ব্যক্ত হয়েছে।

"কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর।
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম ভিতর ॥
"হস্তপদ দেহমুণ্ড কাটা যাবে যবে।
শঙ্কর কুড়ায়ে লয়ে অঙ্গ জোড়া দিবে ॥
পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে ॥"[১]

বাল্মীকির 'রাম' জপ করার পরিবর্তে 'মরা মরা' বলে জপ করার ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণে নেই, অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড থেকে কবি এই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। হনুমানের বিশল্যকরণী আনার সময়ে কালনেমির হনুমানকে বাধা দান এবং রামাভিষেকের পর সীতা তাঁকে বহুমূল্য হার দান করলে রাম নাম না থাকায় হনুমান কতৃক তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলার যে কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে তা বাল্মীকি রামায়ণে অনুপস্থিত। কবি কৃত্তিবাস অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে এই দুটি কাহিনী সংগ্রহ করেছেন।[২]

হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান, শ্রীরামচন্দ্র কতৃক দেবীর অকালবোধন, বিন্ধপর্বতের বৃদ্ধি নিবারণের জন্য অগস্ত্যের দক্ষিণাপথে যাত্রা প্রভৃতি ঘটনা কবি দেবী ভাগবত থেকে নিয়েছেন।[৩] হরিশচন্দ্রের ঘটনাটি মার্কণ্ডেয় পুরাণে[৪] এবং দেবীর অকাল বোধনের ঘটনাটি বৃহদ্ধর্মপুরাণেও[৫] বর্ণিত হয়েছে। ভাগী-

১। রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯১,

২। অধ্যাত্ম রামায়ণম্, মহর্ষি দ্বৈপায়ণ, অনুবাদ, বলাই চাঁদ গোস্বামী, পৃ: ১৬৬, ৫০৫, ৫০৮,

৩। দেবী ভাগবত, শ্রীরাম শর্মা আচার্য প্রণীত, সংস্কৃতি সংস্থাপন, ১৯৩০, পৃঃ ২৩৬-২৪১, ২৯২-২৯৯, ১৬১০,

৪। মার্কেণ্ডেয় পুরাণম্, মন্মথনাথ দত্ত সম্পাদিত, ১৮৯৭, ইলিয়াস প্রেস, পৃঃ ২৬-৩১,

৫। বৃহধর্মপুরাণম্, এম, এম. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ১৩৫-১৪২,

রথের গঙ্গা আনয়ন সাগরতীরে সেতুবন্ধে শ্রীরামচন্দ্রের শিবপ্রতিষ্ঠা এবং জটায়ু ও দশরথের কাহিনী কূর্মপুরাণের অন্তর্গত।[১] রামেশ্বর সেতুবন্ধে শিবপ্রতিষ্ঠার কাহিনী শিব পুরাণেও পাওয়া যায়।[২] দশরথের রাজ্যে শনির কোপদৃষ্টি পড়ার ঘটনা কালিকা পুরাণ[৩] ও স্কন্ধ পুরাণের অন্তর্গত।[৪]

শিবপুরাণ[৫] ও জ্ঞানসংহিতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বনবাস কালে সীতার দশরথকে পিণ্ড দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইহা ছাড়া সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতি থেকেও তিনি তাঁর রামায়ণ কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ডে বর্ণিত শ্লোক—

"শশক গাণ্ডার কূর্ম গোধিকা শাল্লকী।
ভক্ষনীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চ নখী।।
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর।
আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির।।[৬]

এর সঙ্গে ভট্টিকাব্যে বর্ণিত ৬।১৩৪ সংখ্যক শ্লোকের অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে—

"পঞ্চ পঞ্চ নখা ভক্ষ্যা যে প্রোক্তনঃ জৈম্বিক্তৈঃ।
কোশল্যাজ শশাদীনাং তেষাং নৈকোহপ্যাহং কপি।"[১]

লবকুশের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ ও পরাজয় বাল্মীকি রামায়ণে নেই। জৈমিনী ভারত থেকে এই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন বলে কবি নিজের মুখেই তা ব্যক্ত করেছেন—

'এইসব গাইল গীত জৈমিনী ভারতে'।

কেবল সংস্কৃত কাব্য নাটক থেকে নহে, প্রচলিত লোক গাথা থেকেও কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ কাব্যের অনেক কাহিনী সংযোজিত করেছেন। ভস্মলোচনের কাহিনীটি প্রচলিত লোকগাথা থেকে সংগৃহীত এরূপ একটি কাহিনী। শনির কোপ দৃষ্টি যার উপর পড়বে তার মাথা কাটা যাবে এই কাহিনীটিও অনেকটা ভস্মলোচনের কাহিনীর মত। শনির কোপ দৃষ্টিতে গণেশের মাথা কাটা যায় এবং উত্তর শিয়র প্রাণীর মুণ্ড গণেশের মাথায় লাগিয়ে গণেশকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়। মধ্যযুগে ইউরোপেও এই ধরনে কাহিনী প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভস্মলোচনের কাহিনীর সঙ্গে গ্যাফিল উপাখ্যানের ব্যালরের কাহিনীর নিকটতম সাদৃশ্য রয়েছে। ভস্মলোচনের চোখের দৃষ্টি যেখানে পড়বে সেখানে সব ধ্বংস হয়ে যাবে বলে সে সব সময় চোখে টুলি পরে থাকত। ব্যালরকেও তার ভয়ংকর একটি চোখ বন্ধ করে থাকতে হত। বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সে তার একটি চোখ খুলে বিপক্ষের সৈনা ধ্বংস করতো।

"Balor, the terrible monster-god of the Gales is said to have been a son of Buarainech, i e, 'Cow-faced.' Though he had two eyes, one was always kept shut for it was so venomous that it slew any one on whom its look fell. Neither God nor giant seems to have been exempt from its dānger. So that Balor was only allowed to live on condition that he kept his terrible eye shut. On days of battle he was placed opposite to the enemy, the lid of the destroying eye was lifted

১। ভট্টিকাব্যম, প্রাণশঙ্কর ও কমলাশঙ্কর ত্রিবেদী, সেণ্ট্রাল বুক ডিপো, বম্বে, ১৮৯৮, পৃঃ ১০৯।

up with a book, and its qaze withered all who stood before it.'[১]

ভষ্মলোচনের কাহিনীর সঙ্গে ব্যালরের কাহিনীর সাদৃশ্য দেখে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন অনুমান করেন মধ্যযুগে বাংলাদেশ থেকে এই কাহিনী ইউরোপে গমন করেছিল। সম্ভবতঃ মধ্যযুগে ইউরোপীয় বণিকেরা যখন এদেশে আসত তারা এদেশের বিভিন্ন সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে নিজ দেশে নিয়ে যেত। ক্রমশঃ সেই দেশের লোক সাহিত্যের সঙ্গে মিশে এই কাহিনীগুলি নূতন রূপ গ্রহণ করত, তবে মাতৃভূমির প্রাচীন কাহিনীর সঙ্গে উহার কিছুটা মিল থাকত। তাই ভষ্মলোচনের কাহিনীর সঙ্গে ব্যালরের কাহিনীর এতটা নিকটতম সাদৃশ্য দেখা যায়।[২]

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে ব্যালরের কাহিনীর মিল দেখে একটি অপরটিকে প্রভাবিত করেছে একথা বলা যায় না। কারণ যুগে যুগে, দেশে দেশে এমন সব লোক-সাহিত্যের কাহিনী গড়ে উঠেছে যে কাহিনীগুলির মধ্যে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের একটা মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বাধীনভাবেই গড়ে উঠে। ম্যাকডোনাল এমত সমর্থন করে বলেছেন একই জাতীয় কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই সময়ে গড়ে উঠলে সেগুলি একটি আর একটিকে প্রভাবিত করেছে বলার কোন কারণ নেই।[৩] কৃত্তিবাস পণ্ডিত বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও পুরাণ, স্মৃতি গ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃত নাটক, কাব্য, প্রচলিত লোক গাথা এবং সর্বোপরি স্বকপোল কল্পিত বহু কাহিনী সংযোজিত করে রামায়ণ কাব্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে কাহিনী সংগৃহীত হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ টুকরো টুকরো কাহিনীর সমষ্টি মাত্র নহে। কাহিনীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও নয়, বরং পরস্পর সংশ্লিষ্ট। কবি প্রতিভার জারক রসে জারিত হয়ে কাহিনীগুলি এক অখণ্ড সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে। এখানেই কৃত্তিবাস

১। Folk-literature in Bengal, Dinesh Ch, Sen, CU. 1920 pp. 18, 19.

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫।

৩। A History of Ancient Sanskrit Literature, A. A. Macdonell, 3rd Indian Edition, Delhi, P-308.

পণ্ডিতের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। কবির সৃজনী প্রতিভা কবিকে করেছে কালোত্তীর্ণ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নহে। বাল্মীকি রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থাদি থেকে কাহিনী মাত্র সংগ্রহ করে তিনি নিজস্ব কল্পনা ও সৃজনী শক্তির সাহায্যে তাকে নবরূপ দান করেছেন। কৃত্তিবাসের অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে তাঁর রামায়ণ পাঁচালী সর্বাংশে মৌলিক রচনার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। আবার কৃত্তিবাসী রামায়ণে এমন অনেক কাহিনী আছে যা সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত। তাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। ঘটনা সংস্থাপন এবং চরিত্রচিত্রনেও কবি স্বীয় বৈশিষ্ঠ্যের ছাপ রেখেছেন, বাল্মীকির অনুসরণ করেন নি। বাল্মীকির সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রধানত শৌর্য বীর্য বীরত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল। কৃত্তিবাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলি সাধারণত ভক্তিপ্রবণ আবেগধর্মী। বাল্মীকির রাম মানবশ্রেষ্ঠ নরচন্দ্রমা। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভক্ত বৎসল। বাল্মীকির রামায়ণের প্রধান রস করুণ রস হলেও বীর রসের অভাব নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের একমাত্র অবলম্বন করুণ রস। বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও লঘু পরিহাস তরলতা নেই। কৃত্তিবাস মধ্যযুগীয় বাঙ্গালী মনোভাবের অনুরূপ হাস্যরসের আমদানী করেছেন।

কৃত্তিবাসের স্বরচিত কাহিনী গুলির মধ্যে রাম রাবণের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে হরপার্বতীর কলহ, অঙ্গদরায়বার, রাবণের মুকুটসহ অঙ্গদের রামের নিকট গমন, হনুমান কর্তৃক সূর্যকে বগলদাবা করে মধ্যরাত্রিতে উদয় হতে না দেওয়া। হনু-ভানুর কোলাকুলি. ভরতের বাঁটুলের আঘাতে হনুমানের মূর্ছা, মহীরাবণ কর্তৃক রাম লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে যাওয়া, হনুমানের পাতাল প্রবেশ, মহীরাবণ বধ ও রাম লক্ষ্মণকে উদ্ধার, অহিরাবণ বধ, রাবণ কর্তৃক অম্বিকার স্তব, রাবণকে অম্বিকার অভয়দান, রাবণ বধের জন্য রামের অকাল বোধন. অষ্টোত্তর শত নীলোৎপলে রামের দেবী আরাধনা, দেবী কর্তৃক নীলোৎপল হরণ, ধনুর্বান দ্বারা রামের নিজের চোখ উপড়ে নীলোৎপলের ঘাটতি মিটানো, দেবীর আবির্ভাব ও রাবণ বধের জন্য রামকে বরদান রাবণের চণ্ডী পাঠের সময় হনুমান কর্তৃক বিশুদ্ধ চণ্ডীপাঠে বাধা দান, মন্দোদরীর কাছ থেকে ব্রাহ্মণবেশী হনুমানের রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, অন্তিম সময়ে রাবণের রামচন্দ্রকে রাজনীতি শিক্ষাদান, রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর

রামদর্শনে আগমন ও শ্রীরামচন্দ্রের নিকট অবৈধব্য বর লাভ, রাণী মন্দোদরী ও অন্যান্য রাক্ষস রমণীদের সীতাকে অভিশাপ দেওয়া। শ্রীরামচন্দ্রের সম্ভাষণ, হনুমানের সীতা প্রদত্ত হার ছিড়ে টুকরা টুকরা করা এবং নিজের বুকের চামড়া চিরে অগ্নিময় রাম নাম দেখানো, সীতা কর্তৃক হনুমানকে অন্ন পরিবেশনের সময় পরিবেশন করতে করতে সমস্ত অন্ন শেষ হয়ে যাওয়া, সীতা কর্তৃক হনুমানের মাথায় 'নমঃ শিবায়' বলে একটা অন্ন ফেলে দেওয়ার পর হনুমানের তৃপ্তি লাভ, বনবাস যাপনের সময় লক্ষ্মণের অনাহারে ও অনিদ্রায় ব্রহ্মচর্য পালন, রামচন্দ্র প্রভৃতি চার ভাইয়ের লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধ ও পরাজয় ইত্যাদি বাল্মীকি রামায়ণ বহির্ভূত বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনীগুলির অধিকাংশই কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। বাকি কয়েকটা তিনি বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত কাহিনীগুলিও কবি প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে [illegible] পুরাতনের খোলস ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যের বা অন্য কোন পুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থের অনুবাদ নহে, কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এখানেই কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠত্ব—কবি প্রতিভার মৌলিকতা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যের মহাসমারোহ নেই—নেই মহাকাব্যের সর্বাঙ্গীন বিস্তৃ[illegible]লতা, মহাকাব্যোচিত গুরু গাম্ভীর্য ও চরিত্রের উদাত্ত মহিমা ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে অনুপস্থিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ একান্তই বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মানবের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, [illegible] [illegible]-ক্ষুদ্রতা, দীনতা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি মানব হৃদয়ের স্বভাব অনুভূতির [illegible] রূপকার তিনি। তাই তাঁর রামায়ণে রয়েছে একদিকে মানবিকতার [illegible] বিকাশ, আর একদিকে রয়েছে আত্ম সর্বস্ব নীচ স্বার্থবুদ্ধির [illegible] প্রকাশ।

বাল্মীকির রামায়ণে মানবের বৃহৎ সুখ, বৃহৎ দুঃখের আবর্তে জীবনের ছোটখাট সুখ দুঃখের কথা কোন সুদূর অতলে বিলীন হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মান-অভিমান, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি প্রকাশ করার অবকাশ ঋষি কবির ছিল না। কিন্তু মানবিক অনুভূতির চরম প্রকাশেই কৃত্তিবাসের স্বার্থকতা। এক কথায় কৃত্তিবাস মানব জীবনের ছোটখাট সুখ-দুঃখের কথা তাঁর রামায়ণ কাব্যে প্রকাশ করেছেন।

রাজা দশরথ যজ্ঞোত্থিত চরু কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে সমান ভাগ করে

দিলেন কিন্তু সুমিত্রাকে দেননি। সুমিত্রা, কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর কাছ থেকে তাঁদের চরুর এক অংশ পেয়েছিলেন। বহু পত্নীক স্বামী কখনো সব পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারেন না। রাজা দশরথেরও তাই হয়েছিল। যজ্ঞোত্থিত পুত্রপ্রদ চরু থেকে তিনি রাণী সুমিত্রাকে বঞ্চিত করলেন। অভিমানিনী সুমিত্রার তাই খেদোক্তি—

উর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস্।
কোন দ্রব্য খেতে রাজা না করে আশ্বাস ॥[১]

দেবী কৌশল্যা স্বামী স্নেহবঞ্চিতা এই সপত্নীটিকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেন —মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী[২]

দশরথের সিন্ধুবধে, মাতা পিতার পক্ষে সন্তান হারানোর দুঃখ যে কি গভীর মর্মস্পর্শী তা প্রকাশ পেয়েছে। মাতাপিতার কাছে সব সন্তান সমান বলা হয়ে থাকে কিন্তু মানুষের স্নেহ মমতা কখনো সমদর্শী হতে পারে না। মাতাপিতার কাছেও তাঁদের সব সন্তান সমান নয়। মাতাপিতার সন্তান স্নেহের মধ্যেও কম বেশী তারতম্য আছে। রাজা দশরথেরও অন্যান্য পুত্রদের অপেক্ষা রামচন্দ্রের প্রতি অধিক স্নেহ ছিল। দশরথ স্নেহাধিক্য বশতই রামলক্ষ্মণের পরিবর্তে ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠালেন। স্বার্থপরতা মানুষকে যে কত ক্ষুদ্র ও নীচ করে তোলে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কৈকেয়ী। কৈকেয়ী ধর্ম, ন্যায়, নীতি ও রঘুকুলের চিরাচরিত রীতি সব বিসর্জন দিয়ে নিজের সন্তানের জন্য রাজসিংহাসনের ব্যবস্থা করলেন। কেবল সিংহাসন নয়---সেই সিংহাসনকে নিরাপদ করার জন্য তিনি সপত্নীপুত্রকে জটাবল্কল পরিয়ে বনবাসে পাঠালেন। কবি কৈকেয়ীর মধ্যে যেমন নীচ স্বার্থ বুদ্ধির উৎকট প্রকাশ দেখিয়েছেন তেমনই জননী সুমিত্রার মধ্যে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশও দেখিয়েছেন। রামের বনগমনের সময় তিনি পুত্র লক্ষ্মণকে রাজগৃহের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে অগ্রজ রামকে অনুসরণ করার জন্য বার বার অনুপ্রাণিত করেছেন—

সুমিত্রা বলেন শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞান রামেরে করিও সর্বক্ষণ ॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব শাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী ॥[৩]

১, ২, ৩। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১, ১০৩

পত্নীগত প্রাণ রামচন্দ্র মারীচ বধ করে এসে শূন্য কুটিরে সীতাকে না দেখে করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলেন। পত্নী বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই হৃদয়বিদারক।

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে ॥[১]

অন্যত্র আছে—দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিণা কিছু নাহি লয় মম মনে ॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী ॥[২]

সীতার অগ্নিতে প্রবেশ ও পাতাল প্রবেশের পরও রামচন্দ্র পত্নী বিরহে অতিশয় কাতর হয়েছেন। রাবণ বধের পর রাণী মন্দোদরী ও রাক্ষস রমণীরা সীতাকে অভিশাপ দিয়ে সাধারণ রমণীর ন্যায় ঈর্ষা প্রকাশ করেছেন। সীতার জন্যই তাঁদের কেউ পুত্রহারা পতিহারা। তাঁদের পক্ষে সীতাকে অভিশাপ দেওয়া খুবেই স্বাভাবিক। রামের বনবাস যাপনের চৌদ্দ বৎসর বিমাতা কৈকেয়ী অনুতাপানলে দগ্ধ হয়েছেন। বনবাসান্তে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলে বিমাতা কৈকেয়ী রামচন্দ্রের প্রতি অভিমান করে হাতে বিষের নাড়ু নিয়ে বসে আছেন। রামচন্দ্র যদি তাঁকে মা বলে না ডাকেন তবে এ ছার জীবন রাখবেন না।

অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি ॥
যদি রাম পূর্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ, নহে ত্যজিব জীবন ॥[৩]

শ্রীরামচন্দ্র দেবতা নহেন—সুখে-দুঃখে অভিভূত সাধারণ মানুষ তিনি। সুনাম দুর্নাম সমভাবেই তাঁকে বিচলিত করে। ভদ্রকের মুখে সীতার অপবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তারপর রজকের সঙ্গে রজক জামাতার কথোপকথন,

পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে।
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে।

১, ২. ৩। রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০
প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৭

রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি।
জ্ঞাতি বন্ধু খোটা দিবে আমি হীন জাতি…১

শোনার পর শ্রীরামচন্দ্র সাধারণ মানুষের ন্যায় সীতা ত্যাগের সংকল্প করলেন। পুরুষ প্রধাণ সমাজে কোন পুরুষই স্ত্রীর্র বদনাম সহ্য করতে পারেন না। স্ত্রী দোষীই হউন আর নির্দোষীই হউন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান। শ্রীরামচন্দ্রও তাই করলেন।

সীতা সর্বংসহা ধরিত্রী কন্যা। ধরিত্রীর মতই তাঁর অসাধারণ সহ্য শক্তি। পুরুষ শাসিত ভারতের নারী জাতির তিনি প্রচলিত আদর্শ। রাজকন্যা রাজকুলবধূ সীতা বার বার লাঞ্চিতা ও অপমানিতা হয়েছেন। কিন্তু কখনো স্বামী রামকে দোষারোপ করেন নি। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় বাল্মীকির তপোবন থেকে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে অযোধ্যার রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। জনপদবাসীর সামনে আবার পরীক্ষা দিতে হবে। কোন রক্ত মাংসের মানুষী শরীরে এই অপমান সহ্য করতে পারে না। তাঁর অসাধারণ সহ্য শক্তিও এবার অতিক্রান্ত হল। তাঁর গৃহবাসে মন রইলনা। যে অযোধ্যার প্রজাগণ তাঁর নামে অপবাদ দিয়েছে তাঁরা তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা নিতে চায়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি তাঁদের রাণী হতে চাইলেন না। ধরিত্রী কন্যা ধরিত্রী গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এখানে সীতা কেবল ভারতীয় বধূ জীবনের আদর্শই নন, লাজে অপমানে, অভিমানে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে প্রকৃত নারী তিনি।

এভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে মানব জীবনের, মানবের বিচিত্র অনুভূতির শোভা যাত্রা চলেছে।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কবির নিজের কথাই হোক বা জাতীয় জীবনের কথাই হোক কোন কবির কাব্যই দেশকাল ও জনজীবনকে উপেক্ষা করে আত্ম প্রকাশ করতে পারে না। দেশ ও জাতির যা ভাবনা, যা আকাঙ্ক্ষা জাতির পক্ষে যা মঙ্গলকর সাহিত্য তারই বাঙময় প্রতিচ্ছবি। রামায়ণ ও মহাভারত কেবল ব্যাস বাল্মীকির সৃষ্টি নহে, উহা সমগ্র ভারত-বাসীর সিন্ধু জাত হৃদয় মহাকাব্য। ঠিক সেইরূপ কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ মাত্র নহে, ইহা স্বতন্ত্র এক কাব্য।

১। রামায়ণ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৮২।

কবির এই মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণা জাতি ও সমাজ নিরপেক্ষ নহে। জাতীয় জীবন থেকেই কবির কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিশেষ পরিচয় রয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এতে আত্ম প্রকাশ করেছে। বিশেষতঃ রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবে বিপর্যস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে ভাঙ্গন ধরেছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালী জাতিকে সেই অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে জীবনের নূতন মূল্যবোধ ফিরিয়ে দিয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙ্গালী নূতন করে ভাবতে, নূতন করে দেখতে শিখল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর হৃদয় দর্পণ—"বাঙ্গালী রামায়ণ রূপ দর্পনে আপনার প্রাণের প্রতিছায়া দর্শনে নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাইতো কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গলায় এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।[১]

কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের বহুপূর্ব থেকে রামকথা বাংলা দেশে প্রচারিত ছিল। শুধু পূর্বে নয় পরবর্তীকালেও বহু কবি রামায়ণ বা রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু কেউই কৃত্তিবাসের মত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। তাই ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত আজও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমান কদর। ইহা মধ্যযুগের উপেক্ষিত বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—"সমস্ত বঙ্গ হৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন সে আপনার নাড়ীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে, সে জানিতে পারিয়াছে সমস্ত বাঙ্গালীর অন্তর অন্তপুরের মধ্যে তাহার স্থান হইয়াছে, এখন সে ভিখারিনী বেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অক্ষুন্ন অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত ও দৃঢ় হইতে চলিয়াছে।"[২]

কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যে আর্য মহাকাব্যের উন্নত আদর্শ রক্ষিত হয় নাই—মধ্যযুগীয় বাঙালীর জীবন চর্যারই হয়েছে এতে প্রতিফলন।

১। রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২

২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৮০৬

তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণে মহাকাব্য সুলভ মানব জীবন যাত্রার দিগন্ত বিস্তৃত বিচিত্র কোলাহলের পরিবর্তে সহজ সরল বাঙালী জীবনের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যায়। রামলক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি মহাকাব্যের সমুন্নত আদর্শ ত্যাগ করে বাঙালীর আদর্শে বাঙালীর ঘরের মানুষে পরিণত হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রতিটি চরিত্র আমাদের নিজেদের আদর্শ নিজেদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছে। রামচন্দ্র বীর হয়েও বাঙালী বীর—স্নেহ মমতায় কোমল প্রকৃতির মানুষ। বাল্মীকির রামচন্দ্র যেমন কোমল তেমনই লৌহ-কঠিন। জননী কৌশল্যা তাঁর বীরপুত্র সম্বন্ধে বলেছেন—

নাগরাজগতিবী রো মহাবাহু ধনুস্বর।
বনমাবিশতে নূনং সভার্যাঃ সহলক্ষ্মণঃ ।।[১]

এখানে নাগরাজতুল্য মহাবিক্রমশালী মহাবাহু রামের অপরিমিত বীর্যের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। বাল্মীকির রাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৃতান্তক যমের মত মহাভয়ংকর আর কৃত্তিবাসের রাম ভকত বৎসল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিযোদ্ধা রাক্ষসদের প্রতিও তাঁর কোমল হৃদয় সহানুভূতিশীল। এদের গায়ে আঘাত করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন। বাল্মীকি রামায়ণে সীতা তেজস্বিনী, ক্ষত্রিয়া রমণী। বনগমনকালে রামচন্দ্র তাঁকে ঘরে রেখে যেতে চাইলে তিনি কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেছেন। সেক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের সীতার প্রতিবাদ অতি ক্ষীণ ও দুর্বল—

পণ্ডিত হইয়া বল অবুঝের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায় ।।
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
বল তায় বীর বলে কোন ধীর জনে ।।[২]

কৃত্তিবাসের সীতা সর্বংসহা বাঙালী ঘরের বধূ। রাবণের সীতা হরণ, সীতার অগ্নি পরীক্ষা ও সীতার বনবাস প্রভৃতি ঘটনায় ভাগ্যবিড়ম্বিতা বাঙালী কুলবধূর জীবনের মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৭ ত্রিচত্বারিংশ সর্গ, শ্লোক ৭
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৮

সীতার পাতাল প্রবেশ লাঞ্চিতা অপমানিতা বঙ্গবধূর আত্মহনন ছাড়া আর কিছুই নহে। আবার সীতার পাতিব্রত্যের মধ্যে বাঙালীর বধূজীবনের আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। পতি-পত্নীর জীবন যে অবিচ্ছেদ্য সীতার উক্তিতে তা প্রকাশ পেয়েছে—

তুমি যে পরম গুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি ॥[১]

অযোধ্যার রাজ পরিবারটি বাঙলা দেশেরই একান্নবর্তী পরিবার। এখানে পরস্পরের প্রতি স্নেহ মমতাও অপর্যাপ্ত। কৌশল্যা নন্দন রামচন্দ্র মহারাজা দশরথের সকল মহিষীরই প্রিয়পুত্র ও নয়নানন্দ। তেমনই আর একদিকে চলে গোপন ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা। শেষ পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষের কালকূট অভিষেকোন্মুখ রাজপুত্রকে করল দংশন। এরূপ ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা বাঙালী পরিবারে শুধু মধ্যযুগে নয় আজও দেখা যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য। আচার-ব্যবহার রীতিনীতি খাদ্য ও উল্লেখযোগ্য স্থানের বর্ণনায় ও কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের আদর্শ ত্যাগ করে একান্তভাবে বাংলা দেশ ও বাঙালীর জীবনচর্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। দশরথ নন্দন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতির জাতকর্মের সময় কবি বাংলা দেশে প্রচলিত আচার ব্যবহারগুলির অনুসরণ করেছেন। নবজাতকের জন্মের পর পাঁচদিনে পাঁচুটি, ছয়দিনে ষষ্ঠীপুজা, আটদিনে অষ্টকলাই, ত্রয়োদশ দিনে জন্মাশৌচান্ত, ছয়মাসে অন্নপ্রাশন প্রভৃতি বাংলা দেশেরই অতি পরিচিত সামাজিক অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ আটদিনে অষ্টকলাই প্রদান, একমাত্র বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতার বিবাহ বর্ণনায়ও কবি বাংলাদেশে প্রচলিত রীতিনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাঙ্গালীর বিবাহের মতই রামসীতার বিবাহ বর্ণনায় বরপক্ষ কন্যাপক্ষের জন্য, কন্যাপক্ষ বরপক্ষের জন্য অধিবাসের দ্রব্যাদি প্রেরণ করে। সীতার বিবাহের সময় সীতার বহুমূল্য সাজসজ্জার মধ্যে কপালে সিন্দুর ও হাতে শঙ্খ পরিয়ে দিয়ে কবি সীতাকে বাঙালী বধূতে পরিণত করেছেন—

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮

কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দুর,
দুই বাহু শঙ্খতে শোভিল বিলক্ষণ ।।[১]

রামান্বেষণে বাহির হয়ে ভরত গুহকের কাছে যে আথিত্য পেয়েছিলেন তাতে নারিকেল, গুবাক, কদলী, পনস, রোহিত ও চিতল মাছ প্রভৃতি বাঙালীর রসনা পরিতৃপ্তিকর খাদ্য তালিকার উল্লেখ আছে। ভরদ্বাজ আশ্রমে মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতের সৈন্যবাহিনীকে অতি সুস্বাদু যে খাদ্য সামগ্রী পরিবেশন করেছিলেন তা আমাদের বাংলা দেশেরই রসনালোভন খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। উত্তরকাণ্ডে সীতা চৌদ্দ বছরের উপবাসী লক্ষ্মণকে ভোজন করাবার জন্য যে খাদ্য সামগ্রী রন্ধন করেছেন তা অযোধ্যা মিথিলার নহে, আমাদের বাংলা দেশেরই গৃহস্থ ঘরের দৈনন্দিন রন্ধন শালার খাদ্যসামগ্রী।

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সুপ আদি দিলেন আনন্দ।
ভাজা বেল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ ।।[২]

কেবল খাদ্য তালিকা নহে—পশুপাখী গাছ পালা প্রভৃতির বর্ণনার সময়ও তাঁর দৃষ্টি বাংলা দেশের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। উত্তরকাণ্ডে গৃধিনী পেচকের দ্বন্দ্ব নামক আখ্যানে কবি বিশেষভাবে বাংলা দেশের পাখীগুলির বিবরণ দিয়েছেন। এই তালিকার মধ্যে সারস সারসী, কাক, গৃধিনী, কোকিল, চিল, কালপেঁচা, শারী, শুক, কাকাতুয়া, মাছরাঙা, খঞ্জন, খঞ্জনী, ফিঙে, বাবুই, পায়রা, শিকরা, সঞ্চাল, বকবকী, বাদুড়, কাঠঠোকরা প্রভৃতি বাংলা দেশেরই অতি পরিচিত পাখীগুলি স্থান পেয়েছে—

সারস সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কাল পেঁচা ।।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভূমিকা দীনেশচন্দ্র সেন, ৭ বিশ্বকোষ লেন, ১৯১৬, পৃঃ, ৯৭

২। রামায়ণ, ৪র্থ সংস্করণ, জনৈক বিখ্যাত সাহিত্য সেবী কর্তৃক সম্পাদিত, ১৩৩২, পৃঃ ৪২৭

সারী, শুক ককাতুয়া চড়া মৎস্যরঙক।
খঞ্জন খঞ্জনী ফিঙে ধকড়িয়া কঙক ।।
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রবাজ আর শিকর সঞ্চাল ।।
বকা বকী বাদুড় বাদুড়ী নুরি টিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাষ্ঠ ঠোকরিয়া ।।[১]

অযোধ্যা, মিথিলা, চিত্রকূট প্রভৃতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কবি ভাষা রামায়ণে বাংলা দেশের বহু প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ করেছেন। ভগীরথের গঙ্গা অবতরণ কালে কৃত্তিবাস গঙ্গাতীরে যে সমস্ত তীর্থের নাম উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিই বাংলা দেশে অবস্থিত। মোড়াতলা, নদীয়া, নবদ্বীপ সপ্তগ্রাম, অ্যাকনা মহেশ প্রভৃতি এই বাংলা দেশেরই প্রসিদ্ধ গ্রাম। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ও লঙকাপুরীর সুরম্য অট্টালিকা বর্ণনায় সময় ও কবি কল্পনা বাংলাদেশের আটচালা আর পাঁচিশের বন্দ ঘরের উপরে উঠতে পারে নাই—

'লাফদিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে।
... ...
অগ্নিতে পুড়ি পড়ে বড় ঘরের চাল ।।[২]

যে ঘরের চালায় হনুমান লাফ দিয়া পড়ে, আর আগুনে পুড়ে যে ঘরের চালা পড়ে যায় তা আর যা হোক, রাজা মহারাজার রাজপ্রাসাদ হতে পারে না। এ আমাদের বাংলা দেশেরই চালা ঘরের একটি চাল ভষ্মীভূত হয়ে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য। অপার অতল মহাসমুদ্রের বর্ণনায়ও কবি কল্পনা নদী মাতৃক বাংলা দেশের খাল বিল, নদী নালার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই রামচন্দ্রের কপি বাহিনী গাছ পাথর প্রভৃতি দ্বারা মহাসমুদ্রের বুকে শতশত যোজন জাঙ্গাল তৈরী করে—

"সাগর বান্ধয়ে নল হনুমান মহাবল।
আনি দেয় শিলা বৃক্ষগণ।
জাঙ্গালের দুই ভিতে সুন্দর পাথর গাঁথে
আনন্দে নাচয়ে কপিগণ" ।।[৩]

১, ২, ৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভূমিকা দীনেশ চন্দ্র সেন পৃঃ ৬০০, ২৬৫, ২৩৮।

কৃত্তিবাসের কল্পনা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সমাজের উর্ধ্বে উঠে সর্ব-ভারতীয় রূপ লাভ করতে পারেনি। কৃত্তিবাসের বর্ণনায়—"চিত্রকূট পর্বত আমাদের ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কল্লোলিত সমুদ্র বাংলার বিল জলাশয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং রাম রাবণের যুদ্ধ দুই জমিদারের কলহদ্বন্দ্বে পরিণত হইয়াছে"[১]

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে করুণ রসের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসেরও একটা বিশেষ স্থান আছে। কৃত্তিবাস হাস্যরস বর্ণনায় মধ্যযুগীয় বাঙ্গালী রুচি ও জীবন বোধের পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যযুগে মোগল, তাতার, তুর্কী প্রভৃতির আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালী জীবন সম্বন্ধে তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ যেন ক্রমশঃ বেড়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে জীবনের তীব্র তীক্ষ্ম হাস্যরসের পরিচয় রয়েছে। কৃত্তিবাস কবি বাঙালীর জাতীয় কাব্য রচনায় বাল্মীকি রামায়ণ বহির্ভূত, জীবনের এই দিকটির প্রতি উজ্জ্বল রেখাপাত করেছেন। রাবণের হরধনুভঙ্গ হনুমানের লংকা দাহন, অঙ্গদ রায়বার প্রভৃতি উপাখ্যানের মধ্যে কবি বাঙ্গালী জীবনের উপযোগী নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্রবেটা দেখে[২]

সীতা বিবাহার্থী হরধনু উত্থোলনে ব্যর্থ পরাজিত রাবণের মধ্যে জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত বাঙালী বীরের পরিচয় পাওয়া যায়।

সীতান্বেষণার্থী হনুমানকে লঙকায় বন্দী করে রাখলে সে রাক্ষসীদের পরিহাস করে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে তার মধ্যে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের পরিহাস রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—

প্রমীলা শালাজ পাব পরমা রূপসী।
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি॥

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪২।
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভূমিকা, দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃঃ ৭৬

কতগুলি শালী পাব লঙ্কার ভিতর।
ইহা জানিলেই মোর জুড়াই অন্তর ।।[১]

এখানে বাঙালীর বৈবাহিক রসিকতা বাসর ঘর ত্যাগ করে লঙ্কার রাক্ষসীদের আক্রমণ করেছে।

পবন নন্দন হনুমানের জন্মকথা নিয়ে হনুমান ও জাম্বুবানের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হয় তা মধ্যযুগীয় বাঙালীর স্থূল আদিরসাত্মক হাস্য-পরিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—

তুমি বা কাহার পুত্র মন্ত্রী জাম্ববান।
সকলের সব বার্তা জানে হনুমান ।।
যত যত আসিয়াছে বীর সেনাপতি।
কেবা না জানহ কার মাতা সতী ।।[২]

বাঙালীর পারিবারিক পরিহাসের এক সহজ সবল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় লক্ষ্মণের প্রতি সীতার ভ্রাতৃ জায়া সুলভ রসিকতায়—

আইস দেবর আজি শুভদিন।
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীন ।।
চোদ্দবর্ষ একত্রে বঞ্চিলাম বনে।
রাজ্যশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে ।।[৩]

.. . ...

বাঙালী পরিবার ছাড়া আর কোথাও এরূপ পরিহাস রসিকতা পাওয়া যাবে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সব চেয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কৌতুকাবহ রচনা অঙ্গদরায়বার অংশটি।

১,২। রামায়ণ, জনৈক বিখ্যাত সাহিত্য সেবী কর্তৃক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৪. ১১৯

৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত, ১৩৬৪, শিশু সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪৮৩

অঙ্গদ বলে সত্য করি কওরে ইন্দ্রজিতা
এই যত বসিআছে সবাই কি তোর পিতা ।।

. ...

ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য রে তোর মাকে
এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে[১] ।।

এই স্থুল হাস্য পরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ একান্ত অমার্জিত ও ভদ্রেতর রুচির পরিচায়ক হলেও এতে রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবে বিপর্যস্ত বাঙালীর বৈচিত্রহীন নিস্তরঙ্গ জীবনে কিছুটা আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

ত্রিলোক সঞ্চারী কল্পনা; অসাধারণ কবি প্রতিভা, জীবন সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্রের সমুন্নত মহিমা মহাকবির প্রতিভাকে সপ্রমাণ করে। চিত্রকূট দণ্ডকারণ্যের শান্ত তপোবনভূমি, বর্ষা ও শরতের মনোরম বর্ণনা, তার সঙ্গে মানব মনের সম্পর্ক ও বিচিত্র অনুভূতি, সমুদ্রের উত্থাল তরঙ্গ,রাম রাবণের যুগান্তরকারী মহাযুদ্ধ, সীতার দুঃসহ বেদনা, এ সমস্তই বাল্মীকির রামায়ণ কাব্যকে মহাকাব্যের সমুন্নত মহিমা দান করেছে। অপর দিকে কৃত্তিবাস কবির ভাব, ভাষা, কল্পনা ও বিষয়বস্তু প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। পল্লীবাংলার ভিজে মাটির গন্ধ রয়েছে তাঁর রামায়ণ কাব্যে। তাই ঋতু পর্যায়ের বর্ণনা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অলঙ্কার প্রয়োগের সময়ও কবি বাংলার দৈনন্দিন জীবনের চিত্র গ্রহণ করেছেন। কবি গ্রাম বাংলার জীবন চর্যা দ্বারা এত বেশী পরিমানে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তা দেখান যেতে পারে। যেমন—

১। তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী

২। ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সেক্ষণে।

৩। করে দুষ্ট কুড়ি পাটি দন্তকড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ী ।।

৪। কাষ্ঠ বিড়াল সবে আইল তথাকারে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে ।।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪, ২৫৫

অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে।
ফাঁক যত ছিল তাহা মারিল বিড়ালে॥

৫। নাকের নিশ্বাস তার কামারের জাতা।

৬। অহঙ্কার করি ডিঙা ডোবে দরিয়ায়।

৭। শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধি তাগা।

৮। খদ্যোত উদয়ে যদি হয় চন্দ্রপাত।

৯। নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান॥

১০। কুমোরের চাক যেন মানিক অঙ্গুরী।
কুম্ভকর্ণের আঙ্গুলে পরায় যত্ন করি॥

১১। কুম্ভ কর্ণের স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় দুলিছে যেন তেতুঁলের গাছে॥

১২। পৃথিবীতে ফিরে বান কুমোরের চাক।

১৩। কাষ্ঠ মল্লিকা দোপাটি, যাতিযুথী, আঁচিঝাঁটি
দ্রোনপুষ্প, মাধবী টগর।
তুলসী, তিসি, ধাতকী, ভুমিচম্পক, কেতকী
পদ্মবক কৃষ্ণ কেলী আর॥

১৪। দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বর্ণ ঘাটে
স্নান হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে॥[1]

কবি তাঁর নিজগ্রামে যে সমস্ত গাছপালা, পশুপাখী কীটপতঙ্গ দেখেছেন এবং সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের যে জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করেছেন তাঁর রামায়ণে তাহা হুবহু চিত্রিত হয়েছে। কবির কল্পনা শক্তি ও অভিজ্ঞতার এই অপরিসরতা দেখে বলা যায় যে কৃত্তিবাস তাঁহার বাসস্থান সেই ক্ষুদ্র গ্রাম ফুলিয়ার চতুঃসীমার বাহিরে কখনও যান নাই।[2]

১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত; পৃঃ ৮৯ ১১১, ১৪৪, ২৩৯, ৪৩৭, ২৫৬, ২৮৩, ২৮৭, ২৯১, ৫০৫, ৫২০. ৩৮৫, ৪৮২।

২। সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৪, সং মাস প ১৩৯

তবে কৃত্তিবাসের বাঙালী মানস প্রবণতা এত অধিক যে ছোট কাঠবেড়ালী, চামচিকে, বাদুড়, খদ্যোত (জোনাকী প্রভৃতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। আর একদিকে কবি চিত্রকূট. দণ্ডকারণ্য, অশোকবনের তাল তমাল. শাল, অশোক প্রভৃতি বিশাল বৃক্ষের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে বহুল প্রচলিত কাঠগোলাপ, কদলী ও তেঁতুল গাছের কথাও মনে রেখেছেন। ছোট বাদুড় ও কাঠবেড়ালী তাঁর কল্পনাকে করেছে উদ্দীপিত। জলাভূমি বাংলা দেশে যে সর্পাঘাতে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে কবি তা বিস্মৃত হননি। কবির লেখনীতে গ্রাম বাংলার ধোপার পাট, কামারের জাতা ও কুমোরের চাক এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখান যায় যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য—সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদস্পন্দন হয়েছে এতে স্পন্দিত।

পঞ্চম অধ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য ও বাঙালী-জীবনে রামায়ণ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্য ও পদাবলী সাহিত্য দ্বারা ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গল কাব্য প্রভৃতি সাহিত্যের প্রতিটি শাখা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হল। আবার ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবসাহিত্যগুলিও ভারতের প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের ভাব ও বিষয়বস্তুর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনের মধ্যেও শ্রীরামচন্দ্রের জীবনাদর্শের প্রতিফলন হয়েছে। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। চৈতন্য জীবনীকারগণও শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পনা করেছেন—

'সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে এছে দয়াল আর নাঞি।।
পরব্যোমেতে বসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান[১]

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতেও গৌর সুন্দরকে বৈকুণ্ঠেশ্বর ও শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে—

সর্বলোক চূড়ামণি বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর।।
ত্রেতাযুগে হইয়া যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নানামত লীলা করি বধিলা রাবণ।।[২]

—

১। চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী, আদিলীলা, হরেকৃষ্ণ ও সুবোধ চন্দ্র মজুমদার, দেবপ্রেস, ১০৬৯, পৃঃ ১৬

২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত। সত্যেন্দ্র নাথ বসু বিদ্যা বাচস্পতি সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, পৃঃ ৩২, ১৩৫৮

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু ও সার্বভৌমকে যে ষড়ভুজ মূর্তিতে দেখা দেন তাতে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হল ও মুষলের সঙ্গে শার্ঙ্গধনু এবং বেণুও ছিল যথা—

(১) ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইল তৎকাল ॥
শঙ্খ-খচক্র গদাপদ্ম, শ্রীহলমুষল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল[১]

(২) অপূর্ব ষড়্ভুজমূর্তি কোটি সূর্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্বভৌম মহাশয়[২]

অন্যত্র আছে—

প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খচক্র, গদাপদ্ম, শার্ঙ্গবেণু ধর ॥[৩]

এখানে ত্রিলোকবিহারী বিষ্ণুর সঙ্গে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র দ্বাপরে বিষ্ণু এবং কলিতে শ্রীচৈতন্যকে অভিন্ন রূপে দেখা হয়েছে।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলেও উল্লেখিত হয়েছে যে নারদের অনুরোধে বৈকুণ্ঠেশ্বর বিষ্ণু কলিযুগ উদ্ধার মানসে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে সম্মত হন—

কলি লোক নিস্তারিব নিজভক্তি প্রচারিব
অবতার করিব মো তোমা ॥
দানব্রত তপধর্ম্ম আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম
সব আরোপিযা হরিণামে ॥
কলি দোষময় দেখ এক মহাগুণ লেখ।
মুক্ত বন্ধ মোর সঙ্কীর্ত্তনে ॥
ঘোষণা বোলহ তুমি শিবব্রহ্মা আদি ভূমি
সবে জনমহ কলি পাঞা ॥[৪]

১, ২। শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৯, ৩৫২
৩। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, ৩য় সং, পৃ, ৭২৭
৪। চৈতন্যমঙ্গল লোচনদাস, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত পৃঃ ১৭

রামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে রাক্ষসদের অত্যাচার জর্জরিত দেবতা ও মুনি ঋষিরা ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হয়েছিলেন। বিষ্ণু যেন মনুষ্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে রাক্ষসদের অত্যাচারের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করেন।

গোলোক-বিহারী বিষ্ণুও অযোধ্যায় দশরথের পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন বলে দেবতাদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

রামাবির্ভাবের পূর্বাবস্থার ন্যায় চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বেও সমাজে মুসলমান পীর ফকির, মোল্লাদের অত্যাচার এবং কুলাচারী হিন্দু ও সহজিয়া বৌদ্ধদের নানারূপ তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের ফলে সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ বৈষ্ণবদের অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে শোচনীয়। এ সময়ে অদ্বৈতাচার্য শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজের নেতৃবর্গ ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন, প্রভু যেন ভূভার হরণের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন—

"গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ।।
কৃষ্ণেরে আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার[১] ।।

লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলে উল্লেখিত হয়েছে যে নারদের অনুরোধে বৈকুণ্ঠ নাথ বিষ্ণু ধরাধামে অবতীর্ণ হতে সম্মত হন এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতাদের তিনি মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন—

"ঘোষণা বোলহ তুমি শিব-ব্রহ্মা-আদিভুমি,
সভে জনমহ কলি পাঞা[২] ।

বিষ্ণুর নির্দেশে মহেশঠাকুর অদ্বৈত আচার্যরূপে, বলরাম নিত্যানন্দ রূপে, হনুমান মুরারি গুপ্ত রূপে চৈতন্য পার্ষদ হয়ে চৈতন্যলীলা প্রচারের জন্য জন্ম গ্রহণ করেন।[৩]

১। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

২, ৩। চৈতন্য মঙ্গল, লোচনদাস, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬, ২৮।

হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা।
নিজ নিজ অংশে সবে জন্ম লভিলা।
মহেশ ঠাকুর সর্ব আগে আগুয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম॥
পড়িয়া শুনিঞা পরবীণ হৈল।
অদ্বৈত আচার্য্য বলি পদবী লভিল[১]॥

অন্যত্র আছে—নিত্যানন্দস্বরূপে পূর্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হঞা করেন রামের সেবন॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ পায়েন লক্ষ্মণ॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ, মনে দুঃখ পাই[২]॥

চৈতন্য পরিকর মুরারি গুপ্তকেও হনুমানের অবতাররূপে কল্পনা করা হয়েছে—

উঠ উঠ মুরারি আমার তুমি প্রাণ
আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান॥
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি সে গন্ধমাদন॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি তুমি কাঁদিলা অপার[৩]॥

চৈতন্যভাগবতে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে মুরারি গুপ্তকে শ্রীচৈতন্য শ্রীরামচন্দ্ররূপে দেখা দেন—

"মুরারিরে আজ্ঞা হৈল, "মোর রূপ দেখ"।
মুরারি দেখয়ে—রঘুনাথ পরতেখ॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসি আছে মহাধনুর্ধর॥
জানকী লক্ষ্মণ দেখে—বামেতে দক্ষিণে।

১। চৈতন্যমঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৮, ৩০।
২। চৈতন্য চরিতামৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
৩। চৈতন্য ভাগবত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৭।

চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥
আপন প্রকৃতি বাসে, যে হেন বানর ।
সকৃত দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর[১] ॥

অনুরূপভাবে রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্র গরুড় পক্ষীকে মোহন মুরলীধারী ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন—

"এতেক মন্ত্রনা করি বিনতা নন্দন ।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥
ভকত বৎসল রাম তাহার ভিতরে ।
দাণ্ডাইল ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে ॥
ধনুক ত্যাজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে[২] ।

শ্রীচৈতন্য শৈশবে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করার সময় অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে রামায়ণের কাহিনীর প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

মুরারি গুপ্তকে শ্রীচৈতন্য অনেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনিই রাঘবেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীরাম মহিষী সীতা দেবীর মতই গৌরাঙ্গপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জনম দুঃখিনী—স্বামী সাহচর্যে বঞ্চিতা, চিরবিরহিনী। কিন্তু কখনো তাঁরা স্বামীর বিরুদ্ধে দোষারোপ করেন নি। ব্রাহ্মণ-শাসিত আর্য সমাজে জাতিভেদের কঠোরতা হ্রাস করে শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন, অনার্য কন্যা শবরীর আতিথ্যও তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যবন হরিদাসকে প্রেমধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। দস্যু জগাই মাধাইও তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছিল।

রামচন্দ্রের বনগমনের সংবাদে জননী কৌশল্যা এবং নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে শচীমাতা উভয়েই পুত্রের আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় হাহাকার করেছেন। জননী কৌশল্যা যেমন নানাভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে বনগমনে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন ঠিক তেমনই শচীমাতা গৌরাঙ্গকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বাধা

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭।
২। রামায়ণ, মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত, ৪র্থ সংস্করণ, জনৈক বিখ্যাত সাহিত্য সেবী কর্তৃক সংশোধিত, ১৩০২, পৃ. ৩২৩।

দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের দু'জনের কেউই কৃতকার্য হতে পারেন নি। কৌশল্যা রামচন্দ্রকে গৃহে অবস্থান করে জননীর সেবা করার কথা বলেছেন—

"ধর্ম্মজ্ঞ যদি ধার্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্মং চরিতুমিচ্ছসি।
শুশ্রূষ মামিহস্তত্বং চর ধর্ম্ম মনুত্তমম্ ।।
শুশ্রূষুর্জ্জননীং পুত্রঃ স্বগৃহে বসন।
পরেণ তপসা যুক্তং কাস্যপ ত্রিদিবং গতঃ ।।
যথৈব রাজা পুজ্যস্তে গৌরবেণহ্যহম্।
ত্বাং সাহং নানুজানানি ন গন্তব্যমিতো বনম্[১] ।।

অনুবাদ—হে ধর্মানুষ্ঠান তৎপর, তুমি সমস্ত ধর্মই অবগত আছ। যদি তোমার ধর্মানুষ্ঠান করার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে এখানে থেকে আমার সেবা করে তুমি অনুত্তম ধর্ম অনুষ্ঠান কর। দেখ, সুপুত্র কাশ্যপ গৃহে অবস্থান করে মাতৃ সেবারূপ পরম তপস্যা দ্বারা স্বর্গে গমন করেছিলেন। রাজা দশরথ তোমার যেরূপ পূজনীয় আমিও তোমার সেরূপ পূজনীয় আমি তোমাকে বনে যাওয়ার অনুমতি দিতেছি না। সুতরাং তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়।

শচীমাতাও গৌরাঙ্গকে গৃহে অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করতে বলেছেন—

"ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন ধর্ম্ম বা বিচার ।।
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা[২] ।।

অন্যত্র আছে—

প্রেম শোকে কহে শচী—বিশ্বম্ভর শুনে বসি।
যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বোঝায়[৩] ।।

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে যেমন জননী কৌশল্যার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অযোধ্যাবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণেও সমস্ত নদীয়াবাসী হাহাকার করে উঠেছে,

"এইমত অন্যোহন্যে সর্বভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সভে করেন ক্রন্দন ।।

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত পৃ, ১৯৫-৯৬।
২, ৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রাগুক্ত পৃ. ৩১১-১২।

কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ্ গিয়াছ ।।"১

সীতা বিরহে রামচন্দ্রের করুণ বিলাপের সঙ্গে কৃষ্ণ বিরহে শ্রীচৈতন্যের ব্যাকুল আর্তি তুলনীয়। মারীচ বধ করে সীতাশূন্য তপোবন ভূমিতে রামচন্দ্রের করুণ বিলাপ—

"এবং স বিলপন রামঃ সীতা হরণ কর্শিতঃ
দীনঃ শোকসমাবিষ্টো মুহূর্ত্তং বিহবলোহভবৎ ।।
স বিহ্বলিত সর্ব্বাঙ্গো গতবুদ্ধি বিচেতনঃ।
বিষসাদাতুরো দীনো নিশ্বস্যাসী তমস্রাতম ।।
বহুশঃ স তু নিশ্বস্য রামো রাজীবলোচনঃ।
হা প্রিয়েতি বিচুক্রোশ বহুশো বাষ্পগদগদঃ ।।২

সীতাহরণ-সন্তপ্ত কমললোচন রাম দুঃখিতচিত্তে শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি দীন, আতুর, বুদ্ধিহীন ও চৈতন্যশূন্য স্পন্দহীন হয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বার বার 'হা প্রিয়ে ! হা প্রিয়ে' বলে বিলাপ করতে লাগলেন। এর সঙ্গে কৃষ্ণবিরহী শ্রীচৈতন্যর বিলাপ তুলনীয়—

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায়ে ভূমিতে কেশ, তাহা নাহিবান্ধে ।।
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহবল হইয়া সে প্রভুর পাছে ।।৩

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর মরদেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন সরযূ নদীর জলে—

"তস্মিং স্তর্যশতৈ কীর্ণে গন্ধর্বাশয় সঙ্কুলে।
সরযূসলিলং রামঃ পভ্যাং সমুপচক্রমে ।।৪

আর কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীচৈতন্য পুরীর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন—

চন্দ্রাকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ।।

১, ৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রাগুক্ত পৃ. ৩১০, ১৮১।
২, ৪। বাল্মীকি রামায়ণম্, বাল্মীকি বিরচিত, ১৪৬৬, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২২।

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা ।।[১]

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্য উভয়ের আবির্ভাবের ন্যায় তিরোভাবের মধ্যেও এভাবে রয়েছে নিকটতম সাদৃশ্য।

কেবল চৈতন্য জীবনীকাব্য নহে, এযুগে রচিত মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও রামায়ণী ভাব ও অনুষঙ্গের পরিচয় রয়েছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্র চিত্রনে রামায়ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। অবশ্য তাঁদের আদর্শ কবিগুরু বাল্মীকি নহেন, কবি কৃত্তিবাস। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ গ্রন্থে সীতার অগ্নি পরীক্ষার অনুকরণে বেহুলার অগ্নি পরীক্ষা চিত্রিত হয়েছে। বিজয়গুপ্তের নামে প্রচলিত কোন কোন পুঁথিতে রামচন্দ্রের মত লখিন্দরও বেহুলার পরীক্ষা নিতে চেয়েছেন—

জলে স্থলে দূরদেশে করিল প্রবাস।
একেশ্বর হইয়া বেহুলা ভ্রমে ছয়মাস ।।
সংগতি দোসর নাহি পথে নানা ভয়।
এতেক পাষণ্ড কোথা স্ত্রী ধর্ম্মে রয় ।।
ঘন সুখে একেশ্বর ভ্রমে ছয়মাস।
হেন নারী ঘরে নিলে লোকে উপহাস ।।[২]

বিজয়গুপ্তের নামে সর্বাধিক প্রচলিত পুঁথিতে চাঁদ সদাগরের প্রতিবেশীরাও বেহুলার পরীক্ষা নিতে চেয়েছিল। চাঁদসদাগর মনসাদেবীর পূজা করার পর জ্ঞাতি বন্ধুদের সংগে একত্রে ভোজন করতে চাইলেন। এই ভোজনের উদ্দেশ্যে, যে বধূ ছয়মাস বাড়ীর বাইরে ছিল তার প্রস্তুত অন্ন সবাইকে পরিবেশন করিয়ে বধূকে সমাজে তোলা, কিন্তু অযোধ্যার প্রজাসাধারণের মত চাঁদসদাগরের জ্ঞাতি বন্ধুরা বেহুলার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করল—

"আপনে সকল জান শোন সদাগর।
মড়া লইয়া ছয়মাস ভাসিল সাগর ।।

১। চৈতন্যচরিতামৃত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭৪
২। পদ্মাপুরাণ, বিজয় গুপ্ত, ভূমিকা জয়ন্ত কুমার দাশগুপ্ত, পৃঃ ২

নানা কণ্ঠক পথে আছে সাগরের পানি।
শুদ্ধভাবে আছে বেহুলা নহে হেন জানি॥
বিনে পরীক্ষায় অন্ন না করিব ভোজন।
পরীক্ষা লইয়া শেষে সেবা লয় মন॥[১]

সাগর পারে সীতার পরীক্ষা দেখতে যেমন সবাহন দেবতারা আগমন করেছিলেন, তেমন বেহুলার পরীক্ষা দেখার জন্যও দেবতারা প্রত্যেকে চাঁদসদাগরের সভায় আগমন করলেন—

"ব্রহ্মা চলিয়া যাইলা হংস বাহন।
গরুরে চরিয়া বিষ্ণু য়াসিলা আপন॥
দেবতা সকল রাইলা একত্র হইয়া।
জার জে বাহনে রঙ্গ চাহেত বসিআ॥"[২]

শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ সভায় রামচন্দ্র আবার সর্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা নিতে চাইলে তিনি তাঁর সব যন্ত্রনার অবসান করে ধরিত্রী গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সীতার মত বেহুলাও সাতটি পরীক্ষার শেষ পরীক্ষার সময় এ জীবনের সমস্ত যন্ত্রনা পিছনে ফেলে রেখে দেবপুরে যাত্রা করলেন—

"এতেক পরীক্ষা দিয়া তব না জোরাইল হিয়া
সেসে দিল তোলা পরীক্ষা॥
সের কামানি করি এক পাসে তোলা তোলি
য়ার পাসে বিপুলা সোন্দরি।
বেউলা বোলে লক্ষিন্দর পূর্ব কথা মনে কর
এসময়ে চল সুর পুরি॥"[৩]

মনসামঙ্গলের ন্যায় চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতেও রামায়ণী ভাব ও আদর্শ নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অনেকস্থলে রামায়ণ কাহিনী প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী গ্রন্থারম্ভের পূর্বে মহেশ, দুর্গা, সরস্বতী, চৈতন্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রেরও বন্দনা করেছেন—

-

১। পদ্মাপুরাণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩
২, ৩। পদ্মাপুরাণ, নারায়ণ দেব, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭, পৃ ২৮৬, ২৮৮

"প্রথমে বন্দিব রাম মুক্তিপ্রদ যার নাম।
প্রভু রাম কমল লোচন।
অযোধ্যার পতি রাম বন্দো দূর্বাদল-শ্যাম।
প্রণমহ কৌশল্যা নন্দন॥

.. ..

যার নামে জীব প্রাণ মন্ত্রী যার জাম্ববান।
মিত্র যার গুহক চণ্ডাল

... .

রঘুপতি পদাম্বুজে মত্তমধুকর দ্বিজে।
কবি কঙকন রস গান॥১

কালকেতু গোধিকা রূপিনী চণ্ডীকাকে ঘরে নিয়ে এলে ফুল্লরা রামায়ণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে কালকেতুকে তিরস্কার করে বলেছে—

"হরিয়া রামের নারী রাক্ষসের অধিকারী
সবংশে মজিল দশানন।
রাম বিনাশিল তারে উদ্ধারিল জানকীরে
বিভীষণে করিল স্থাপন॥

.. ..

ফুল্লরা বীরেরে বলে আগে তুমি ভাল ছিলে
ইবে প্রভু নষ্ট কৈলে মতি।
আনিলে পরের নারী অতিশয় মনোহারী
শুনিলে বধিবে নরপতি॥"২

'রাবণ রামচন্দ্রের সীতা হরণ করে সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। আর কালকেতু পরের নারী হরণ করে ইহকাল পরকাল নষ্ট করল'।

মুকুন্দরামের মায়ামৃগ উপাখ্যানটিও রামায়ণে মারীচের মায়ামৃগ রূপধারণের অনুকরণে প্রকাশিত হয়েছে। মারীচ রাক্ষস যেমন রামচন্দ্রকে ছলনা করার জন্য স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করেছিল, চণ্ডীও সেরূপ কালকেতুকে ছলনা করার জন্য মায়ামৃগরূপ ধারণ করেছে—

১, ২। কবি কঙ্কণ চণ্ডী, মুকুন্দরাম বিরচিত, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃঃ ১২-১৫, ২৬৮-৬৯

এ পাপ মায়ামৃগ পবন জিনিয়া বেগ
মোরে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি ।।
যেন রামে বিড়ম্বিতে আইল কানন পথে
মারীচ যেমন মায়ানিধি ।।[১]

প্রাক্ চৈতন্যযুগে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্য ছিল সংস্কৃত ও পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর। চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধর্মের প্রভাবে রামায়ণ মহাভারতে দেববাদ নির্ভর মানবিকতা বাদের অভিব্যক্তি ঘটে। এ যুগের রামায়ণ কাব্য বাল্মীকি রামায়ণের পৌরাণিকতা ও সুরধর্মী সাহিত্যের গুরুগাম্ভীর্য ত্যাগ করে গার্হস্থ্যাশ্রয়ী জীবনধর্মী সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে, ফলে একদিকে যেমন বিচিত্র রস সৌন্দর্য ও বর্ণালীর সৃষ্টি হয়েছে তেমনই অপরদিকে পূর্ণাবয়ব মহাকাব্যের পরিবর্তে খণ্ড কাব্যের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়, শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়, অঙ্গদরায়বার, সীতার বনবাস প্রভৃতি নামকরণ এই যুগবৈশিষ্ট্যেরই পরিচয়বাহী। মাধবকন্দলী, শঙ্করদেব, দ্বিজগঙ্গানারায়ণ, অদ্ভুতাচার্য, কৈলাস বসু প্রভৃতির রামায়ণ কাব্যে এই যুগ বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে।

মাধবকন্দলী ও শঙ্করদেবের রামায়ণ অসমীয়া ভাষায় রচিত হলেও প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অসমীয়া ভাষার নিকটতম সাদৃশ্যের জন্য বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মাধব কন্দলী শ্রীমহামাণিক্য বরাহ রাজার অধীনে ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। মাধব কন্দলীর রামায়ণ বহুপূর্বে হারিয়ে যায়। সম্ভবতঃ তিনি লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত লিখে রাম-সীতার মিলন করিয়ে দিয়ে কাব্য সমাপ্ত করেছেন—

অগণিত পরীক্ষিয়া সীতাকে অযোধ্যা নিয়া
সকুটম্বে ভৈলা এক ঠাই,
মাধব কন্দলী গাইলা,

১। কবি কঙ্কন চণ্ডী, প্রাগুক্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২২২

শ্রীরাম অযোধ্যা পাইলা।

জয় জয় আনন্দ বাধাই।[১]

অগ্নিতে পরীক্ষা করে সীতাকে অযোধ্যায় এনে রাম আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একত্র হলেন—'মাধবকন্দলী গায় জয় জয় আনন্দ উৎসব'।

মাধবকন্দলী রচিত রামায়ণের আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড একেবারে লোপ পেয়েছে। বর্তমান কন্দলী রামায়ণের আদি কাণ্ড মাধবের দ্বারা আর উত্তরাকাণ্ড শংকর দেবের দ্বারা রচিত। মাধবকন্দলীর রামায়ণে এঁদের হাত পড়ায় আদি ও উত্তরাকাণ্ডে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করেছে। কৃত্তিবাস, মাধবকন্দলী, শংকরদেব প্রভৃতির নামে প্রচলিত রামায়ণ কাব্যে যে রামভক্তি-বাদ বা রামনাম মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে তা বিষ্ণু ভক্তি নিঃসৃত। রাম বিষ্ণুরই অবতার বলে রামনামের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে। তবে পূর্বভারতে অর্থাৎ উত্তর পূর্ববঙ্গে এবং আসামে রাম মাহাত্ম্য এবং রামমন্ত্রের দীক্ষা স্পতঃস্ফূর্ত ভাবেই দেখা দিয়েছিল।[২]

দ্বিজগঙ্গা নারায়ণ কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র সুষেণ পণ্ডিতের পুত্র। "ফুলিয়া বংশের মণি সুষেণ পন্ডিত। তাঁহার সন্তান দ্বিজ রচিল সঙ্গীত"।[৩] সুষেণ পণ্ডিত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুষেণ পণ্ডিতের সময় ধরে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ বর্তমান ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিজগঙ্গা নারায়ণের পুঁথি খানির নাম রামলীলা, এর কোন মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি সংগ্রহ শালায় এর কয়েকখানি পৃষ্ঠা মাত্র পাওয়া গেছে, এতে সীতা ও হনুমানের উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণু এবং সীতাদেবীকে লক্ষীরূপে কল্পনা করা হয়েছে—

১। রামায়ণ, কবিরাজ মাধব কন্দলী বিরচিত, শ্রীকনকচন্দ্র শর্মা কাব্য-তীর্থ সম্পাদিত, পৃ ৪১১।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পূর্বার্ধ, সুকুমার সেন, পৃ ১১৭-১১৯।

৩। পুঁথি সং, ২৭৩১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আপনি না জান মাতা নিজে লক্ষ্মী তুমি।
বৈকুণ্ঠে বসতি রাম জন্ম মর্ত্যভূমি ॥[১]

সীতা ও হনুমানের মুখে রাম নামের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে—

কিন্তু এই কথা বাপু কহিবা শ্রীরামে।
অশেষ পাতকী প্রাণ পায় রাম নামে ॥[১]

রামচন্দ্রের ন্যায় সীতাও যে রাবণ বধে সক্ষম হনুমানের মুখে তা ব্যক্ত হয়েছে—

দৃষ্টিতে দুষ্টের সৃষ্টি পার বিনাশিতে।
কিন্তু ইহা না করিলে বুঝি ভালমতে ॥
রাবণ সংহার হেতু রাম অবতার।
শ্রীরামের বধ্য সে নহেত তোমার ॥[১]

রচনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের সঙ্গে সমধিক মিল পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অদ্ভুতাচার্যের আসল নাম নিত্যানন্দ। কবির পিতামহের নাম মার্কণ্ড বা মার্তণ্ড আচার্য, পিতার নাম শ্রীনিবাস, এবং মাতার নাম মেনকা। কবির জন্মস্থান পাবনা জিলার অন্তর্গত সোনাবাজু পরগনার অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। কবি ভ্রাতা দেবানন্দের পৌত্র রঘুনাথের কন্যা সর্বানী ও তার স্বামী রামকৃষ্ণের সময় ধরে (১৭০৪ খৃঃ অঃ) কবি অদ্ভুতাচার্য ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।[২] মাত্র সাত বৎসর বয়সের সময় শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ে নিত্যানন্দকে রামায়ণ রচনা করার নির্দেশ দেন এবং বাণ দ্বারা তাঁর জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখে দেন। রামচন্দ্রের কৃপায় এরূপ কবিত্বশক্তি লাভ করে নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য নামে এবং তাঁর রামায়ণ 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামে পরিচিত হয়েছিল।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৭৩১ নং পুঁথি।
২। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, পৃ ২।৭—৩

"মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।
প্রভুর কৃপায় হইল রচিতে রামায়ণ ॥
যজ্ঞ পবিত্র নাহি বয়স সপ্ত বৎসর।
জন্ম নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ ॥
পয়ার প্রবন্ধে পোথা করিল প্রচার।
* * *
অদ্ভুত নাম হইল বিদিত সংসার।
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি ॥
অদ্ভুত হইল নাম সেই কারণ।
রামায়ণ গাইতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর ॥[১]

কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন এই মত স্বীকার করেননি, তাঁর মতে অদ্ভুত, বিচিত্র ঘটনাবলী সন্নিবেশের জন্য নিত্যানন্দের রামায়ণ অদ্ভুত রামায়ণ নামে পরিচিত হয়। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীও নিত্যানন্দের অদ্ভুত আচার্য নামকরণ সম্বন্ধে এই প্রচলিত কাহিনী অস্বীকার করেন। "অদ্ভুতাচার্য যেখানে যত অদ্ভুত কাব্যরসপূর্ণ আসর জমান কাহিনী পাইয়াছেন সমস্তই আনিয়া নিজের রামায়ণে ঢুকাইয়াছেন। তাহার উপরে চরিত্র চিত্রনে যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মত করিয়া চরিত্রগুলিকে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাতে এমন হৃদয় গ্রাহী আদর্শবাদের অবতারণা করিয়াছেন যে তাহা পাঠক মাত্রেরই মনোরম না হইয়া পারেনা।[২] অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের অনেক কাহিনী পরবর্তীকালে লিপিকারদের দ্বারা কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনুপ্রবেশ করেছে। বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন পুঁথিতে নেই, পরবর্তীকালে লিপিকারদের দ্বারা তা কৃত্তিবাসী রামায়ণে সংযোজিত হয়েছে। কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর সুমিত্রাকে চরুর ভাগ দেওয়ার যে কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে তা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত। কিন্তু অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে কৌশল্যার চরিত্র আদর্শ চরিত্র। তাঁর মধ্যে স্বার্থবুদ্ধির কণামাত্রও নাই। স্বপত্নী সুমিত্রাকে তিনি কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সবসময় সযত্নে রক্ষা

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫।
২। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, পৃ, ৩।

করেছেন। মহারাজা দশরথ যজ্ঞোত্থিত চর্ ভক্ষণের জন্য কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে ডেকে পাঠান। কৌশল্যা দশরথের উপেক্ষিতা পত্নী সুমিত্রাকে সঙ্গে করে যজ্ঞস্থলে গমন করেন এবং সুমিত্রার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলন সাধন করেন—

কৌশল্যাএ বোলে শুন দেবনারীগণ।
তোমা সবে স্থানে করি প্রতিজ্ঞা বচন ॥
যদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রার স্থান।
তব সে দেখিব আমি স্বামীর বদন ॥[১]

সুমিত্রাকে কেবল স্বামী সদনে পাঠিয়ে তিনি ক্ষান্ত হননি, বাঙ্গালী নারীর স্বভাব সুলভ কৌতুহলের বসে তিনি সপত্নীর বাসর ঘরে আড়ি পাততেও গেছিলেন। বাঙ্গালী কবি অদ্ভুতাচার্য এভাবে বাঙ্গালীর জীবন, রসচেতনা ও বাঙ্গালী মানসের পরিচয় দিয়েছেন।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে রামচন্দ্র হীন সন্দেহের বসবর্তী হয়ে সীতাকে বনবাসে পাঠান। ভগিনীদের অনুরোধে সীতা মাটিতে রাবণের মূর্তি অঙ্কিত করে তাঁদের দেখান। মূর্তিটির উপর সীতাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে এবং সরোবরের তীরে রজকের মুখে সীতার নিন্দা শুনে রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাবার দৃঢ় সঙ্কল্প করেন। মায়ামৃগের ঘটনাটিও অদ্ভুতার্যের রামায়ণে অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাম স্বর্ণমৃগের অন্বেষণে গেলে দেবতাগণ চক্রান্ত করে রামের স্বরের অনুকরণ করে লক্ষ্মণকে ডেকেছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে মারীচ রামের স্বরের অনুকরণ করেছিল।

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে বিভিন্ন বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে দশরথ ও বসুমতীর সংলাপটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাংশে নূতনত্বের দাবি করতে পারে। রাজা দশরথ একবার কৌশল্যাকে রাজ্য চালাবার ভার দিয়ে দেশ-ভ্রমণে বের হন। সে সময়ে এক তপোবনে তিনি বসুমতীর রূপে আকৃষ্ট হলে বসুমতী ভবিষ্যতে দশরথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হবে বলে তাঁকে পরিহাস করে বলেন—

১। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩।

"দেবী বলে শুন রাজা আমার বচন।
রাজা হইয়া হেনমত কিসের কারন ॥
এখনে শাঁপিয়া তোমা করিত বিনাশ।
তোমা সঙ্গে পরিণামে হবে পরিহাস" ॥১

এইভাবে দেখা যায় অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনী অপেক্ষা স্থানীয় লোক গাথা ও লৌকিক কাহিনীর উপর অধিক নির্ভর করেছেন। তাই তাঁর রামায়ণ, কাহিনী গল্প-প্রিয় বাঙ্গালী সমাজের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণের সমন্বয়ে অদ্ভুতাচার্য শতস্কন্ধ রাবণ বধ নামে আরও একখানি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। চিত্তরঞ্জন সংগ্রহ শালার ২৯২ সংখ্যক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১৭ সংখ্যক পুঁথিতে শতস্কন্ধ রাবণ বধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শতস্কন্ধ রাবণ বধ কাব্যে রাবণের ভ্রাতা শতস্কন্ধকে রামচন্দ্রের পরিবর্তে আদ্যাশক্তি রূপিনী সীতাদেবী বধ করেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর রামায়ণ অনুবাদকদের মধ্যে কৈলাস বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদকেরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে কাহিনী অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করে ভাবানুগামী অনুবাদ করেছেন। তাই এতদিন পর্যন্ত অনুবাদ সাহিত্যগুলিতে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের রসাস্বাদনে বাঙালী পাঠক সমাজ বঞ্চিত ছিল। কৈলাস বসু প্রথম অদ্ভুত রামায়ণের হুবহু মূলানুগামী অনুবাদ করেন—

অদ্ভুত রামায়ণে আছে—

"রামোহচিন্ত্যো নিত্যচিত সর্বসাক্ষী
সর্বান্তঃস্থঃ সর্ব্বলোকৈক কর্ত্তা।
ভর্ত্তা হর্ত্তানন্দমূর্ত্তি বিভুবা
সীতাযোগাশ্চিন্ততে যোগিভিঃ সঃ ॥

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি, সংখ্যা—১০৬১।

অপানিপাদো জবনো গৃহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ॥
স বেত্তি বিশ্বং নহিতস্য বেত্তা।
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্" ॥[১]

কৈলাসবসু মূলেরই সম্পূর্ণ প্রতিধ্বনি করে অনুবাদ করেছেন

জ্ঞানিগণ ব্রহ্মজ্ঞানে চিন্তয়ে যাহারে।
তিহ' সীতারাম বলি জানি তোঁহারে ॥
সকলের সাক্ষী সর্ব্ব অন্তর্গত তিনি।
সকলের হর্ত্তাকর্ত্তা জনকজননী ॥
নিরাকার নির্ব্বিকার নিত্যানন্দময়।
মহাযোগী ঋষী যাঁরে হৃদয়ে চিন্তয় ॥
চরণ নাহিক তাঁর সর্ব্বত্র গমণ।
কর নাহি সব তিনি করেন গ্রহণ
চক্ষু নাহি সকলি যে পারেন দেখিতে ॥
কর্ণ নাহি পান তিনি সকল শুনিতে।
সকল জানেন তিনি এ বিশ্বসংসারে ॥
জগতের মধ্যে কেহ নাহি জানে তাঁরে।
সকলের আদি তিনি পুরুষ প্রধান ॥
সকলের অগোচর তাঁহার যে স্থান" ॥[২]

কিন্তু দুর্ভাগ্য পুঁথিটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৬৬ নং পুঁথিতে পরশুরামের দর্পচূর্ণ পর্যন্ত অংশ পাওয়া গেছে। পুঁথিটি সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সাহিত্য হতে পারত। পরবর্তীকালে অনেক কবি তাঁরই অনুসরণ করে মূলানুগামী অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেহই কৈলাস বসুর মত সার্থক অনুবাদক হতে পারেন নি, সম্পূর্ণ রামায়ণ অনুবাদ করাও কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি।

১। অদ্ভুত রামায়ণম্, বাল্মীকি বিরচিত, বেঙ্কটেশ্বর ছাপা খানায় প্রকাশিত, ১৮০৬ শকাব্দ, পৃ ২৭।
২। পু নং ৫৬৬, পৃ ৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী জীবনে রামায়ণ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা দেশে পাঠান-তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলেও এরা দীর্ঘদিন এদেশে বসবাস করার ফলে বঙ্গভূমি তাদের কাছে মাতৃভূমির মত হয়ে উঠেছিল। তাই হুসেন শাহ, সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ প্রভৃতি উদার ও মহানুভব সুলতানরা এদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তদুপরি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালী জীবনের সর্বত্র এক নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় মোগল শাসন কায়েম হওয়ার সংগে সংগে বাঙালীর সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। বাঙালী মোগল শাসনকে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না, এদেশে মোগল শাসন ছিল বিদেশী শাসনের সামিল। তাছাড়া সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন পর্তুগীজ জলদস্যু ও আরাকানের মগদের অত্যাচারে সদা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি মারাঠা দস্যু বর্গীদের অত্যাচারে বাংলার গ্রামগঞ্জেও জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। চৈতন্য প্রভাবিত নবজাগরণের দুর্বার গতিবেগও ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এল। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের মত বাংলা সাহিত্যের মানও নিকৃষ্ট হয়ে এল।[১] তাই বলে বাঙালীর সাহিত্য সৃষ্টিতে অপ্রাচুর্য কখনো ছিলনা। মঙ্গলকাব্য, যাত্রাগান, পালাগান, নাথ সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখা উপশাখার সৃষ্টি হল। কিন্তু কোন বিরাট বিস্তৃত ভাবগম্ভীর সাহিত্য রচিত হওয়া বা অনুবাদ হওয়ার মত পারিপার্শ্বিকতা তখন ছিল না। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ছাড়া এযুগে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (৩য় খণ্ড), ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ, পৃঃ, ১—২।

প্রাচুর্য কম ছিলনা কিন্তু গুণগত উৎকর্ষের ছিল নিতান্তই অভাব। তাছাড়া কৃত্তিবাসের মত সৃষ্টি ধর্মী ভাবানুবাদও কেউ করতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই বিপর্যয়ের মধ্যেও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। তা হল বাঙালীর নব জাতীয়তা বোধ। নানাদিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে বিক্ষুব্ধ বাঙালীর জীবন রসচেতনায় একটা সার্বজনীন সমন্বয় সাধনের প্রবণতা দেখা গেল। তাই অভিজাত চিন্তা কেন্দ্রিক সাহিত্যের পরিবর্তে সমন্বয়বাদী সার্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হল। বাংলা মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য প্রভৃতি এই যুগচেতনারই ফসল। বাঙালী কবির রামায়ণ অনুবাদেও এই যুগসচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এখন থেকে রামায়ণ কাব্য সংস্কৃত ও পৌরাণিক কাহিনীর খোলস ছেড়ে সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের বোধগম্য সাহিত্যের রূপ ধারণ করল,মহাকাব্যের পরিবর্তে খণ্ডকাব্য, সমগ্রজীবনের পরিবর্তে জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে কাব্য রচনা শুরু হল। সুরধর্মী মহাকাব্যের নায়ক শ্রীরামচন্দ্র সুখে দুঃখে কাতর মর্ত্যমানবে পরিণত হলেন এবং কিংবদন্তীর বহু ঘটনা অবলম্বন করে রামায়ণ কাহিনীতে বৈচিত্র সৃষ্টি করা হল। জীবনের খণ্ডাংশ, খণ্ডচিত্র রূপায়িত করতে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ কাহিনীর পরিবর্তে অঙ্গদরায়বার, সীতার বনবাস রামের বনবাস, লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়, শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয় প্রভৃতি খণ্ডকাব্য রচিত হল।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, ভবানী দাস, রামশঙ্কর দত্তরায়, দ্বিজলক্ষ্মণ, ঘনশ্যাম, গুণরাজ খাঁ, কবি শংকরচন্দ্র, রামপ্রসাদ জগদ্রাম, বন্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বহুকবি রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে কাব্য বচনা করেছেন। এদের অনেকের বিষয় এখনো অনাবিষ্কৃত, আবার অনেকের নাম পূর্ববর্তী কবির ভূমিকার অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ কাহিনীগুলি একদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও পদাবলী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অপরদিকে তাঁদের রামায়ণ কাহিনীতে প্রচলিত বহু লৌকিক কাহিনী মিশে গিয়ে কাব্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ এরূপ বিভিন্ন লৌকিক কাহিনী বা জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল।

চন্দ্রাবতী মনসামঙ্গলের বিখ্যাত কবি দ্বিজবংশী দাসের কন্যা। চন্দ্রার বিষাদময় কাহিনী পূর্ববঙ্গ গীতিকার চন্দ্রাবতী নামক একটি পালায় সংগৃহীত হয়েছে। কৈশোরে জয়চন্দ্র নামে এক সহপাঠী ব্রাহ্মণ যুবকের সংগে তাঁর প্রণয় সংঘটিত হয় এবং উভয়ের বিবাহ যখন প্রায় ঠিক জয়চন্দ্র তখন এক মুসলমান রমনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর চন্দ্রাবতী ভগ্ন হৃদয়ে শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পিতার আদেশে রামায়ণ রচনা শুরু করেন। কিছুদিন পর জয়চন্দ্র অনুতাপ দগ্ধ হৃদয়ে ফিরে এলে পিতার আদেশে চন্দ্রা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। বিফল মনোরথ জয়চন্দ্র নিকটবর্তী ফুলেশ্বরী নদীতে আত্মবিসর্জন দেন। এর পর শিব আরাধনায় নিযুক্ত থাকাকালীন এই শোক সন্তপ্ত কবি-জীবনের অবসান ঘটে।[১]

কেবল রামায়ণ নহে পূর্ববঙ্গ গীতিকার দস্যু কেনারামের পালা, মলুয়ার পালাও চন্দ্রাবতী রচনা করেছিলেন। তাছাড়া পিতা বংশীদাসের মনসার ভাসানেও কয়েকটি পদ চন্দ্রাবতী রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কোন লিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার জন্য পুঁথি সংগ্রহ করতে গিয়ে চন্দ্রকুমার দে মহাশয় ময়মনসিংহ অঞ্চলের মহিলাদের মুখ থেকে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ পালা সংগ্রহ করে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার ৪র্থ খণ্ডের ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ময়মনসিং অঞ্চলের বিবাহ, পূজা-পার্বণ ও ব্রত-কথা ইত্যাদিতে এই রামায়ণ পালা গান করা হত। পালাটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। সীতার বনবাস অংশটিতে পুঁথিটি খণ্ডিত হয়েছে। চন্দ্রকুমার দে পালাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমভাগে রাবণের দিগ্বিজয় এবং রামসীতার জন্ম, দ্বিতীয় ভাগে সীতার বারমাসী, তৃতীয় ভাগে সীতার বনবাসের পূর্বে পালাটি খণ্ডিত হয়েছে। সমগ্র পালাটিতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। পালাটির মধ্যে কোথাও ধারাবাহিকতা নেই। খণ্ড খণ্ড কাহিনী, পৃথক পৃথক ঘটনা অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন পালা রচিত হয়েছে। কাহিনী অংশটিতেও গ্রাম্য জীবনের ছবি সুস্পষ্ট, ভাষা অনেকটা পরিমার্জিত। সমগ্র রচনাটিতে 'গো' শব্দ ব্যবহার করে মেয়েলী ছড়ার রূপদান করা হয়েছে।

চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণ পালায় বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস অপেক্ষা অদ্ভূত রামায়ণের উপর সমধিক নির্ভর করেছেন। অদ্ভূত রামায়ণে বর্ণিত সীতার জন্ম কাহিনীর সঙ্গে চন্দ্রাবতী বর্ণিত সীতার জন্ম পালাটির অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। অদ্ভূত রামায়ণে আছে রাবণ দিগ্বিজয়ে বের হয়ে দণ্ডাকারণ্য নিবাসী ব্রাহ্মণদিগের রক্ত তিল-তিল সংগ্রহ করে কলসী পূর্ণ করে রেখে-ছিলেন। লঙ্কায় উপস্থিত হয়ে তিনি মন্দোদরীকে ঐ রক্ত নিজে পান করতে এবং অন্যকে পান করতে দিতে নিষেধ করেছিলন। কারণ ঐ রক্ত বিষ অপেক্ষাও অধিকতর বীর্য সম্পন্ন। রাবণ দিগ্বিজয়ে বের হওয়ার পর বিরহে কাতর মন্দোদরী আত্মহত্যার জন্য উক্ত রক্ত পান করে গর্ভবতী হন এবং লোকলজ্জার ভয়ে কুরুক্ষেত্রে গিয়ে গর্ভপাত করে ভ্রূণ ভূতলে প্রোথিত করে রাখলেন। জনকের লাঙ্গলে উহা পরে সীতারূপে উত্থিত হয়েছিল। চন্দ্রাবতীর বর্ণিত রামায়ণ কাহিনীতেও ব্রাহ্মণদিগের রক্ত পান করে মন্দোদরী গর্ভবতী হন এবং কুরুক্ষেত্রে গিয়ে গর্ভপাত না করে ঘরেই একটি ডিম্ব প্রসব করেন। তখন গণকের ভবিষ্যৎ বাণী হয় যে এই ডিম্ব থেকে যে মেয়ে জন্মাবে তার জন্য রাবণ সবংশে ধ্বংস হবে। রাবণ ডিম্বটি ধ্বংস করতে চাইলে মন্দোদরী মাতৃস্নেহ বশতঃ ডিম্বটি ধ্বংস না করে একটি সোনার কৌটায় ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন। কৌটাটি ভাসতে ভাসতে জনকের ঘাটে এসে ঠেকলে মাধব নামক এক জেলে তাকে পায়, মাধবের স্ত্রী সতা স্বপ্নাদেশ পেয়ে ডিম্বটিকে জনকের মহিষীকে প্রদান করে। সতার নাম অনুযায়ী মেয়েটির নাম হয় সীতা। রামচন্দ্রের জন্ম কাহিনীতেও কৌশল্যাদি রাণীর যজ্ঞোত্থিত চরু ভক্ষণের পরিবর্তে এক মুনি কর্তৃক আনীত ফল খেয়ে রাণীদের গর্ভে রাম প্রভৃতি চারি ভ্রাতার জন্ম হয়।[১]

কৌশল্যা চরিত্র বর্ণনায় কবি অদ্ভূতাচার্যের (নিত্যানন্দ) রামায়ণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অদ্ভূতাচার্যের মত চন্দ্রাবতী ও কৌশল্যা চরিত্রকে উদার ও মহানুভব করে সৃষ্টি করেছেন—

সরলা কৌশল্যা দেবী গো কি কাম করিল।
মুনির দেয়য়া ফল রাণী গো তিনভাগ কৈল ॥

১। পূর্ববংগ গীতিকা—দীনেশ চন্দ্র সেন, চতুর্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, পৃঃ ২৫০, ২৫১-৫২।

একভাগ নিজে খাইল রাণী গো আর দুইভাগ লইয়া।
সুমিত্রা কৈকেয়ীর ঘরে দিল গো পাঠাইয়া ॥[১]

শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম অংশটিতে কৃষ্ণের শতনামের অনুকরণে রামচন্দ্রের বিভিন্ন নাম রাখা হয়েছে।

কৌশল্যা রাখিল নাম গো কাঙালের ধন।
দশরথ নাম রাখে গো অযোধ্যা ভূষণ ॥
রাজ্যবাসী নাম রাখে গো রাম রঘুবর।
পুর নারী নাম রাখে গো শ্যামল সুন্দর ॥
ধ্যানে জানিয়া গো বশিষ্ঠ তপোধন।
নাম রাখে গো রামচন্দ্র কমললোচন ॥[২]

এর সংগে শ্রীকৃষ্ণের শতনাম তুলনীয়—

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছা ধন ॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজ বালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ॥
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই ॥[৩]

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে কবিদিগের বারমাসী বর্ণনার দিকে একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। চন্দ্রাবতীও রামায়ণ পালায় পূর্ববর্তী কবিদিগের অনুসরণ করে সীতার বারমাস্যা বর্ণনা করেছেন—

"বৈশাখ মাসেতে দিনরে অরণ্য প্রবেশ।
শিরে জটা প্রভু রামের গো সন্যাসীর বেশ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দিন রে রবির বড় জ্বালা।
পাষাণে ঠেকিয়া পদ গো রক্ত পড়ে ধারে ॥
দুঃখিত হইয়া প্রভু গো সীতার অংগে বাতাস করে

* * * *

১, ২। পূর্ববঙ্গ গীতিকা—দীনেশ চন্দ্র সেন, চতুর্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২, পৃঃ ২৫০, ২৪১-৫২।

১। শ্রীশ্রী কৃষ্ণের শতনাম, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, কাব্যবিনোদ, ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী, পৃ ১২

আষাঢ় মাসেতে দিন গো ঘন বরিষণ।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আসে গো যতদেবগণ॥
মেঘে তে নাইকো পাণি সীতার চক্ষে যত জল।
কান্দিয়া ভিজাই আমি গো অশোকের তল'' ।[১]

চন্দ্রাবতী রচিত এই বার মাসিয়াটিতে কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ণিত ফুল্লরার বার মাসিয়ার নিকটতম সাদৃশ্য রয়েছে—

অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আটে খুঞার বসন॥

* * * *

আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল
বড় বড় গৃহেস্থের টুটয়ে সম্বল॥
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব কি দুষিব বাপ যায়॥[২]

কবিকঙ্কন বারমাসিয়া বর্ণনার সময় অবিমিশ্র দুঃখের কথা বলে গেছেন। দুঃখ অবসানের ইঙ্গিত কোথাও দেননি। কিন্তু চন্দ্রাবতীর বারমাসিয়াটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এতে চরম দুঃখ বর্ণানার পর ক্রমশঃ দুঃখ অবসানের কথাও বলেছেন। যেমন—

শ্রাবণ মাসেত আমি গো দেখিনু স্বপন।
হইল প্রভুর সঙ্গে গো সুগ্রীব মিলন॥[৩]

এইভাবে কবি বিভিন্ন মাসের বর্ণনা দিয়েছেন। ভাদ্র মাসে রামের দূত হনুমানের পক্ষীরূপ ধারণ করে সীতাকে রামের সংবাদ প্রদান, আশ্বিন মাসে রামচন্দ্রের রাবণ বধের জন্য অকালবোধন, কার্তিক মাসে সরমার সীতার দুঃখে সান্ত্বনা দান, অগ্রহায়ণ মাসে রামচন্দ্রের কটক বাহিনী সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কা

১। পূর্ববংগ গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫—২৬০
২। কবিকঙ্কন চন্ডী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, ১ম ভাগ, ১৯৫২, পৃ ২৫৮
২। পূর্ব বঙ্গ গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬০

ঘিরে রাখে, মাঘ মাসে ইন্দ্রজিতাদি রাবণের বীর পুত্রের মৃত্যু, আর ফাল্গুন মাসে রাবণ সবংশে নিধন হল। অবশেষে এল চৈত্র মাস। সীতার দুঃখ নিশিরও অবসান হল—

চৈত্র মাসেতে সীতার গো দুঃখ হইল দূর।
পোহাইল দুঃখের নিশি গো আইল সুখভোর।।
অন্ধেতে পাইল যেমন গো নয়ণের মনি।
তেমতি দুঃখিনী সীতা গো পাইল নয়ণের মনি।।[১]

তারপর দুঃখ-নিশির অবসানে রাজকুমার ও রাজকুলবধূ অযোধ্যায় ফিরে এলেন। সখীরা কায়মনোবাক্যে রামসীতার মনোরঞ্জন করতে লাগলো। কিন্তু সীতার জীবনে আবার দুর্ভাগ্যের কালছায়া নেমে এল। রামের বনবাসের জন্য যেমন মন্থরা চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তেমনই জনম দুঃখিনী সীতার বনবাসের জন্য ককুয়া চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। ককুয়া সীতাকে রামের মূর্তি অঙ্কিত করে দেখানোর জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগল। সীতার পরিচারিকা ও সখীদের নিষেধ কিছুই সে মানলনা। ককুয়ার চাপে পড়ে সীতা পাখার উপর রাবণের মূর্তি অঙ্কিত করে দেখান। এদিকে গর্ভবতী সীতা নিদ্রিত হয়ে পড়লে ককুয়া পাখাটি সীতার বুকের উপর রেখে দিয়ে রমাচন্দ্রকে ডেকে এনে দেখাল। চন্দ্রাবতীর ককুয়া চরিত্রটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জীবন্ত চিত্র হয়েছে। সে কেবল ভ্রাতৃজায়া বিদ্বেষী ননদিনী নহে—শ্বশুর বাড়ীতেও সে ঘর করতে পারেনা। শ্বশুর শাশুড়ী তার দুচোখের বালি। স্বামীকে সে ঔষধ খাইয়ে পাগল করেছে। দেবর ভাশুর প্রভৃতি পরিবারের কাকেও সে সহ্য করতে পারেনা। পরের ঘরে ঝগড়া বাঁধানো, এবং পরের কলঙ্ক রটনা তার একমাত্র কাজ। সধবা হয়েও সে বিধবার মত পিত্রালয়ে থাকে এবং ভ্রাতাকে প্ররোচিত করে ভ্রাতৃজায়াকে বনবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। অযোধ্যার প্রজাসাধারণের সন্দেহ চক্ষুর বিষবাণের সঙ্গে ককুয়ার দুরভিসন্ধি মিশ্রিত হয়ে সীতার জীবনে আবার দুঃসহ বনবাস দুঃখ নেমে এল। এই ককুয়া রামের বৈমাত্রেয় ভগিনী, কৈকেয়ীর গর্ভজাত কন্যা। যেমন মা তেমনি ঝি। তাই আবার মন্থরা কর্তৃক শিক্ষিতা। সেও রামসীতাকে বিষের মত দেখিত। অযোধ্যা যখন

১। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬০

ভরতের হইল না তখন তাহা শ্মশান হউক। এই ছিল তার কামনা। ফলেও তাহাই হইল"।[১]

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেন চন্দ্রাবতীর ককুয়া চরিত্র নূতন সৃষ্টি নহে। কাশ্মীরি রামায়ণ, জৈন রামায়ণ এবং তিব্বত, মালয়, কম্বোজ, জাভা প্রভৃতি দেশের রামায়ণেও সীতার বনবাসের জন্য অনুরূপ চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণে উল্লেখিত—

আমি কি গো জানি সখী কালসর্প বেশে।
এমনি করিয়া সীতায় গো ছলিবে রাক্ষসে॥
প্রণাম করিনু আমি গো পড়িয়া ভূতলে।
উড়িয়া গরুর পক্ষী গো সর্প যেমন গেলে॥
রথেতে তুলিল গো মোরে দুষ্ট লঙ্কাপতি।[২]

এই অংশটির সঙ্গে মেঘনাদ বধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের সীতার উক্তি তুলনীয়—

"হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট-কালসর্প বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তাহলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে"?[৩]

চন্দ্রা কবি ও মধুসূদনের কাব্যের অপূর্ব সাদৃশ্য দেখে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেন মধুসূদন চন্দ্রাবতীর রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সীতা-সরমা কথোপকথন চন্দ্রাবতীর রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।"[৪] পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে মেয়েরা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলোৎসবে গান করতেন। মাইকেল নিশ্চয়ই তাহা শুনিয়া থাকিবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতাবাসী মাইকেল মধুসূদন ময়মনসিং অঞ্চলের স্থানীয় মহিলাদের মুখ থেকে রামায়ণ পালা শুনে তা তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্যে

১। সৌরভ পত্রিকা, মহিলা কবি চন্দ্রাবতী শীর্ষক প্রবন্ধ, চন্দ্র কুমার দে, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ১১৮—১৫২

২। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৪

৩। মধুসূদন গ্রন্থাবলী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দেব সম্পাদিত, পৃঃ ১১৭—১১৮

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪১

রূপদান করেছেন অথচ মাইকেলের চিঠিপত্রে বা তাঁর জবানীতে কোথাও তার উল্লেখ থাকবেনা তা ভাবা যায় না। মাইকেলের রচনা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। চন্দ্রাবতীর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের হস্তাবলেপের ফলে এই দুই কবির মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য ঘটেছে। দে মহাশয় চন্দ্রাবতীর রামায়ণের এই অংশটিতে মাইকেলী ভাব ভাষা ও ভঙ্গিমা আমদানী করেছেন বলে মনে হয়। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল সম্বন্ধে দীনেশ সেনের এই উক্তি অবিশ্বাস্য ও হাস্যাস্পদ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।[১]

অবশ্য চন্দ্রাবতীর রামারণের মুদ্রিতরূপে মাইকেলের রীতি অনুপ্রবেশ করলেও কথাবস্তুটি চন্দ্রাবতীর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ ময়মনসিং এর ব্রাহ্মণকন্যা চন্দ্রাবতীর রামায়ণের সঙ্গে যদি কাশ্মীরি রামায়ণ, জৈন রামায়ণ ও বহির্ভারতীয় রামায়ণের বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য থাকে তবে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি চন্দ্রাবতীর সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর কবি মাইকেলের বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়া চন্দ্রাবতীর সংস্কৃত শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক কিন্তু কাশ্মীরি রামায়ণ ও বহির্ভারতীয় রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁর পরিচয় থাকার কথা নয় কিন্তু দেশে দেশে কালে কালে কাব্যের এমন কতকগুলি সাধারণ বিষয়বস্তু থাকে যা স্থান কালের ব্যবধান লুপ্ত করে বিভিন্ন কবির কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে। অথচ এঁরা কেউ কারও দ্বারা প্রভাবিত নহেন।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্য পল্লীবাংলার সমাজ ও পরিবার জীবনের একটি উজ্জ্বল চিত্র। কোপন স্বভাবা ঘর ভাঙ্গনো ননদিনী বধূর অদৃষ্টে পূর্বেও ছিলই, এখনো কিছু কিছু আছে, যাদের জন্য পরিবারে ভাঙ্গন ধরে, নিত্য অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকে। এদের জন্য স্বামী-স্ত্রী ও ভ্রাতায়-ভ্রাতায় পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে। আবার পুরুষের বহুবিবাহের ফলে পরিবারের মধ্যে যে কেবল কোন্দল লেগে থাকতো তা নয়, তারা পরস্পর সহোদরার

ন্যায় বাস করতো এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীলও ছিল। কোপন স্বভাবা ককুয়া, উদার হৃদয়া সরলা কৌশল্যা প্রভৃতিকে কবি তাঁর চার পাশে যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনই কাব্যে রূপ দান করেছেন। এভাবে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্য বাঙ্গালীর ঘরের কথায়. ঘরের মানুষের জীবনচিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্য বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

ভবানী দাস রামের স্বর্গারোহন পালার রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রামের স্বর্গারোহন পালা রচনা করেন। ইহার শেষের কয়েক পাতা পাওয়া যায়নি। কবি শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা করে পালা আরম্ভ করেছেন—

নমো রাম চন্দ্রায়.

সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি।
তথাপি শ্রীরামগুন কহিতে না পারি॥
বুদ্ধি অনুরূপে আমি করিব রচন।
উত্তরার শেষে শ্রীরামের স্বর্গারোহন॥
সীতা পাতালে গেল লোক চমৎকার।
অযোধ্যার লোক সব করে হাহাকার॥
রাজ্য করে প্রভুরাম মনেও অসুখ।
পাত্রমিত্র সকলের মনে ভারি দুঃখ॥

* * *

সর্ব্বজন বোলে শুন রামের চরিত
উত্তরার শেষে ভবানী দাসের রচিত॥[১]

বিষ্ণুর অভাবে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে যে একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছিল কবি তা সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

"রাজা বিনা সোভা নাহি প্রিথিবীর ভিতর।
বিষ্ণু বিনে শূণ্য দেখি অমরা নগর॥

১। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, (১ম খণ্ড) মুনসী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১৭।

বিষ্ণু বিনে দেবগণের গতি নাহি আর।
হেনপদ না দেখিয়া করে হাহাকার" ॥[১]

ব্রহ্মা কালপুরুষকে ডেকে এনে মর্ত্যলোকে রামচন্দ্রের কাছে পাঠালেন—

শুন কালপুরুষ তুমি আমার বচন।
সত্তর চলিয়া যাও অযোধ্যা ভুবণ ॥[২]

এই নির্দেশ অনুযায়ী কালপুরুষ অযোধ্যা গমন করে রামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে দ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় দুর্বাসা রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। দুর্বাসার ক্রোধের ভয়ে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট মুনিকে নিয়ে গেলেন। এই অপরাধে লক্ষণ বর্জন হল। এই অংশটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ। পালাটির শেষের দিকে অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে মিল দেখা যায়—

মুনি শাপ হতে সব পাসরিয়া ছিলা।
শাপ দূর হৈয়া রাম সকল স্মরিলা ॥[১]

পালাটির কিছু কিছু অংশ নাটকীয় লক্ষণযুক্ত, কাহিনী, উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। রামের স্বর্গারোহণ পালা ব্যতীত কবি রাধাবিলাস ও গজেন্দ্রমোক্ষণ নামে ভাগবতের আদর্শে দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ দুটির অনুলিপির তারিখ ধরে কবির জন্ম সন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলে অনুমান করা হয়েছে। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম যাদব, মাতার নাম যশোদা। জন্মস্থান পাণ্ডুয়া গ্রামে। কবি সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ পদবী যুক্ত ছিলেন।

কবি রামশংকর দত্তরায় সপ্তদশ শতাব্দীর আর একজন শক্তিশালী কবি। মানিকগঞ্জ থানার অধীন বায়রা গ্রামে কবির বাসভূমি ছিল। উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সৌদামিনী দাসের নিকট থেকে রামশংকর ভিষকের রামারণ সংগৃহীত হয়েছে। রামশংকরের রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, বাল্মীকির রামায়ণ ও তুলসী দাসী রামায়ণের আদর্শে রচিত হয়েছিল। কবির নিজের জবানীতেই এর প্রমাণ রেখে গেছেন—

১, ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫১৪ সংখ্যক পুঁথি।
৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৪৭ সংখ্যক পুঁথি।

বাল্মীকি রচিত গ্রন্থ শ্লোক অনুসারে।
কৃত্তিবাস আদি কবি পদ বন্দ করে ॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ আর অদ্ভুত গ্রন্থকার।
মহাভাগবত আদি পুরাণ প্রচার ॥
এই সব গ্রন্থ শুনি শ্লোক অনুসারে।
পদবন্ধ করি করে ভিষক শঙ্করে ॥
বাল্মীকি রচিত গ্রন্থ শ্লোক মনোহর।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে শ্রীরাম শঙ্কর ॥[১]

হরপার্বতীর রামকথা আলোচনা দিয়ে গ্রন্থারম্ভ হয়েছে। পার্বতী এর শ্রোতা, মহাদেব বক্তা—

কৈলাস শিখরে বস্যে ভবানী-শঙ্কর।
শ্রীরাম কথায় দোঁহে পুলক আন্তর ॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরানান্তর্গত রামায়ণী কথা।
পার্বতী যাহার শ্রোতা মহাদেব বক্তা ॥

সেহি কালেতে আছিলা কমল আসন।
আদ্যন্ত রাম কথা করিল শ্রবণ ॥[২]

এর সঙ্গে তুলসী দাসী রামায়ণের সাদৃশ্য দেখা যায়।

কবি কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকেও কিছুটা সার সংক্ষেপ করে তাঁর রামায়ণে সংযোজন করছেন—

অদ্ভুত কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিয়া।
কহিলা শঙ্কর কিছু সংক্ষেপ করিয়া।
বাল্মীকি রচিত গ্রন্থ তাহাতে পাইয়া পন্থ।
পদবন্ধে কহেত শঙ্কর ॥
অদ্ভুতাচার্য্য কবি সরস্বতী বরে।
পদবন্দ করি কহে শ্রীরামশঙ্করে ॥

১, ২। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, মুনশী আবদুলকরিম সম্পাদিত. পৃঃ ১১০

৩। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রাগুক্ত পৃঃ ১১০

বিভিন্ন রামায়ণ কাহিনী ও পুরাণ গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও রামশংকরের রামায়ণে অধ্যাত্ম রামায়ণের আদর্শই সমধিক লক্ষিত হয়।

"শিব শিবা সংবাদে অধ্যাত্ম রামলীলা।
পঞ্চশত শ্লোক ব্যাসদেব বিরচিলা॥
বন্দিয়া জানকী নাথ শ্রীশংকরে গায়।
অরণ্য কাণ্ডের দশ অধ্যা হৈল সায়"॥১

রামলক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্রের নদী পার হওয়ার ঘটনা অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করলেও প্রতিভাধর শিল্পীর হাতে পড়ে ইহা কবির স্বকীয় রচনায় পরিণত হয়েছে—

হেদেহে নাবিকি আমার বচন শ্রবণ করহ ভাই।
বায়ে তরণী আনহ এখানে উপারে আমরা যাই।
রামের বদন হেরিয়া নাবিকি মোহিত হইয়া মনে।
কমললোচনে নাবিকি কহেন এমন বশেতে কেনে॥
শুন্যাছি শ্রবণে মুণির ঘরণী পাষান হইয়া ছিল।
রামের চরণ ধুলির পরশে পাষান মানুষী হল্য॥
সে রাম হইলে উপারি করিতে নারিএ নায়েতে কর্য্যা।
ভরণপোষণ কারণ তরণী চাপিলে যাবেক তব্যা॥
আমার পরশে মুণির ঘরণী মানব হইল বলে।
তোমার দারুর তরণী আমার চরণে তরিবে কেনে॥
নাবিক তখন কহেন পাষান কাষ্ঠে নাহিক ভেদ।
তরিলে আমার তরণী অনেক দিবস রবেক খেদ॥
চরণ যুগল পাখালি রাঘব চাপহ আসিয়া নায়।
নাবিক বচন শুনিয়া কমললোচন কহেন ভায়॥
নিকটে তরণী আনহ চরণ পাখালি তাহাতে উঠি।
তরণী আনিয়া নাবিকি রামের ধুয়াইল পদ দুটি॥
তরনীউপরে বসিলা রাঘব জানকী লক্ষ্মণ সাথে।
নাবিকি তরণী বাহিয়া উপারে রাখিলা কমলনাথে॥

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩০৬, পৃঃ ৩৯

ভাবিয়া রাঘব চরণকমল শ্রীরামশঙ্করে ভাষে।
নাবিকে আশীষ করিয়া গমন করিল মুণির বাসে" ॥[১]

রামশঙকরের মত কৃত্তিবাস এবং অদ্ভুতাচার্য (নিত্যানন্দ) এবই বিষয়ে পদ রচনা করছেন.

কৃত্তিবাস কবির রচনা,

"কোথা হইতে আইল পুরুষ সুন্দর।
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর ॥
নৌকামুক্ত হয়ে যদি লাগে পদধুলি।
কি দিয়া পুজিব আমি মম পোষ্যগুলি" ॥[২]

অদ্ভুতাচার্যের রচনা,

পদধুলি লাগে যদি কাষ্ঠে কি পাষাণে।
ততক্ষনে শরীর হয় শুনিঞাছি শ্রবণে।
অতি দীন দুঃখী আমি নৌকামাত্র পুজি।
মনুষ্য হইলে মোর কিবা হবে আজি" ॥[৩]

এই তিন কবির রচনার মধ্যে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্যের রচনা যেমন প্রাঞ্জল তেমনই প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট। কবির রচনা টুকরো ঘটনার সমষ্টি হলেও ভাষার সাবলীলতা এবং যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ফলে সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর হয়েছে। অধ্যাপক মনীন্দ্র মোহন বসু রামশঙ্করের রচনাকে আধুনিক কবিতার সমপর্যায়ে স্থাপন করেছেন।[৪]

দ্বিজলক্ষ্মণ রামায়ণের বিভিন্ন পালা রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত তাড়কাবধ, রামের বিবাহ, শিবরামের যুদ্ধপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও অতিকায়ের যুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন পালা একত্র করলে একটি পূর্ণাঙ্গ রামায়ণের

১। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রাগুক্ত, পঃ ১১০ ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬, পৃঃ ৬৯।
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৬৯।
৩। রামায়ণ,কৃত্তিবাস বিরচিত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, পৃ ১০৯
৪। বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, মনীন্দ্র মোহন বসু, ১৯৪৭, পৃঃ ১৪০

রূপ ধারণ করতে পারে। বিভিন্ন পালার মধ্যে লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও শিবরামের যুদ্ধ পালাটি সর্বাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয় পালা। দ্বিজলক্ষ্মণ যে অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের আদর্শে তাঁর রামায়ণ পালা রচনা করেছিলেন সে সংবন্ধে কবি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে গেছেন,—

অধ্যাত্ম শ্রীরামলীলা আদিকাণ্ডমায়
রামপদ রজঃ বন্দি শ্রীলক্ষ্মণ গায়।[১]

অদ্ভুত রামায়ণে বাল্মীকি বক্তা, শিষ্য ভরদ্বাজ শ্রোতা এবং নারায়ণের প্রতি নারদমুনির শাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিজলক্ষ্মণ শিবরামের যুদ্ধপালায় এই অংশটি বিবৃত করেছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং অদ্ভুতাচার্যের (নিত্যানন্দ) রামায়ণ থেকেও তিনি কিছু কিছু কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে রামলক্ষ্মণকে যাঞ্চা করলে এদের দুজনের প্রতি অত্যধিক অপত্য স্নেহবশতঃ তিনি রামলক্ষণের পরিবর্তে ভরত-শত্রুঘ্নকে দিতে চাইলেন, পরে বশিষ্ঠের অনুরোধে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ উপশমের জন্য রামলক্ষ্মণকে দিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বঙ্গবাসী সংস্করণে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দ্বিজলক্ষ্মণের রামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়,

দশরথ বলে আজি সর্ব্বনাশ হল্য।
আমার প্রাণ রামকে নিতে বিশ্বামিত্র এল্য॥
কি করি উপায় আমি নাঞি দিব রাম।
রাম গেলে না বাঁচিবেক আমার পরাণ॥
এক যুক্তি বলি শুন আমার বচন।
সাজন করিয়া দেহ ভরত-শত্রুঘ্ন"॥[২]

অন্যত্র দ্বিজলক্ষণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে রামলক্ষ্মণের দশরথের সঙ্গে গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে গুহকের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

১, ২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, পৃঃ ৬৭, ৬৮

শ্রীরাম বলেন মিতা তুমি প্রাণাধিক।
তোমা হেন বন্ধু মোর নাহিক অধিক॥
পিতৃ বোলে প্রভু রাম ভুলিলেক তারে।
বিদায় হইল গুহা প্রণমি সবারে'॥[১]

দ্বিজলক্ষণের আর একটি সুপরিচিত পালা লক্ষ্মণের শক্তিশেল। গণেশ ও সরস্বতী বন্দনার পর রাম নাম মাহাত্ম্য দিয়ে পালাটি শুরু হয়েছে।

নমো নমো গণেশায়, নমো সরস্বতি দিব্যৈ নমো।

* * *

রাম রাম প্রভু রাম কমল লোচন।
যে রাম সোরণে হএ দুঃখ বিমোচন॥
রাম নাম বোল ভাই মুক্ত হইতে পাপী।
অন্তকালে উদ্ধারিবে রাম বিষ্ণুরূপী॥
রাম নাম লইলে যথেক পাপ হরে।
পাপী হইআ তত পাপ কায়তে না পারে॥
আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবীর বিহা।
অজধ্যাত্র গেল রাম রাজ্য হারাইআ॥[২]

এই অংশটির সঙ্গে কৃত্তিবাস বিরচিত রাম নাম মাহাত্ম্য তুলনীয়,

রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরি বারে রাম নাম ভেলা॥

* * *

রাম নাম স্মরণে যমের দায এড়ি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ তরী॥[৩]

পালাটির মধ্য কৃত্তিবাসের ভণিতাও আছে,

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত বোলে রঘুনাথ পদতলে।
লক্ষ্মণ লইলা রাম কোলে"॥[৪]

১। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৬, পৃঃ ৬৮

২, ৩। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, পৃঃ ৯৭।

৪। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৮।

পালাটির শেষের দিকে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের আঘাত থেকে পরিত্রাণের পর রামলক্ষ্মণ ও বানরদের আনন্দ-নৃত্য বর্ণিত হয়েছে—

শক্তিশেল ফুটছিল পাইল পরিত্রাণ।
দেখি আনন্দিত রাম কমললোচন॥

গাছপাথর লইআ নাচে যত বানর গণ।
ধনর্বাণ হাতে নাচে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥[১]

এই অংশটির সঙ্গে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হেমতাল স্কন্ধে চাঁদসদাগরের নৃত্য তুলনীয়।

শুনিয়া যে চাঁদ বাণ্যা হরষিত হৈল।
কান্দে হেঁতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল॥
ভাল হৈল পুত্র মৈল কি আর বিষাদ।
কানীচেঙ্গ মুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ॥[২]

শব্দ যোজনায় ও উভয় কবির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। কেতকাদাস যেমন কোথাও কোথাও লখীন্দরকে 'লখাই' বলেছেন, দ্বিজলক্ষ্মণও লক্ষ্মণ এর নাম উল্লেখ করার সময় লক্ষ্মণের পরিবর্তে 'লখাএ' বলেছেন—

'তোমার প্রসাদে লখাএ হইল প্রতিকার'।

বস্তুতঃ উভয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে ভাষা, ছন্দ, ও শব্দগত মিল থাকা স্বাভাবিক, আবার উভয় কবিই দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য পালাগান রচনা করেছেন।

ঘনশ্যাম দাসের সীতার বনবাস একখানি ক্ষুদ্র পালাগানের সমষ্টি। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে পুঁথিটার কিছু অংশ মুদ্রিত আকারে পাওয়া গেছে। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিপির তারিখ ধরে মনে হয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। জৈমিনী ভারত বর্ণিত

১। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ১১৭

২। বাইশ কবির মনসা মঙ্গল, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ২০৪

রামায়ণের আখ্যায়িকায় লবকুশের যুদ্ধ বর্ণনা দিয়ে তিনি যে পালা গানটি আরম্ভ করেছিলেন তা কবির ভনিতা থেকে জানা যায়—

কৃষ্ণপদারবিন্দ মধুপানে মত্ত ভৃঙ্গ
শুনিভেজ ঘনশ্যাম দাস।
নূতন মঙ্গল গাথা জৈমিনি ভারত পুতা
ভকত জনার অভিলাষ[১] ॥

পালাটির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কবিত্বময় অংশ হল বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যক্তা সীতার প্রতি বন্য পশু ও পাখীদের সমবেদনার দৃশ্যটি।

"সীতা দেখি যত হস্তিগণ।
জল আনি করিলা সেচন ॥
তৃণ জল হরিণী তেজিয়া।
কান্দে তারা সীতারে দেখিয়া ॥
পশুগণ আদিকুন্ত আর।
কান্দে দুঃখ দেখিয়া সীতার ॥
নৃত্য তেজি ময়ূরগণ
সীতার অগ্রে ধরয়ে পেখম।
মহাসশর্প নিকটে আসিয়া
ছায়া করে ফণায় ধরিয়া ॥...[২]

সীতা ধরিত্রী জাতা, ধরিত্রীর বুকে বনপ্রান্তরে সীতার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়েছে। যেমন রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসের সময় বনের পশুপাখী, তরুলতা তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল তেমনই বাল্মীকির তপোবনে ও তারা পতি পরিত্যক্তা সীতার প্রতি সমবেদনায় অশ্রুপাত করেছে ও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। কালসর্প তার খল প্রবৃত্তি ভুলে গিয়ে সীতার মাথায় ছায়া দান করেছে। কবি এখানে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় কবিদের পথ অনুসরণ করে বনপ্রকৃতিকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে বর্ণনা করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে গুনরাজ খাঁ উপাধিধারী একজন কবি মহাভারতের

১। বাংলা সাহিত্য, ২য়, মণীন্দ্র মোহন বসু, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩১
২। বাংলা সাহিত্য ২য়, মনীন্দ্রমোহন বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

বনপর্ব অবলম্বনে 'ভারত রামায়ণ' রচনা করেন। অবশ্য গুনরাজ খাঁ উপাধি ধারী আরও তিনজন কবির নাম পাওয়া গেছে। এঁদের নাম হল, মালাধর বসু, ষষ্ঠীবর সেন ও ষষ্ঠীবর দত্ত। মালাধর বসু রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কাজেই ষষ্ঠীবর সেন ও ষষ্ঠীবর দত্তের মধ্যে একজন ভারত-রামায়ণের রচয়িতা। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক মনীন্দ্র মোহন বসু প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ মনে করেন গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবর সেন ভারত-রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কারণ ষষ্ঠীবর সেনের রামের স্বর্গারোহন পর্ব এবং তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস সেনের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব এবং রামায়ণের উত্তরকান্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকায় ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে ভারত রামায়ণের রচয়িতা গঙ্গাদাস সেনের পিতা ষষ্ঠীবর সেন।[১]

পুস্তকটি জৈমিনি ভারত, ব্যাসকৃত ভারত, এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে। কপট পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের বনগমন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে রামলীলা শ্রবণ দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে। মহিপতি রাজা ও উর্ব্বশীর আখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, প্রভৃতি রামায়ণ বহিভূর্ত বহু কাহিনী এতে সংযোজিত হয়েছে। টুকরো টুকরো কাহিনীর সংকলন এবং উৎকৃষ্ট্র কবি প্রতিভার অভাবে কাব্যগুলি পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন কতকগুলি কাহিনীর সমষ্টি মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গুণরাজ খাঁর রামায়ণে বিশ্বামিত্রকে প্রতারণা করার জন্য দশরথকে দায়ী না করে সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে দায়ী করা হয়েছে। বিশ্বামিত্র রাক্ষসদের হাত থেথে যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য দশরথের নিকট রামলক্ষ্মণকে প্রার্থনা করলেন। দশরথ অন্তপুরে এসে বিশ্বামিত্রের প্রার্থনার কথা জানালে সুমিত্রা ও কৈকেয়ী রামকে দিতে অস্বীকার করেন—

"সুমিত্রা কেকৈ বলে রামকে না দিমু
রাম না দেখিলে প্রাণ কেমতে ধরিমু।
ভরত লক্ষ্মণ দিমু না দিমু শ্রীরাম।[২]

১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, পৃঃ ১২৭।

২। সাহিত্য পরিষদ, ৫৪১ নং পুঁথি পৃঃ ৩৬।

পরের অংশটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুরূপ। ব্রহ্মশাপের ভয়ে ও বশিষ্ঠের অনুরোধে দশরথ রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দিতে বাধ্য হলেন। এর পর অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে তাড়কাবধ অংশটি বর্ণিত হয়েছে। তাড়কা ছিল একটি শাপ ভ্রষ্টা অপ্সরা। রামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়ে শাপমুক্ত হয়ে সে দিব্যমূর্তি ধারণ করল। অহল্যা উদ্ধার করে রামচন্দ্র হরধনুভঙ্গ করার জন্য জনক ভবনে গমন করলে ভাগবতের অনুসরণে সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের বিভূতি দেখান হয়েছে—

"মুনিগণে দেখিলেক বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
ক্ষেত্রি বৈশ্য দেখিলেক পরম সুন্দর ॥
দেখিলা রাক্ষসগণে যমের দোসর।
দেবতা গন্ধর্ব্বে দেখে ত্রিদশ ঈশ্বর ॥
নারিগণে দেখিলেক অতি নবরঙ্গ।
সর্ব্বলোকে দেখিলেক বিভূতি তরঙ্গ ॥[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ একটি বহু বৈচিত্রপূর্ণ গ্রন্থ। কবি নিজেকে কখনো ব্রাহ্মণ কখোনা বা কায়স্থ বলে চরিচয় দিয়েছেন—

"শূদ্র কুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল।
বুদ্ধবেশ ধরি এবে তত্ব লিখে গেল" ॥
শক্তি হেতু দ্বিজ অংশে হইল প্রচার ॥
কলিযুগে জীব লাগি বুদ্ধ অবতার।[২]

রামানন্দ ঘোষের রামায়ণে বহু পরস্পর বিরোধী ভাবধারা ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধারে দারুব্রহ্মা, শক্তি-রূপিনী কালি, পঞ্চ শক্তি এবং বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট

১। রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত পৃঃ ১২৬।

২। হরপ্রসাদ-সম্বর্দ্ধনা লেখমালা, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, পৃঃ ২৩১, ২৩৬, ২৪২

হন। মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য তিনি দারুব্রহ্মকে রাজা করতে চেয়েছিলেন,—

"যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একছত্র রাজা করি দারু ব্রহ্মোদিব" ॥[১]

শক্তি রূপিনী কালীর সহায়তা ছাড়া যে ম্লেচ্ছ অত্যাচার দমন করা যাবেনা এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাই শক্তিরূপিনী মহাকালীর কাছে তাঁর প্রার্থনা—

"বুদ্ধদেব কহে শ্যামা নিবেদি তোমায়।
ভাবিতেছি চিত্তে মাতা করি কিবা হয় ॥

০ ০ ০ ০

বুদ্ধদেব কহে বৃথা জন্মিল সংসারে।
লইয়া যাউক মহাকালী ভৈরব নগরে" ।।[২]

পঞ্চশক্তির উপাসনাও তিনি করেছেন—

রাধা, কালী, লক্ষ্মী বানী গঙ্গা গুনবতী।
পঞ্চ শক্তি প্রকাশ করিব এই মিনতি ॥[৩]

সর্বশেষে তিনি নিজেকে বুদ্ধরূপে ঘোষণা করেছেন—

আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কল্কি অবতার ।।
জগব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে।
মোর অংশ ছাড়া নেই কীট পক্ষী তৃণে ।।[৪]

তাঁর ধারণা কালী মানব কল্যাণের জন্য বুদ্ধদেবকে শাপগ্রস্থ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—

কল্কিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার
কলিতে জাগ্রত হৈলা ত্রিলোক জননী।
শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিলা অবনী ।।[৫]

১। হরপ্রসাদ-সম্বর্ধনা লেখমালা, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, পৃঃ ২৪২

২, ৩, ৪, ৫। হরপ্রসাদ-সম্বর্ধনা-লেখমালা, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪২, ২৪৩, ২৪৩, ২৪৬।

রামানন্দ যতই কালীর ভক্ত হউন না কেন তাঁর কাব্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবীয় ভাবধারা অপেক্ষা বৌদ্ধ প্রভাবই বেশী। সম্ভবতঃ উৎকলের বৌদ্ধগণের দ্বারা তিনি সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং বৌদ্ধগণের ন্যায় রামানন্দ জীবাত্মাকে নারীরূপে কল্পনা করে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন—

স্ত্রীলোকের সুখ কহে স্বামীর সন্তোষ।
মোর ভাগ্যে এ দেহেতে না হইল সংযোগ ।।
রামানন্দ কহে এই ভাবি দিবারাতি।
হায় আমি কি গুন দেখিয়া কৈনু রতি ।।[১]

তৎকালীন রাষ্ট্র ও সামাজিক অবস্থা রামানন্দ ঘোষকে বুদ্ধ অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। রামানন্দের সমসাময়িক যুগে কালা পাহাড়ের অত্যাচারে বাংলা ও উৎকলের হিন্দু ও বৌদ্ধদের জীবন সংশয়াপন্ন হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে দারু ব্রহ্মকে রাজা করার পরিকল্পনা হিন্দু মাত্রেই যে স্বাগত জানাবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই। তাছাড়া হিন্দুরা তখন বুদ্ধদেবকে দশ অবতারের এক অবতার রূপে স্বীকার করে নিয়েছে। কাজেই রামানন্দ ঘোষকে বুদ্ধ অবতার রূপে মেনে নিতে হিন্দুর আপত্তি রইলনা।

অন্যান্য বৌদ্ধ আচার্যদের ন্যায় রামানন্দও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম গ্রহণ উপলক্ষ্যে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে বর্ণনা দিয়েছেন।

সিতপক্ষ নবমী পুষ্যাতে উপযোগ।
বৃহস্পতি লগ্নে ক্ষেত্র মাহেন্দ্র সংযোগ ।।
লগ্নে চন্দ্রে চতুর্থ স্থানেতে ভূমি সুতে।
শশি স্থিত তৃতীয়ে কেন্দ্রিয়ে রাহু তাতে ।।

০ ০ ০ ০

দ্বিতীয় প্রহর বেলা উপর গগন।
কৌশল্যা দেবীর গর্ভে প্রসব বেদন ।।[২]

১, ২। হরপ্রসাদ-সম্বর্ধনা লেখমালা, ১ম খঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৯, ১৩১

কবি নিজেকে যতই বুদ্ধ অবতার বলে মনে করুননা কেন শেষ বয়সে স্ত্রী পুত্র ও সংসার হতে দূরে সরে গিয়ে তাঁর মনে দারুণ হতাশা দেখা দিয়েছিল—

এই দেহ দিনে দিনে হয়্যা গেল জরা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গ্রামে হইলাম সারা ।।[১]

অধ্যাপক মনীন্দ্র মোহন বসু মনে করেন রামানন্দ ঘোষ বুদ্ধদেবের অবতার ছিলেন না। তিনি জ্ঞানী অর্থে নিজেকে বুদ্ধাবতার বলেছেন।[২] কবি বুদ্ধদেবের অবতার ছিলেন না তা ঠিকই কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের দ্বারা তিনি যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর রামায়ণ কাব্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে,—

ঈশ্বর আরাধি রাজা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়্যা।
হইলা নির্ব্বাণ মুক্তি যোগেরে সাধিয়া ।।[৩]

বস্তুতঃ রামানন্দকে হিন্দু বা বৌদ্ধ কোন একটি অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না। তাঁর মধ্যে কোনরূপ ধর্মের গোঁড়ামী ছিলনা। রামানন্দ বৌদ্ধ হয়েও রামোপাসক ছিলেন। শ্যাম-শ্যামা তাঁর কাছে অভিন্ন ছিল। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ তত্ত্বের প্রতিও তাঁর গভীর আস্থা ছিল। এককথায় বলা যায় রামানন্দ তাঁর রামায়ণে শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে গেছেন।

পিতা জগদ্রাম ও পুত্র রামপ্রসাদ উভয়ে মিলে রামায়ণ কাব্য রচনা করেছিলেন। অম্বরীষের কন্যা শ্রীমতীর স্বয়ম্বরের ঘটনা দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করে অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী অনুসরণ করে গ্রন্থ শেষ করেছেন। কারণ কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবেন না এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে কৃত্তিবাসের বিস্তৃত লঙ্কাকাণ্ড বর্ণনার পর তিনি আর তা বর্ণনার সাহস করেন নি। তাই জগদ্রাম লঙকাকাণ্ড বাদ দিয়ে উত্তরকাণ্ড রচনা করেছেন। অবশ্য শেষ

১, ৩। হরপ্রসাদ-সম্বর্দ্ধনা লেখমালা, ১ম খঃ, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৪, ২৪৬

২। বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু, পৃঃ ১৪৫

বয়সে যখন বুঝতে পারলেন লঙ্কাকাণ্ড বাদ দিলে তাঁর রামায়ণ অসম্পূর্ণ হবে তখন পুত্র রামপ্রসাদকে তিনি লঙ্কাকাণ্ড রচনার জন্য নির্দেশ দিয়ে যান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে জগদ্রাম একজন প্রতিভাধর কবি ছিলেন। চিরাচরিত সপ্তকাণ্ডের পরিবর্তে তিনি তাঁর রামায়ণে ৮টি কাণ্ড ও ৯টি খণ্ড সংযোজিত করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করলেও তাঁর কাব্যের প্রত্যেকটি কাণ্ড, প্রত্যেকটি ঘটনা পরষ্পর দৃঢ় সন্নিবদ্ধ, চরিত্র চিত্রনেও তিনি কৃত্তিবাস অপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যা থেকে দূত ভরতকে নিতে এল পিতা ও ভ্রাতাদের সম্বন্ধে তাঁর কুশল প্রশ্নের উত্তরে কৃত্তিবাসের দূত ভরতের নিকট মিথ্যা কথা বলেছিল—

"দূত বলে রাজপুত্র সবার কুশল।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল।। ।[১]

কিন্তু জগদ্রামের দূত ভরতের নিকট মিথ্যা কথা বলে নাই—

কিছু নাহি কহে দূত রয় অধোমুখে।
তাহা দেখি ভরত বিকল হৈলা শোকে।[২]

কৃত্তিবাসের শত্রুঘ্ন পিতা ও ভ্রাতার শোকে অধীর হয়ে মন্থরাকে লাঞ্ছিত করেছিল—

"চুলে ধরে কুঁজিকে ফেলে ভূমিতলে"[৩]

জগদ্রামের শত্রুঘ্ন ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি তাঁর দাদা ভরতের ক্রোধ দূর করার চেষ্টা করেছেন। ভরত কৈকেয়ীকে ভৎসনা করলে জগদ্রামের শত্রুঘ্ন দাদাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন—

মন দিয়া শুন দাদা বলি পদতলে।।
দৈবকালে ধৈর্য্য, তবে সে নিস্তার।

১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ১১০-, ১১২

২। ৫৯৬১ সং পুঁথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত, প্রাগুক্ত, পৃ: ১১২

উগ্রগতি কৈলে বাড়ে দুর্গতি অপার ।।১

ও জগদ্রাম রামপ্রসাদের রামায়ণে অনেক কাল্পনিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রামচন্দ্র সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যাওয়ার জন্য লক্ষ্মণকে ব্যবস্থা করতে বললেন। লক্ষ্মণ সমুদ্রকে তার জলজন্তু নিয়ে একপাশে সরে যেতে বলল। কিন্তু সমুদ্র লক্ষ্মণের কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করল না; তখন লক্ষ্মণের ক্রোধাগ্নিতে সমুদ্রের জল শুকিয়ে গেল—

কোটি ভানু জিনি তনু কোপে সূর্য্যহেলা ।।
ক্রোধ করি লক্ষ্মণ পড়িল সিন্ধুজলে।
অঙ্গতেজে জল শুকাইছে হেনকালে ।।২

একটি কল্পিত কাহিনীর পর কবি আর একটি কল্পিত কাহিনীর অবতারণা করলেন। সমুদ্র শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় পৃথিবী জলাভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তখন দেবগণের স্তবে তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণ ক্রোধ সম্বরণ করলেন। কিন্তু সমুদ্রের শুষ্ক অংশ শুষ্কই রয়ে গেল। এই শুষ্ক অংশটি জলপূর্ণ করার জন্য রামচন্দ্র 'জানকী জানকী' বলে ক্রন্দন শুরু করলেন, অশ্রুধারায় সমুদ্র জলপূর্ণ হয়ে উঠল,—

জানকী জানকী বলি করেন রোদন ।।
সেই চক্ষু জলে পূর্ণ করিয়া বারিধি।
নেত্রজলে সিন্ধু পূর্ণ করিলা কৃপানিধি ।।৩

জগদ্রাম রামপ্রসাদের রামায়ণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এতে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগচেতনা সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে সমগ্র বাংলা ভূমি তখন প্লাবিত। বাঙ্গালী কবি এই বৈষ্ণবীয় ভাবধারা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ তাঁদের রামায়ণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যলীলার অনুকরণে রামরাস বর্ণনা করেছেন। অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য লীলা আস্বাদনের অভিপ্রায়ে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন এবং মহাদেবকে শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য লীলা বর্ণনার জন্য অনুরোধ করেন—

১, ২, ৩। ৫৯৬১ নং পুঁথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐশ্বর্য বিলাস পূর্বে হনু বলেছিলা ।।
মাধুর্য্য বিলাস অপ্রকাশ এ না শুনি ।
পদে ধরি নতি করি বল শূলপাণি ।।[১]

শিব তখন মাধুর্য লীলার অতি গুপ্ত নিগূঢ় তত্ত্ব এবং মাধুর্য লীলা আস্বাদন করার উপযুক্ততা কি তা ব্যাখ্যা করেন—

"মাধুয্য নিগূঢ় তত্ত্ব অতি গুপ্ততম ।
পুরুষের ব্যক্ত নহে মাধুর্য্যের ক্রম ।।
নারীভাব হইয়া ভজয়ে যে পাত্র ।
মাধুর্য রসের বেত্তা সেই হই মাত্র" ।।[২]

অর্থাৎ শিব মাধুর্য লীলা বর্ণনায় সক্ষম নহেন। তাই তিনি অগস্ত্যকে সরযূতীরে হনুমানের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হনুমান সরযূতীরে অশোক কাননে সখীগণ সহ সীতা রামের রামলীলা বর্ণনা করে অগস্ত্যকে শোনালেন। এই অংশটিতে তুলসীদাসের রামায়ণের মত শিব ও হনুমানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। কখনো শিব কখনো বা হনুমান বক্তা। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ভক্তি রসাশ্রয়ী রামায়ণকাব্য মাত্রেই তুলসীদাসী রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত।

শঙ্কর কবিচন্দ্র ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা জয় রঘুনাথের আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। তিনি তাঁর রামায়ণ কাব্যকে কখনো রামলীলা কখনো রামমঙ্গল নামে অভিহিত করেছেন—

"শ্রীরাম মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়
এতদূরে সীতাহরণ পালা হৈল সায় ।[৩]

আবার অন্যত্র বলেছেন—

"সীতার বুঝিয়া মন প্রভু দিল সায় ।
রামলীলা রামায়ণ কবি চন্দ্র গায় ।।[৪]

১, ২। ৩৯৬২ নং পুঁথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। ৫৭ নং পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (অরণ্যকাণ্ড)
৪। ৪০ নং পুঁথি (অযোধ্যা কাণ্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁর রামায়ণ পাঁচালী রচনার সময় প্রধানতঃ কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করলেও অধ্যাত্ম রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ এবং প্রচলিত বহু লোক-গাথা, লোক কাহিনী থেকেও বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও কবির স্বকপোলকল্পিত বহু কাহিনীও তাঁর রামায়ণ কাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। এক সময়ে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করায় শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণকে বিষ্ণুপুরী রামায়ণও বলা হয়।

শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ পালার মধ্যে সীতাহরণ, অঙ্গদ রায়বার, কুম্ভকর্ণের রায়বার শিবরামের যুদ্ধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি পালাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর রামায়ণ অপেক্ষা রামায়ণের পালাগানগুলিই যে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তার প্রমাণ এই পালাগুলিই অধিক সংখ্যক পাওয়া গেছে। অথচ সেই তুলনায় তাঁর সম্পূর্ণ রামায়ণ আজ অনাবিস্কৃত। আবার পালাগান-গুলির মধ্যে অঙ্গদের রায়বার পালাটি সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণের মধ্যে মাত্র অযোধ্যা কাণ্ড এবং লঙ্কা কাণ্ড পাওয়া গেছে। কবির রচনা যেমন সরল তেমন বাস্তব রসে সমুজ্জ্বল। অযোধ্যা কাণ্ডে কোপন স্বভাবা কৈকেয়ীর ভূমিকা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ বটে, কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্রের কৈকেয়ী চরিত্র নিষ্ঠুরতার শেষ সীমাও অতিক্রম করেছে। পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ এবং সীতাকেও নিরাভরণ করে বল্কল পরিয়ে বনে পাঠিয়েছেন—

কৈ কৈ পাপীনি দুষ্ট শ্রীরামের কয়।
চির বসন পর্য্যা বন জাত্যে হয়॥
বসন ভূষণ তেজ শুনরে লক্ষ্মণ।
রামের মত সজ্জা কর তবে জাহ বন॥ [১]
কৈকৈ বলেন সিতা শুনহ জুগতি।
রামের সমান বেশ কর সিঘ্রগতি॥
তেজহ পাটের শাড়ী পরহ বাকল।
এতেক শুনিঞা কান্দেন ভকত বৎসল॥[২]

১, ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪০ সংখ্যাক পুঁথি (অযোধ্যা কাণ্ড)।

শ্রীরামচন্দ্রের বন গমনের সময় রাজনন্দিনী, রাজবধূ সীতা অযোধ্যার রাজপ্রসাদ তুচ্ছ জ্ঞান করে স্বামীর সঙ্গে বনগমনে উদ্যত হলেন। কৃত্তিবাস ও তাঁর অনুগামীরা রামের বনবাস বর্ণনার সময় সীতার বনগমন বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা কৃত্তিবাসের হুবহু অনুকরণ নহে। তা কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। স্বামীগত প্রাণা মুগ্ধস্বভাবা সীতা ভাবতেও পারেন না স্বামী ছাড়া হয়ে তিনি চৌদ্দ বছর অযোধ্যায় বাস করবেন—

জানকী কহেন প্রভু না ছাড়িহ মোরে।
তিক্ত কুটুক ফল তোমার ভক্ষন অবশেষ ॥
অমৃত সমান মোরে না হবেক ক্লেশ।
বাকল অজিন্ব মোর পটের বসন ॥
তৃনবৎ শয্যা মোরে পালঙেক শয়ন।
তোমা ছাড়া একদন্ড রহিতে নারিব।
চৌদ্দ বৎসর নাথ কি কর্যা গোঙাব ॥
সীতার বুঝিয়া মন রাম দিলা সায়...।[১]

রামসীতার বনবাস যাপনের সময় লক্ষ্মণ যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ছিলেন উত্তরকাণ্ডের আগে তা জানা যায় না। কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্র অরণ্য কাণ্ডেই তা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। রামসীতার কুটির দ্বারে ধনুর্বাণ হাতে লক্ষণ অতন্দ্র প্রহরী। এ সময়ে তাঁর চোখে নিদ্রা আবির্ভাব হলে তিনি চৌদ্দ বৎসর তাঁর চোখে না আসার জন্য নিদ্রাকে অনুরোধ জানান—

"নিদ্রার ঠাঁই লক্ষ্মণ বীর মাগিছেন বর।
নিদ্রা না ধরিবে মোরে এ চৌদ্দ বৎসর ॥[২]

হনুমান সীতার সন্ধানে যাওয়ার পূর্বে তার মাতার অনুমতি গ্রহণ করতে যাওয়ার ঘটনা অন্য কোন রামায়ণে পাওয়া যায় না। এই অংশটি কবির নিজস্ব রচনা।

১। ৪০ নং পুঁথি, অযোধ্যাকাণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। ৫৭ নং পুঁথি, অরণ্যকাণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বনেতে করিছেন বাস শ্রীরাম লক্ষ্মণে ।।
তার সীতা হরি নিল লঙ্কার রাবণে ।
আমারে পাঠাতে চাই ঊশিবস কারনে ।।
বিদায় হইতে আনু তোমার চরণে ..।[১]

শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের মূর্ছা ভাঙ্গানোর জন্য হনুমাণ গন্ধমাদণ পর্বত শৃঙ্গ উপড়ে নিয়ে আসার সময় পথে ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনা কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে। শঙ্কর কবিচন্দ্র কৃত্তিবাস থেকে এই মূল কাহিনী টুকু গ্রহণ করলেও স্বীয় অসাধারণ কল্পনা বলে তিনি এই ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিবেশন করেছেন। ভরতের বাঁটুলে আহত হনুমানের কাছ থেকে রামলক্ষ্মণের সংবাদ শোণার পর ভরত হনুমানকে গন্ধমাদন পর্বত সহ শতেক যোজন উপরে তুলে দিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র রামের কাছে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর পর কাহিনী আর অগ্রসর হয়নি। কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণে এই কাহিনীটি আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ভরত কৌশল্যা ও সুমিত্রা জননীকে রামলক্ষ্মণের সংবাদ দেওয়ার জন্য অযোধ্যা থেকে তাঁদের নন্দীগ্রামে নিয়ে এসে হনুমানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভরতের বাঁটুলে আহত চলৎশক্তি রহিত হনুর রামজননীর কাছে সানুনয় প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁর চরণযুগল হনুর মস্তকোপরি স্থাপন করেন।

"এতক্ষনে হনু বলে হের আল্য মা।
উঠ্যা জায়ে নারি, মোর সিরে দেখো পা ।।
আমা হেন ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে।
তোমাদের পদ আমি দেখিলাঞ নঞানে"।।[২]

হনুমানের মুখে সীতাহরণ সংবাদ শুনে কৌশল্য বিলাপ করতে লাগলেন। লক্ষ্মণের শোক যে রামচন্দ্র সহ্য করতে পারবেন না একথা তিনি ভাল করেই জানেন—

১। ৫৭ নং পুঁথি, অরণ্যকাণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। ১৮৩ নং পুঁথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

"হায় মরিল মরিল মোর বাছারে লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরাম মরিবেন মোর লক্ষ্মণের সোকে।
এতদিনে বিধাতা বঞ্চিত হইল মোরে"॥[১]

লক্ষ্মণের মৃত্যু সংবাদে সুমিত্রার বিলাপের মধ্যে পুত্রশোকতুরা জননীর বেদনা অপেক্ষা রামভক্তিবাদ সমধিক প্রকাশ পেয়েছে।

সোক মোহ নাহি মোর লক্ষ্মণের তরে ॥
রামের নাম লইঞা আমি স্বর্গ বাসী হব।
রাম জিয়া থাকিলে লক্ষ্মণ কত পাব ॥
সুমিত্রার ভাব দেখ্যা হনুর বিস্ময়।
মা হইয়্যা কে এমন কবি চন্দ্র কয়"॥[২]

কেবল হনু নহে, হনুর সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রার ভাব দেখে পাঠকও বিস্মিত হন। সুমিত্রা যেন রক্ত মাংসের গড়া মানবী নহেন—কল্পলোকের কোন এক দেবী প্রতিমা তিনি। একমাত্র উদয় সিংহের ধাত্রীমাতা রাজপুত নারী পান্নার সঙ্গে লক্ষ্মণ জননী সুমিত্রার তুলনা চলে। কেবল সাহিত্যে নয়—পৃথিবীতেও এরকম নারী চরিত্র দুর্লভ। এভাবে শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁর রামায়ণে বহু নূতন নূতন কাহিনী সংযোজন করে গল্প প্রিয় বাঙ্গালী পাঠকের গল্প রস পিপাসা চরিতার্থ করেছেন।

১, ২। ১৮৩ নং পুঁথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা দেশে রামায়ণের লোকায়ত ধারা

বাংলার লোকসাহিত্য বাঙ্গালীর প্রাচীনতম সাহিত্য। বাংলার পূজা-পার্বণে, বিবাহে, পালাগানে, রাখালের গোচারণ মাঠে মাঝিদের ভাটিয়ালী সুরে, বাংলার কৃষকের কণ্ঠে কণ্ঠে বাঙ্গালীর লোকসঙ্গীত বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে আছে। লোকসঙ্গীতই বাঙ্গালীর প্রাচীনতম সঙ্গীত। বাঙ্গালীর প্রাণের কথা অন্তরের ভাষা আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলার লোক সঙ্গীতে। বাংলার পল্লীজীবনের কত বিচিত্র সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা ও হাসি-কান্নার পরিচয় রয়েছে এই লোক সঙ্গীতে। লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে হরপার্বতী ও রামসীতার কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। রামায়ণে কাহিনীগুলির মধ্যে আছে রায়বার কাব্য সমূহ, রাসযাত্রা, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, সীতার বারমাস. সীতার পাতাল প্রবেশ। কৌশল্যার চৌতিশা প্রভৃতি পালা গান লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। মুদ্রিত কাব্যগুলি ছাড়াও রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে বহু সঙ্গীত, যাত্রাগান, পালাগান রচিত হয়েছিল যা কথক ঠাকুরের কণ্ঠে-কণ্ঠে ও গায়েনদের মুখে মুখে বাংলার পল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, যার অনুলিপি বা সম্পূর্ণ মুদ্রিত রূপ আজও পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া রামায়ণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে কত পূজা পার্বণ, ব্রত ও মেলা গড়ে উঠেছে—সৃষ্টি হয়েছে বহু প্রবাদ, প্রবচন ও ধাঁধা।

রামায়ণের রায়বার সমূহ বাংলা লোক সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এক শ্রেণীর গায়েন বা কবি রাজদ্বারে তাঁদের বংশাবলীর গুণকীর্তন করে শোনাত। এই গায়েনদের মধ্যে অনেকেই হাটেবাজারে, পূজাপার্বণে, মেলায় বা যে কোন জনসমাগম উপলক্ষ্যে গান গেয়ে সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করত। এইরূপ সাধারণ্যে গান করার সময় তারা রাজা, জমিদার বা সমাজের গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি ও বীরপুরুষদের গুণ কীর্তন করা

ছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর অংশবিশেষ গান করে শোনাত। তাদের মধ্যে অনেকে আবার বাজনা ও নৃত্য সহযোগে গান করত। আবার কেউ কেউ রামায়ণের কাহিনী গান করার সময় লাফ দিত বলে তাদের রামায়ণ গানকে 'ফাল রামায়ণ' বলে।[১] এসব গ্রাম্য কবিদের ভট্ট বা ভাট এবং এদের রচিত রামায়ণ গানকে ভট্ট রামায়ণও বলা হয়। ভাট কবিরা গান করার সময় রামায়ণের রায়বার অংশকেই সবিশেষ প্রাধান্য দিতেন। রামায়ণের রায়বার গুলিতে রাবণের সঙ্গে হনুমানের, অঙ্গদের, কুম্ভকর্ণের, সুর্পনখার, বিভীষণ প্রভৃতির কথোপকথন, উপদেশ ও গালাগালি বর্ণিত হয়েছে। রায়বার কাব্য-সমূহ সাধারণতঃ ব্যঙ্গাত্মক কাব্য। আবার অনেকে বাংলা ও হিন্দী মিশ্রিত ভাষায় রায়বার কাব্য রচনা করে সাধারণ লোকের নিকট কাব্যগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। রায়বার রচয়িতারা বোধ হয় বাংলা অপেক্ষা হিন্দী অধিকতর উপযুক্ত বলে মনে করতেন। রামায়ণের রায়বার গুলির মধ্যে কৃত্তিবাসের অঙ্গদরায়বার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য প্রায় সকল কবিই রায়বার রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃত্তিবাসকেই অনুসরণ করেছেন। আবার অনেকেই নিজের রচিত রায়বার কৃত্তিবাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

কৃত্তিবাসের রায়বারের সঙ্গে ফকির কবির রায়বার তুলনা করলে কৃত্তিবাসের দ্বারা যে তিনি কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে[২] ॥

১। ফাল—পূর্ববঙ্গে কোন কোন অঞ্চলে লাফ দেওয়ার পরিবর্তে ফাল শব্দ ব্যবহার করা হয়। চট্টগ্রামে 'ফালুয়া রামায়ণ' নামে একরকম রামায়ণ প্রচলিত আছে। গানের সময় গায়কেরা অঙ্গভঙ্গি করে ফাল বা লাফ দেয় বলে এই নামকরণ করা হয়েছে। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০১, পৃ. ১১৮)।

২। রামায়ণ, কৃত্তিবাস বিরচিত। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

এর সঙ্গে ফকির কবির রায়বার তুলনীয়।

ধন্য তেরে মাইকো সভা সঙ্গে এহাম রে।
এতেক পতি লেকে রতি সুখ ভুঞ্জে অবিরত রে ॥[১]

এভাবে ভাষার পার্থক্য ছাড়া ফকির রামের অঙ্গদরায়বার কৃত্তিবাসের রায়বারের হুবহু অনুকরণ।

ফকিররাম কবিভূষণ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একজন বিখ্যাত কবি শংকর কবিচন্দ্র কৃত্তিবাসের অনুকরণে অঙ্গদ রায়বার রচনা করেছেন। শংকর কবিচন্দ্রের রচিত রায়বার পালার সঙ্গে কৃত্তিবাসের তুলনা করলে উভয় কবির মধ্যে ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য সহজেই বোধগম্য হবে।

কৃত্তিবাসের রায়বারে আছে—

ভাবিয়াছে কি গুহক চণ্ডালের মিতা।
বনের বানর দিয়া উদ্ধারিবে সীতা ॥
রামের যোগ্যতা যত দেখিবারে পাই।
নৈলে কেন তারে দূর করে দেয় ভাই ॥

  

খদ্যোত উদয়ে যদি হয় চন্দ্রপাত।
সীতারে নারিবে নিতে কভু রঘুনাথ ॥[২]

আর শংকর কবিচন্দ্রের পালায় পাওয়া যায়—

মনে মনে পন কর্যাছে গোহক, চন্ডালের মিতা।
বনের বানর সহায় কর্যা উদ্ধারিবে সীতা ॥
তোর রামের পৌরস সব দেখতে পাই।
নইলে কেন দেশ হতে খেদ্যা দিলেক ভাই ॥

  

চন্দ্রপাত হয় জদি উদয়ে খদ্যোতে।
তথাপি সীতারে কভু নারিবে নিতে রঘুনাথে ॥[৩]

অঙ্গদের রায়বার ছাড়াও শংকর কবিচন্দ্রের নামে কুম্ভকর্ণের রায়বার, রামের বনবাস, সীতাহরণ পালা লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি রায়বার ও পালাগান পাওয়া গেছে।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, পৃঃ ৬৯।
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫-৫৬।
৩। পুঁথি সংখ্যা ৬৮৭, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুই কবির মধ্যে কালের ব্যবধানের দিক দিয়ে শংকর কবি চন্দ্রই কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু কোন কোন সমালোচক মনে করেন কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন সংস্করণে রায়বার অংশটি ছিলনা। উহা পরবর্তী সংযোজনা। শঙ্কর কবিচন্দ্র ও অন্যান্য গ্রাম্য কবিদের পালা থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণে রায়বার অংশ অনুপ্রবেশ করেছে।[১] কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রিত প্রাচীন সংস্করণগুলিতে কোথাও রায়বার বর্জিত দেখা যায়না। সুতরাং রায়বার পালার আদিকবি হিসাবে কৃত্তিবাস কবিকেই স্বীকৃতি দিতে হয়।

খোসাল শর্ম্মার রায়বার সম্পূর্ণ হিন্দী ভাষায় রচিত এজন্য উহাকে খোট্টা রাবারও বলা হয়! কবির নাম ও কাব্যের ভাষা দেখে মনে হয় তিনি বিহার অঞ্চলের লোক ছিলেন। ভাষা যাই হোক না কেন তাঁর কাব্য ভাট বা ভট কাব্যের মত নৃত্য বাদ্য সহকারে গান করার উপযুক্ত করে রচিত হয়েছে।

লঙ্কা মোঙ্ক	দেঙ্কে অঙ্গদ	পালট ফিরকে আয়ে।
মগন হোকে	নাচে অঙ্গদ	রামকা দরশন পায়ে॥
বীরাসনমে বৈঠে	বৈঠে প্রভুজী	সাম্নে গাণ্ডীবাণ।
দক্ষিন তরফমে	ভাই লছমন	বামে জাম্ববাণ॥
সুগ্রীব বিভীষণ	দোনে সামনে	আউর পবনকাসুত।
হনুমানকে	নাম শুনকে	ভাগে যমদুত॥
সমুদ্রকা	তীরে অঙ্গদ	হাত পাঙু পাখালি।
রামকো	প্রদক্ষিন করকে	নিয়ে চরণ ধুলি॥
লঙ্কেশ্বরকা	শিরকা মকুট	রামকো সামনে রাখা
লঙ্কেককা	জো কুছ হকিকত	রামকো দিয়া লেখা॥
রঘুবীর	গভীর দেখো	শুনকে হয়ে হাস।
ভকতকে গত	মুকত রাগ	পুয়ায় মনকা আশ॥
ভনয়ে	খোসাল শর্ম্মা	আপকে জনুদার।
অধমকে প্রভু	কদম হুকুম হোয়ে	দরিয়া উতরে পার॥[১]

১। বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড মনীন্দ্রমোহন বসু, পৃঃ ১৪৯।

১। পুথি সংখ্যা—২৬৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রামনারায়ণের রায়বার

রামনারায়ণের রামায়ণের চারটি অংশ। প্রথমতঃ সূর্পনখার কাহিনী, দ্বিতীয় অংশে অঙ্গদরায়বার, তৃতীয় অংশটিতে রামরাবণের যুদ্ধ, চতুর্থ অংটিতে বিভীষণের সঙ্গে রাবণের বাগবিতণ্ডা ও বিভীষণের রামের পক্ষে যোগদানের কাহিনীটি বাংলা ভাষায় রচিত কিন্তু রায়বার অংশগুলি সাধারণ লোকের নিকট জনপ্রিয় করার জন্য হিন্দী ভাষায় রচিত হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহ শালায় রামনারায়ণের অঙ্গদের রায়বার ও বিভীষণের রায়বারের পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। অঙ্গদের রায়বারে অঙ্গদ ও রাবণের উক্তি প্রত্যুক্তি বর্ণিত হয়েছে।

অঙ্গদের উক্তি—

অরে রামকি নাম অকাম উদ্ধারণ,
শুনরে নঙকা অধিকারী
তেরে বুদ্ধি না শুদ্ধি বিরুদ্ধি নামাণত
জানকী আনকি নারী॥

রাবণের উক্তি—

অরে দূত কুপুতে ভজ তুহু বালিকো।
গালি কিও নাহি জান
জো নর তাত নিপাত কিত্র
তেরে সো নরকো শুন নাথকি চান।[১]

বিভীষণের রায়বারেরও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বিভীষণের উক্তি—প্রত্যুক্তি

বিচ্ছিন্ন যাওনে কহে হাত জোরি।
শুন নাথ মোর বাত লঙ্কাধিকারী॥
রঘুবীর জলধির তীর লেকে বয়ঠে[২]

 

১, ২। পুঁথি সংখ্যা—২২৫১, ২২৬০, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

রামায়ণ কাহিনী ছাড়াও কবি হরপার্ব্বতী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু কাব্য রচনা করে ছিলেন।

দ্বিজতুলসী

বাংলাসাহিত্যে রায়বার রচয়িতারা কেবল ব্যঙ্গ-কৌতুকাবহ হাল্কা বিষয়ে রায়বার রচনা করেন নাই। অনেকসময় তাঁরা রায়বার গুলিকে গুরুগম্ভীর করেও পরিবেশন করেছেন। এই ধরনের রায়বার রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজ তুলসীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রায়বার হরপার্বতীর কথাচ্ছলে অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুকরণে রচিত হয়েছে। কবি তাঁর রায়বারটির সঙ্গে অধ্যাত্ম রামায়ণের অংশ বিশেষ জুড়ে দিয়ে শ্রোতৃবর্গের রুচি পাল্টে দিয়েছেন - রায়বারটির আরম্ভ—

পার্বতী বলেন প্রভু কহ শূলপাণি।
তারপর কি করিলা রাম রঘুমণি॥
লঙ্কার দুয়ারে যদি গেলা কপিগণ।
কহ কি করিলা তবে রাজা দশানন॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ শূলপাণি।
অমৃত অধিক প্রভু তব মুখে শুনি॥
হর কহে পার্ব্বতী শুনহ সাবধানে।
লঙ্কাপুরে উপনীত হইল কপিগণে॥[১]

মতিরামের কুম্ভকর্ণের পালা

কবির পুরো নাম মতিরাম কর। বৈষ্ণবোচিত বিনয় বশতঃ তিনি নিজেকে মতিরাম দাস নামে পরিচয় দিয়েছেন—

মতিরাম দাস কর কহে।
কুম্ভখানে হোগা তোম্মারে।[২]

মতিরামের কুম্ভকর্ণের পালাটি বীর রসাত্মক কাব্য। হিন্দী ভাষার রচিত পালাটিতে রাবণ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের বীরত্ব অপেক্ষা বীরত্বের আস্ফালন অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে। নিদ্রাভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণের রাবনের প্রতি সান্ত্বনা বাক্যই পালাটির প্রতিপাদ্য বিষয়—

১। সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, পৃঃ ৭০।

২। পুঁথি সংখ্যা ২৭৩৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কুম্ভকর্ণ বোলে কহো মোরে আজি।
কোন বীর আয়া বধেঙ্গে সীতারি ।।
যদি ইন্দ্র আওগে আভি আউ সর্গে।
ফনী যদি আউগে বধে নাগবর্গে ।।[১]

দ্বিজরাম

হনুমানের লঙ্কা দাহনের পর রাবন রাজ। সভায় বসে তার পারিষদ-বর্গের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। এসময় বিভীষণ এসে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাবণকে অনুরোধ করল। মদমত্ত রাবণ তার কথায় কর্ণপাত ত করলইনা অধিকন্তু বিভীষণকে পদঘাতে দূর করে দিল। দ্বিজরাম রাবণ ও বিভীষণের উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে এই ঘটনাই বর্ণনা করেছেন।

বিভীষণের উক্তি—

যে দিবস গিয়া সীতা আনিলে পঞ্চবটে।
তদবধি লঙ্কায় যে অমঙ্গল ঘটে
প্রচণ্ড বাতাস বহে লঙকাপুরী লৈয়া।
রাত্রিদিন ডাকে শিবা মুখামুখি হৈয়া ।।

রাবণের উক্তি—

রাবণ বলে যে বলিছ মিথ্যা কভু নয়।
বানরে রাক্ষস মারে কোন শাস্ত্রে কয় ।।
রামের সহিত কুক্ষা করি সীতা আনিলাঙ যেন।
বানরে কি দোষ করিলাঙ ঘর পোড়ালোক কেন ।।[২]

এইভাবে উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে বিভীষণের কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে রাবণ তাকে পদাঘাত করে। অপমানিত বিভীষণ তারপর রামচন্দ্রের শরনাপন্ন হল। পালাটির মধ্যে কবির নিজের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। একান্ত সহজ ও গতানুগতিক রচনা। উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত বলে গায়েনদের পক্ষে গান করা সুবিধা হত।

সূর্পনখার রারবার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহ শালায় সূর্পনখার রায়বার নামে একটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে। ভণিতা নাই। কাজেই লেখকের

১, ২। পুথি সংখ্যা ২৭৩৬, ২৭০, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

নামও অজ্ঞাত। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ পঞ্চবটী বনে বাস করার সময় রাবণের ভগিনী রাক্ষসী সূর্পনখা রামচন্দ্রের রূপে মোহিত হয়ে মায়াবী মূর্ত্তি ধারন করে রামচন্দ্রের নিকট আপন প্রণয় জ্ঞাপন করল—

মোর বাসনা গেছে বসিতে কাছে হইব তোমার নারি॥
চান্দমুখ খানি এদিন রজনী দেখিব নয়ান ভরি॥ ১

রচনার পারিপাট্য দেখে মনে হয় কোন বৈষ্ণব কবি শ্রীরাধার রূপ বর্ণনার অনুকরনে সূর্পনখার মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কন করেছেন। এর সঙ্গে তুলনীয়—

বিসুরি গেহ নিজহু দেহ
এব নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর এক
এক কুণ্ডল দোলনী।
শিথিল ছন্দ নীবিবন্দ
বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী॥২

কাশীনাথের কালনেমির রায়বার

রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে সুষেনের অনুরোধে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত থেকে ঔষধি আনতে যায়। রাবণ হনুমানকে যাত্রাপথে দেখে তাকে বধ করার জন্য কালনেমির ছদ্মবেশে গন্ধমাদন পর্বতে পাঠিয়ে দেয়। এই ঘটনাটি অবলম্বন করে রাবণ ও কালনেমির উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাশীনাথের কালনেমির রায়বার রচিত হয়েছে।

১। পুথি সংখ্যা ৩৪৮১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য—অধ্যাপক শঙ্কর প্রসাদ বসু, ১৩৬২, পৃঃ ৯৮।

হনুমান বলবান গন্ধমাদন যায়।
লঙ্কাপথে শূন্যপথে রাবণ দেখিতে পায়॥
বলে ঘর পোড়াটাত দেখি বিপরীত কি করি উপায়।
তখন ত্রাস পেঞা রাবণ ভেঞা কালনিমে ডাকে॥
বলে ভাই এধারে আস্য কাছে বস্য আমার কেবল তুমি।
তোমার তরে রাখ্যাছি ঘরে দেবকন্যা আমি॥[১]

পুঁথিটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। রচনা সরস ও কৌতুকাবহ, মনে হয় পালাটিতে কবি হনুমানের কুম্ভিরিণীকে বধ করে ঔষধিসহ রামচন্দ্রের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কবির জবানীতে জানা যায় তাঁর বাস ছিল বাঁকুড়া জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

হনুমানের রায়বার

হনুমানের রায়বার পালাটির কবির নাম অজ্ঞাত। পালাটিতে শ্রীরামচন্দ্রের সাগর বন্ধনের সময় হনুমানকে দেখে সাগর কতখানি ভয় পেয়েছিল এবং কিভাবে হনুমানের হাতে আত্মসমর্পণ করে বন্ধন স্বীকার করেছিল তা বিবৃত হয়েছে। প্রথমে শ্রীরামের অনুরোধে সাগর বন্ধন গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। পরে হনুমানের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে বন্ধন স্বীকার করেছে—

হনুকে দেখিয়া সাগরের ভয় হইল মনে।
জোড় হাত করি কহে হনুমানের স্থানে॥
সাগর বলেন সুন পবন নন্দন।
রামের কার্য্য কর মোরে করিয়া বন্ধন॥[২]

বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস কারও রামায়ণে হনমানের ভয়ে সাগরের বন্ধন স্বীকারের কাহিনী পাওয়া যায়না। রামায়ণের চিরাচরিত ঘটনাগুলি বাদ দিয়ে পল্লী কবি লোকানুরঞ্জনের জন্য প্রচলিত লৌকিক কাহিনীগুলিকেই তাঁর পালা গানে রূপ দান করেছেন।

বারমাসিয়া

বাংলার পল্লী কবিরা রায়বার অংশগুলি রচনা করে যেমন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। তেমনই রামের বনগমন, সীতার বনবাস,

---

১। পুথি সংখ্যা ৫২, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৯।
২। পুথি সংখ্যা—১৯৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ও কৌশল্যার চৌতিশা প্রভৃতি রচনা করে বাংলা লোক সাহিত্যে করুণ রসের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। অভিষেকোন মুখ রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্রের ও রাজবধূ সীতার বনবাসের পালাশুনে আজও পল্লীবাসীর অন্তর বেদনায় আদ্র হয়ে উঠে। এই পালাগানগুলি নৃত্যবাদ্য সহকারে গান করার জন্য গীত ও ছড়ার ছন্দে রচিত হত এবং অধিকাংশস্থলে কবিরা তাঁদের কাব্যের রচনাকাল ও আত্মপরিচয় গোপন করে গেছেন। অথচ এদের রচিত গাথা গুলি আজও সুদূর পল্লী বাসীর সাহিত্য রসপিপাসা চরিতার্থ করে আসছে।

(১) রামচন্দ্রের বার মাস

জেবা পড়ে জেবা শুনে শ্রীরামের বারমাস।
পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠ বিলাস'' ॥
হিনছিদক আলি কহে সবার গোচর।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবা সত্বর ॥[১]

বারমাসিয়াগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল রামায়ণের এক একটি খণ্ডাংশ মাত্র অবলম্বন করে বাংলার পল্লীকবিরা পালাগানগুলি রচনা করেছেন। অনেকসময় পালাগানগুলিতে রামায়ণ বহির্ভূত প্রচলিত বহু লৌকিক কাহিনী অনুপ্রবেশ করত। গায়েনেরা গান করার সময় পাঠকদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী পালাগুলির পরিবর্তন সাধন করতেন। কৃত্তিবাস ও অন্যান্য কবিরা রামের বনগমনের যে সময় নির্দ্দেশ করেছেন পল্লী কবির রচনায় তার সঙ্গে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের অভিষেকের আয়োজন হয়েছিল চৈত্রমাস বসন্ত কালে।[২] অভিষেকের পরিবর্তে রামচন্দ্র সেই চৈত্র মাসেই বনগমণ করেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বারমাসে পদগুলিতে চৈত্র মাসের পরিবর্তে মাঘ মাসেই রামের বনবাস কল্পিত হয়েছে।

(২) রামচন্দ্রের বারমাস

মাঘে মারীচ আইল মায়া রূপ ধরি।
মরিতে রাবণ রাজা সীতা কৈল চুরি ॥

১। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২।
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৫।

ফাল্গুনে ফাফর চিত্ত সীতা অদর্শনে।
ফলিল প্রমাদ বড় জানকী রমণে ॥

* * *

পৌষে পীরিতি পাকে চলে বিভীষণ।
পরম পীরিত পাইল শ্রীরাম লক্ষণ ॥[১]

হিনাছিদক আলির মত জগতবল্লভের পালাগানেরও রাবণ রাজা সীতাকে হরণ করল মাঘ মাসে। ফাল্গুনে রামচন্দ্র সীতার শোকে করুণ সুরে বিলাপ করেন। পৌষ মাসে রামচন্দ্রের সঙ্গে বিভীষণের হল মিত্রতা।

আর একটি বার মাসিয়ায় রামের বনবাস ও সীতাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি নিজের নাম ধাম প্রকাশ করেছেন—

রাম চলিয়াছে বন বাসে সীতারে কুণ্ডল দিয়া।
ভিক্ষাছলে রাবণ আসি নিল সীতা হরিয়া ॥
শুন শুন গুণিগণ মোহাম্মদ নাছিম মোর নাম।
গুন চশায় বাপের বাড়ী আছিল বাণী গ্রাম ॥[২]

রামচন্দ্রের দশমাস নামক একটি বারমাসিয়ায় সীতার শোকে রামচন্দ্রের বিলাপ, সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা, বালি বধ, সীতা উদ্ধার সর্বশেষে বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করার পর লক্ষণ ও সীতাসহ শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। রচনায় 'তান', 'সন্ন', 'পুন্ন' প্রভৃতি লৌকিক শব্দের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন—

বালিবধি রাজ্য তানে দিল সমর্পিয়া।
সুগ্রিব সংগতি রাম যুক্তি করি সায় ॥
সেইমনে দেখা পইল পোবন কুমার।

* * *

কার্তিক মাসেতে রাম যুদ্ধ অবসেস্‌।
বিভিসন রাজা কৈল লঙ্‌কাতে বিসেস ॥
সিতা পরিমিতে রাম লক্ষণেরে বোলে।
যুদ্ধ করি সিতা লৈয়া দেশে সব চলে ॥
একে একে রথ লৈয়া জেন বাউর গতি।
সসন্নে রামচন্দ্রে বোলে চল সিগ্রগতি ॥
বালক সকল পথে করে হুরাহুরি।
দিনে য়ন্ধকার হইল চণ্ডালের পুরি ॥
জেবা গাত্র জেবা সুনে শ্রীরামের দসমাস
পাপ ছাড়ে পুন্নে বারে বৈকুণ্ঠ নিবাস ॥[১]

কৌশল্যার চৌতিশা

রামের বনবাস, রামের বারমাস, কৌশল্যার চৌতিশা প্রভৃতি পালাগানে পল্লীকবি রামচন্দ্রের মর্মান্তিক দুঃখ বর্ণনার সঙ্গে সগে জননী কৌশল্যার মাতৃ হৃদয়ের চিরন্তন আর্তিও প্রকাশ করেছেন—

হাহা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিব মায়ে এ চাঁদ বদন ॥
মাঘমাসে পুত্র গেলা বনবাসে।
পুত্রের লাগিয়া মাত্র হড় দুঃখ পাত্র ॥
দিনে অভাগী মায়ের পাঞ্জর শুকাত্র।[২]

এর সঙ্গে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে শচীমায়ের করুণ বিলাপ তুলনীয়—

নিমাই গিয়েছে ছাড়ি শোকেতে রয়েছি পড়ি
ভালমন্দ না জানিনু তার।
ধাতা দিয়াছিল কোলে বিধাতা হরিয়া নিলে
হেন হীন করম আমার ॥[৩]

১, ২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৯, পৃঃ ২০২, ২১।

৩। নিমাই সন্ন্যাস—শ্রীমধুসূদন জানা সম্পাদিত, ৫ম সংস্করণ, ১৩৩১, নীহার প্রেস, পৃ ২১।

রাম বনবাসের পালাগুলিতে পল্লীকবি পুত্র শোকাতুরা জননী কৌশল্যার মাতৃ-হৃদয়ের হাহাকার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নিরাভরণ জটাবল্কল ধারী রামচন্দ্রের বিদায়কালীন করুণ দৃশ্য ও বর্ণনা করেছেন—

খুরপা বান কে মারিল মোর বুকে।
খান খান হইলা বাণ রক্ত উঠে মুখে ॥
গলায় শোভিত রামের শুভ্র কণ্ঠ হার।
গহন কাননে রাম করিবেন বিহার [১]

'এখানে পল্লী কবি রামের বনবাসজনিত বেদনার সঙ্গে 'খুরপা বাণ' বা মন্ত্রগুপ্ত বাণের তুলনা করেছেন। এ বাণ যাকে নিক্ষেপ করা যায়, মুখে রক্ত উঠে তার মৃত্যু অবধারিত।

সীতার বারমাসীয়া

সীতার বনবাস, সীতার বারমাস, সীতার দশমাস, সীতা হরণ প্রভৃতি যাত্রা ও পালাগানে পল্লীকবি রাজকুল বধু সীতাকে শাশুড়ী ননদী তাড়িতা স্বামী পরিত্যক্তা পল্লী বধুতে পরিণত করেছেন। রাবণ গৃহে সীতার অসহ্য যাতনা ভোগ এবং রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা বনবাসের পালা শুনে আজও পল্লী বাসীর হৃদয় করুণ রসে আদ্র হয়ে উঠে। সর্বংসহা ধরিত্রী কন্যা সীতার অসাধারণ দুঃখ যাতনা ভোগের দৃষ্টান্ত দেখে সমাজ সংসারে লাঞ্ছিতা অপমানিতা পতি পরিত্যক্ত হতভাগিনী পল্লী রমণীরা তাঁদের দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রনা ভোগে কিছুটা সান্ত্বনা ও শক্তি লাভ করেন। একজন্য অনেকেই নিরপরাধিনী পতি পরিত্যক্তা রমনীদের বনবাসিনী সীতার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এভাবে রামায়ণ কাহিনী বাঙ্গালীর জীবন চর্য্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে।

রাবণ গৃহে বন্দিনী ও রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা গর্ভবতী সীতার বারমাস্যার পদগুলিতে বাংলার ঋতুপর্যায় একের পর এক দুঃখের পসরা সাজিয়ে দেখা দিয়েছে

(১) পৌষে প্রবল শীত বস্ত্র নাহি পাশ
শীতে তনু থর থর দন্তে দন্তে বাজে ॥

১। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ—শিবরতন মিত্র, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সংখ্যা—৪৩, পৃঃ ৩৯।

শীতেতে কাতর হইয়া বসি দুইজন।
মাঘে মকর যাত্রা কর্ম্মতি দুর্গতি
মৃগি খেদাড়ি গেলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সীতা হর্‌যা লইয়া রাখে অশোকের বনে ॥

❖ ❖ ❖

ফাল্গুনে দুগুন দুঃখ সীতার অন্তরে।
রঞা রঞা মনে পড়ে কৌশল্যা শাশুড়ী ॥
বারমাসে তেরপদ নেইত শুনিঞা।
বারমাসের দুঃখ সীতা কহে সখী পাশ ॥
হিমালয় পর্বতে আস্যা দারুণ বাতাস।
তিন দিঘে তিনজন অগ্নি কর্‌যা মাঝে ॥
কাষ্ট ভাঙ্গিয়া আনেন আপনে নারায়ণ।
সীতার কপালে লেখা সোনার মৃগিটী ॥
সীতা হর্‌যা লঞা গেল পাপীষ্ঠ রাবণ।
ছয়মাসে মধ্যে দেখা নাঞী পক্ষপক্ষীসনে ॥
রঞা রঞা মনে পড়ে অজধ্যা নগরি।
চঞ্চল হইল মন সহিতে না পারি ॥
এত দুঃখু পাল্যে সীতা বনবাসে জেঞা।
সীতার বারমাস্যা গান পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥[১]

এ দুঃদু বেদনা কেবন সীতার একার নহে—বাঙ্গালী পল্লীবধূর জীবনে শীতে নেই বস্ত্র গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে নেই ছাওয়া, আর বর্ষায় মাথার উপরে তাদের জোটেনা ছাউনি। এসব দারিদ্রেয় চরম দুঃখ কবি তাঁর চারদিকে যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনই কাব্যে রূপদান করেছেন। শুধু সীতায় কেন, ফুল্লরা বেহুলা, মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতির বারমাস্যাও নারীর জীবনে দুঃখ দুর্দশাও যাতনা ভোগেরই বাস্তব চিত্র। বস্তুঃ বাংলা সাহিত্যে রামায়ণী কথা কেবল অভিজাত জীবনের শিল্প প্রয়াস নহে—অভিজাত ও অনভিজাত উভয় জীবনধারা শিল্পায়ত হয়েছে বাংলা রামায়ণের লোকায়ত ধারায়।

১। পুঁথি পরিচয়—১ম খণ্ড, পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪২।

(২) সীতার দশমাস

বৈশাখ মাসেতে সীতা নানা পুষ্পময়।
রাম হৈছেন নরপতি সর্ব্বলোকে কয়॥
তাহাতে পাষণ্ড বিধি দৈবের লিখন।
ভরতেরে দিয়া রাজ্য রাম গেলেন বন॥
হাহা প্রভু রামচন্দ্র ত্রিভুবন সার।
এই মাস গেল বৈয়া না কৈলা উদ্ধার॥

❖ ❖ ❖

উদ্দারিয়া নিল সীতা রঘুর নন্দন।
সবংশে রাবণ রাজা করিয়া নিধন॥
রাবণ বধিয়া সীতা করিল মোচন।
ভগ্ন সেনা সেই রাজা হৈলা বিভীষণ॥
ভ্রাতৃসঙ্গে অযোধ্যাতে গেলেন রঘুমণি।
পাইলা পরম সুখ সীতা ঠাকুরাণী॥
দশমাসে দশ ধোযা লওরে গনিয়া।
শ্রীধর বানিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি।
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিল রঘুপতি॥[১]

বারমাসিয়া কেবল নায়িকার শ্বগতোক্তি নয়। এজন্য একজন শ্রোতা ও চায়। ফুল্লরার বারমাস্যার শ্রোতা সুন্দরী নারী রুপিনী দেবী চন্ডী, শ্রীরাধার বারমাস্যার শ্রোতা বড়াই বুড়ি ও রাধার সখীরা, সীতার বারমাস্যার শ্রোতা সীতার সখীরা। সখীদের অনুরোধে সীতা তাঁদের কাছে নিজের বারমাসিয়া বর্ণনা করেছেন—

(৩) সখি চারি পাঁচ মেলি সীতা চলিলা মন্দিরে।
এক সখি সীতাকে কহেন ধীরে ধীরে।
চৌদ্দ বৎসর ছিল সীতা রামের পাশে,
কত দুঃখ পেল সীতা কোন কোন মাসে।

১। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরন—মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫।

প্রথম চৈত্র মাসে রামের বনকে প্রবেশ,
শিরে জটা ধরেন রাম তপস্বীর বেশ।
ফলমূল ভক্ষণ বৃক্ষছাল পরিধান,
তৃণ শয্যা করি আমরা আছিলাম তিনজন।
বৈশাখে ভীষণ খরা জ্বলন্ত অনল,
পথে যাইতে পুড়ে উঠে পাওর পদতল।
জ্যৈষ্ঠে যতক দুঃখ পাইলাম অরণ্যে,
এত দুঃখ সহিতে নারি মণিষ্যের পরাণে
তরু ডাল ভাঙ্গি লক্ষ্মণ ধরিলেন শিরে,
তাহার ছায়াতে আমি যাই ধীরে ধীরে।[১]

(৪) অপর একটি পালায়ও সীতা তাঁর সখীদের কাছে বারমাসের দুঃখ বর্ণনা করেছেন—

সাত পাঁচ সখী মেলি গো জোড় মন্দির ঘরে
এক সখী কহে কথা গো জেজ্ঞাসে সীতারে ॥
তুমি যে গেছলা গো সীতা এই বনবাসে।
কোন কোন দুঃখ পাইছিলা গো কোন কোন মাসে ॥
আমার দুঃখের কথা গো কহিতে কাহিনী।
কহিতে কহিতে উঠে গো জ্বলন্ত আগুনী ॥
জনম দুঃখিনী সীতা গো দুঃখে গেল কাল।
রামের মত পতি পাইয়া গো দুঃখে গেল কাল ॥
এ কত দিনের কথা গো শুন সখীগণ।

  

বৈশাখ মাসের দিনরে অরণ্যে প্রবেশ।
শিরে জটা প্রভু রামের গো সন্ন্যাসীর বেশ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দিনরে রবির বড় জ্বালা।
হাটিয়া যাইতে প্রভুর গো বদন হইল কালা ॥

১। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ—শ্রী শিবরতন মিত্র, ২য় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সংখ্যা-৪৩, পৃঃ ৩১।

পাষানে ঠেকিল পদ গো রক্ত পড়ে ধারে।
দুঃখিত হইয়া প্রভু গো সীতার অঙ্গে বাতাস করে।
পদ্ম পত্রে জল আনেগো ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কতক্ষণে প্রভুর কোলে গো ছিলাম অচেতন ॥[১]

(৫) অপর একটি পালায়ও সীতার বারমাসের দুঃখ বর্ণিত হয়েছে—

প্রথম চৈত্রেতে কৈলা কাননে প্রবেশ।
শিরে জট্টা ধরেন রাম তপস্বীর বেশে।।
বৃক্ষছাল পরিধান জটাভার কেশ।
তৃণ শয্যা শয়নেতে সদা সহী ক্লেশ ॥
শুন সখী দুখের কাহিনী ...
কহিতে কহিতে উঠে জ্বলন্ত আগুনী ॥
বৈশাখে বিশন রৌদ্রে জ্বলন্ত আগুনী ॥
চলিতে না পারি পথে বিশণ পাষানী ॥
পাত্রতে পাশান কাটে রক্ত পড়ে ধারে।
কহিতে কহিতে উঠে জ্বলন্ত আগুনী[২]

এই তিনটি বামাসিয়াতেই কবিরা ভয়াবহ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা দিয়েছেন। এসময় প্রচণ্ড তপন-তাপে মাটি ফেটে চৌচির হয়। সে মাটিতে পা ফেলা যায়না। পায়ের তলা পুড়ে যায় এবং পা কেটে রক্ত পড়ে। এর সঙ্গে তুলনীয় ফুল্লরার বারমাস্যা—

বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥
পা পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিলে নাঞি আঁটে খুঞার বসন।
বৈশাখ হইল মোরে বিষ ॥

১। ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা— ডঃ শিবপ্রসাদ ভটাচার্য, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৬৬, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।
২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—পুঁথি সংখ্যা ১৯০৭।

মাংস না বিকায় সভে করে নিরামীষ।
খণ্ড খণ্ড হইল মোর খুঞার বসন ॥[১]

গর্ভবতী সীতার বারমাস্যার পালাগুলিতে নারী জীবনের চরম লাঞ্ছনার করুণ দৃশ্য ফুটে উঠেছে—

বৈশাখ মাসেতে সীতা গর্ভ পঞ্চমাস,
বিধাতা পাষণ্ড তাতে সুখে অভিলাষ।
তাহাতে পাষণ্ড হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
গর্ভবতী সীতাদেবী দিল নিয়া বন।
হা হা প্রভু রামচন্দ্র লক্ষ্মণ যুবরাজ,
বিনা দোষে আমাকে দিলা বনবাস।
চৈত্রে উদ্ধারিয়া আইলা অযোধ্যাভুবন,
উৎসবের সময় প্রভু পুণি দিলা বন।
গুনচন্দ্র সুতে কহে দেবচিন্তামণি,
সীতাদেবীর চরণে প্রণাম পুনি পুন ॥[২]

বিনা দোষে রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসিত করলেন। সীতার মতই হত-ভাগিনী পল্লী বধূরা বিনা দোষে, বিনা কারনে কঠিন শাস্তি ভোগ করেন। যখন তখন তাঁদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয়। বিনা অপরাধে বিনা কারনেই পুরুষ শাসিত সমাজে নারী নির্যাতীত হয়েছেন, অথচ সীতার মতই তাঁদের মুখে নেই কোন প্রতিবাদের ভাষা। কাহারও কাছে নেই কোন অভিযোগ।

হোলিআ বরমাসী

বাংলার পল্লী অঞ্চলে হোলিআ বারমাসী নামে এক শ্রেণীর পল্লী গীতি প্রচলিত আছে। এই পল্লীগীতি গুলিতে শিব-দুর্গা, রাধাশ্যাম প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রাম সীতার কাহিনীও গান করা হয়—

আদ্যমার্গ শির মাস হোইলা প্রবেশ।
পিতাসত্য পালি রাম গলে বনবাস।

১। চণ্ডীমঙ্গল—কবি কঙ্কন মুকুন্দ রাম বিরচিত, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদমি—১০৮২, পৃঃ ৬০।
২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৯।

শিশির সময় বস্ত্র ভূষণ নাহি,
বহুত কযণ বনে পাইলে বেনি ভাই।
কি পরি রহিবে রাম লক্ষণ যোগীন্দ্র,
কৌশল্যা কান্দইই হো ... ...।
পৌষমাসে হেম জাড় দেহ শুখি যাই,
কেমন্তে রহিবে বনে বেনি ভাই।
বৃক্ষমূলে আশ্রম করিবে তিনি জন,
বৃক্ষের বকল আনি হোইবে ভূষণ।
কি কষ্ট ন দেলু কৈকেয়ী মো রঙ্কিনীর ধন,
মাঘ মাসে শিশির মুঅই অধিক,
কেনে ছাড়ি গেল মোর রঙ্কিনীর ধনলোক।

এই বারমাসিয়াটির বক্তা রামসীতা বা কৌশল্যাদেবী নহেন। ভ্রাতৃভক্ত ভরতই এখানে বক্তা। ভরত রামের বনবাসের বিভিন্ন দুঃখ কষ্টের বর্ণনা দিয়ে বলছেন ভাই বিনা রাম কেমনে বনবাসে কাল কাটাবেন ?

রাবণের চৌত্রিশা

রাবণের চৌতিশা গুলিতে একদিকে যেমন দর্পহারী শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক মদমত্ত রাবণের শক্তির দম্ভ ও দর্পহরণ বর্ণিত হয়েছে অপরদিকে তেমনই ভক্ত রাবণের মৃত্যু কালীন করুণ বিলাপ শোনা যায়—

(১) কর অবধান রাবণ কর অবধান,
খল জাতি নিশাচর হরিলা গেয়ান।
গরবে হরিলা রামের সীতা রূপবতী।
(২) একবার দাঁড়াও হে রাম কমল আঁখি।
নয়ন ভরে তোমায় দেখি
পরমব্রহ্ম রূপেতে
একবার দাঁড়াও আমার সাক্ষাতে
অপরাধ করেছি বড়
জন্মেছিনু নিশাচর
(আমার) সে অপরাধ ক্ষমা কর
জীবনান্ত কালেতে
স্বর্গমর্ত্য পাতালপুরী
ত্রিভুবনের অধিকারী

১। ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা—ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। মর্ডাণ বুক এজেন্সি, ১৩৬৬, পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

আমি বাহুবলে হলাম জয়ী।
আমার সেই ক্ষমতা বল কৈ,
দেখ হে রাম বিপৎকালে।
এমন নাই যে ধরে তোলে,
(তোমার) শ্রীচরণ দাও বক্ষস্থলে।
আমি জন্মের মত বিদায় হই.[১]
ঘরে বসে আপনাকে বলায় অযোধ্যাপতি।
বটেন রামচন্দ্র যমের দোসর,
চাতুরী বুঝিবেন ওর বনের ভিতর।[২]

'ধনুক ভঞ্জন' ও রামচন্দ্রের বিবাহ প্রভৃতি পালাগানে পল্লীকবি জনক রাজার রাজসভা থেকে অযোধ্যায় দশরথের রাজসভায় উপঢৌকন পাঠানোর সময় দিব্য মালা প্রভৃতির সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বহুল প্রচলিত চাপাকলার কথাও বিস্মৃত হন নাই—

শ্রীবিশ্বামিত্র মুণি মিথিলা হইতে।
অযোধ্যা নগরে আইলা রঘুনাথে নিতে ॥
দিব্যমালা চাপার কলা লঞা রামের তরে।
উত্তরিলা গিয়া মুণি দশরথের ঘরে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
আজ্ঞা কর কোন কাজে এলে তপোধন ॥
মুণি বলে শুন রাজা আগমণ কাম।
জনক রাজা পাঠাইলা নিতে তোমার রাম।[৩]

১। হারামণি (৭ম খণ্ড) —মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ, ৭৮-৭৯।

২, ৩। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ—শ্রী শিবরতন মিত্র. ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী সংখ্যা ৪৩, পৃ, ৩৮।

পালাগান ও পাঁচালী গান রচয়িতাদের মধ্যে কৃত্তিবাসের পরেই দাশরথী রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা সরসতা ও স্বাভাবিকতার জন্য পল্লী বাংলার সুদূরতম কোণেও বহুল প্রচলিত ছিল। দাশরথীর এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ কেবলমাত্র প্রাকৃত ও আদিম রসের ছড়াছড়ি না করে তিনি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির ভক্তি মূলক কাহিনী তাঁর পাঁচালী গানে পরিবেশন করে শ্রোতাদের রুচি পাল্টে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পাঁচালী গান আবালবৃদ্ধবণিতা সকল শ্রেণীর গনমানসের যোগ্য হয়েছিল। দাশরথী রামায়ণের বিষয় নিয়ে দশটি পালা রচনা করেছেন, যেমন— (১) শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ, (২) শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতা হরণ, (৩) সীতা অন্বেষণ, (৪) তরনী সেন বধ, (৫) মায়া সীতা বধ, (৬) লক্ষ্মণের শক্তিশেল. (৭) মহীরাবণ বধ, (৮) রাবণ বধ, (৯) রামচন্দ্রের দেশাগমণ, (১০) লবকুশের যুদ্ধ।

শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ পালায় দাশরথী রায় চিরাচরিত রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে বহু নতুন নতুন লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণ করে পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশ্বামিত্র মুনি রামলক্ষণকে নিতে এলে দশরথ প্রথমে রামলক্ষ্মণের পরিবর্তে ভরত ও শত্রুঘ্নকে দিলেন। পরে বিশ্বমিত্রের ক্রোধ উপশমের জন্য কৈফিয়ত দিলেন যে রাম লক্ষ্মণেব এখনো অস্ত্রশিক্ষা হয়নি। অস্ত্রশিক্ষা ব্যতীত রামলক্ষ্মণকে নিয়ে মুনি কি করবেন? কিন্তু দৈবের এমনই বিড়ম্বনা যে কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাণী ঠিক সেই সময়ে রাম-লক্ষ্মণকে রণ সাজে সাজিয়ে মুনির সামনে পাঠিয়ে দিলেন।

এই পালাটিতে তিনি আরও কয়েকটি ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গের সময় দশহাজার মল্ল হরধনু বয়ে নিয়ে আসতে দেখে সমবেত রাজন্যবর্গের চক্ষুস্থির। রাবণ যাকে তুলতে না পেরে অধোমুখে পালিয়ে গেল তাঁরা কোন সাহসে সেই ধনুকের নিকট অগ্রসর হবেন। রাজন্য বর্গের এই দশা দেখে শতানন্দ তাঁদের নির্বীজ রাজশিশু বলে ব্যঙ্গ করেছেন।

শতানন্দের এই ধীক্কারে সভাস্থ রাজন্যবর্গ নীরব কিন্তু বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ এর তীব্র প্রতিবাদ জানাল—

"ক্রোধে উঠে লক্ষ্মণ কন কথা, বলোনা মুনি এমন কথা
বীর শূন্য আছে কোথা থাকতে রঘুবীর মহীতলে[১] ।"

বালক লক্ষ্মণের সাহস দেখে সকলে তাকে জ্যাঠা ছেলে বলে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে—

শুনে হেসে সভাশুদ্ধ বলে থামরে থাম জেঠা ছেলে ।
বসেছিলি থাকগে বসে দেখে শুনে গিয়েছি বসে ।।
কাজ নাই আর এত বসে, যায় রাবণ পরাজয় ।
শুনে লক্ষ্মণ ক্রোধে বলে, বল আছে যার সেই ত বলে ।।
অমন রাজার মাকে ডান বলে, ঘরে বসে অনেকে ।
এলি করে বেড়ে ফাঁক ধনুক দেখে নকলে ফাঁক[২] ।।"

তারপর রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গের সময় ভয়ে ধনু শিবের নিকট আশ্রয় চাইল, শিব মাথা নেড়ে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলেন। ধনু ভঙ্গ হল। পার্বতী শিবের মাথা নাড়ার কারণ জানতে চাইলে শিব বললেন যে সিদ্ধির ঝোঁকে মাথা নড়ে উঠেছে।

"ধনু ভাঙ্গতে করে 'মিড় মিড়' রাখহে রাখহে মুড় ।
পরিত্রাহি শুনে মুড় নাড়িছেন মাথা"
দেখে হেসে কন পার্বতী, অকস্মাৎ পশুপতি,
বসে বসে নাড়িছ কেন মাথা ।।
শিব কন করি জোর পানি, কিছু নয় কন শূলপাণি ।
সিদ্ধির ঝোঁকে মাথা নড়ে উঠিছে ।[৩]

শব্দ কুশলী দাশরথী রায় ধনুভাঙ্গার মিড় মিড় শব্দটিও তাঁর পাঁচালী গানে তুলে ধরেছেন।

জনক রাজার রাজসভা থেকে দূত অযোধ্যায় দশরথকে নিতে আসার সময় কুল পুরোহিত বশিষ্ঠের জন্য সিধা এনেছিল। তার ন্যূনতা দেখে বশিষ্ঠ যে ক্রোধ দেখিয়েছিলেন তাতে আর যাই থাক নির্লোভ ব্রহ্মর্ষির পরিচয় নেই—আছে গ্রাম্য লোভী ছিদ্রান্বেষী ব্রাহ্মণের চিত্র।

১, ২, ৩। দাশরথী রায়ের পাঁচালী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৯৬, ৩৯০।

জানকীর জন্মের কথা, শুনে ধরেছে মাথা।
দেখেছ বল কোথায়?
কার কন্যা উঠে নাঙ্গলের ফালে?[১]

কিন্তু পরে যথোপযুক্ত সিধা এলে মুনির মত পাল্টে গেল—

বশিষ্ঠ কন কোন বেটা গোল করে সাধ্য কার
মুণি সিধে পেয়ে হয়ে সুস্থির করে দিলেন লগ্ন স্থির।[২]

রামচন্দ্রের বনগমণ ও সীতা হরণ

রামচন্দ্রের বনগমন ও সীতা হরণ অংশে কৈকেয়ী কর্তৃক ভরতকে রাজ্যদান এবং রামচন্দ্রের লক্ষ্মণ ও সীতাসহ চৌদ্দবছরের জন্য বনগমন, গুহকের সঙ্গে মিত্রতা প্রভৃতি কবি কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণ করে বর্ণনা করলেও কৈকেয়ীর সপত্নী বিদ্বেষ বর্ণনায় কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়—

"সর্ব্বস্ব লইলে চোরে সহ্য বরং হয়
রোগে হয় জীর্ণ কায়া, তাহাও প্রাণে সয়
সওয়া যায় তপ্ত তৈল, অঙ্গে কেউ ঢালে
কারাগারে ফেলে যদি বুকে চাপায় শিলে
সওয়া যায়—বুকে যদি দংশে কালসর্পে
তথাপি না সওয়া যায় সতীনের দর্প।[৩]

নাক কান কাটা সুর্পণখার খেদোক্তির মাধ্যমেও কবি হাস্যরসের অবতারণা করেছেন—

"অলপেয়ে যদি কান কাটতো তবু বিধাতা মান রাখতো
কেবা দেখতো চুল ঢাকতো
কাটলি কেন নাকরে।[৪]

'সীতান্বেষণ' পালায় সীতার বিরহে রামলক্ষ্মণের বিলাপ, সীতান্বেষণ জটায়ুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, হনুমনের সীতান্বেষণে লংকায় যাওয়া, সেখানে

১, ২, ৩, ৪। দাশরথী রায়ের পাঁচালী প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮১, ৩৯৭, ৪০০।

রাবণের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধতা, সীতার সঙ্গে কথোপকথন, হনুমানের সীতা প্রদত্ত পঞ্চফল ভক্ষণ, লঙ্কা দাহন প্রভৃতি ঘটনা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে বর্ণনা করলেও হনুমানের ফল ভক্ষণ অংশটিতে কবি নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। সীতা হনুমানকে রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও হনুমানের জন্য চারটি ফল ও বানর কটকদের জন্য একটি মোট পাঁচটি ফল দিলেন। হনুমান বানর সুলভ চপলতা ও লোভে পড়ে একে একে নিজের ফল, বানর সৈন্যদের ফল সুগ্রীবের ফল খেয়ে লক্ষ্মণের ফলটি খাওয়ার কথা ভাবল। যেই ভাবা সেই কাজ। মনে মনে ঠাকুর লক্ষ্মণকে প্রণাম করে সেটিও খেয়ে ফেলল। সর্বশেষে রামচন্দ্রের ফলটি নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে সেটিও দিল মুখে পুড়ে। এবার হনুর লোভের হল শাস্তি, ফল গলায় আটকাল রামনাম স্মরণ করার পর ফল গলা থেকে নামল।

''আটা কাটা দিয়ে আঁটি লাগিল গলায় ।।
ত্রাহি ত্রাহি করে হনু বলে প্রাণ যায়।[১]
কোথা আছ রামচন্দ্র রাখ এই দায় ।।

দাশরথী তাঁর রামায়ণ পাঁচালীতে রামায়ণের প্রত্যেকটি ঘটনা বর্ণনার সময় সমসাময়িক সমাজ চিত্র অংকন করেছেন। তরণী মায়ের পদধূলি মাথায় নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। তাঁর মতে সন্তানের কাছে মাতা পিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করলে দেবতা সন্তুষ্ট হন।

'তরনী সেন বধ' পালাটিতে কবি কলিযুগের ছেলেদের মাতৃভক্তির একটি নমুনা দিয়েছেন, এই যুগে ছেলেরা মাতা পিতাকে ভক্তি করাতো দূরের কথা অধিকন্তু অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয়—

''মা ডাকিলে কথা কননা, সনুনা মাগী বলে।
একে মরছি আপনার জ্বালায়, বুড় মাগী আবার কেন জ্বালায়,
আমার জ্বালায় মজুর বসে আছে সকলে।

১। দাশরথী রায়ের পাঁচালী, শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২৮।

খেতে খামারে হয়নি ধান, তুই মাগী বজ্জাতের প্রধান" ১
সংসারের অনুসন্ধান নাইত কিছু তোর।
কেবল বসে বসে নিচ্ছ আহার এখন গোটাকতক হয় প্রহার,
তবে মনের দুঃখ ঘুচে মোর

* * * * *

এমনি মায়ের সঙ্গে শীলতার কথা
আহারের আবার শুন কথা।১

মায়ের প্রতি সন্তানের এই গর্হিত আচরণ দেখে কবি ক্রুদ্ধ। তাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে এদিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শত অনুরোধে উপদেশে যা সংশোধন হয়না লোক লজ্জার, লোক নিন্দার ভয়ে তা সংশোধন হতে বাধ্য। সুতরাং লোকশিক্ষার বাহন হিসাবেও দাশরথী রায়ের পাঁচালীর উপযোগিতা অনস্বীকার্য, পালাটিতে কবি গ্রাম্য মানুষের মুখে গ্রামাঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন। মাগী, সন্নামাগী বুড় মাগী প্রভৃতি গ্রাম বাংলার লোকেরই গালাগালির ভাষা।

'মায়াসীতা বধ' অংশটিতে বিশ্বকর্মা কর্তৃক মায়া সীতানির্মাণ, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক রামলক্ষ্মণের সামনে মায়াসীতা বধ, রামশিবিরে সীতার শোকে হাহাকার, বিভীষণের অনুরোধে হনুমানের অশোকবনে সীতাকে দেখে আসা, প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মায়াসীতা নির্মাণ প্রসঙ্গে কবি সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন ভক্ত রাবণের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। পূর্ব্ব জন্মে রাবণ ছিল বৈকুণ্ঠে নারায়ণের দ্বার রক্ষক। দুর্বাসা মুনির শাপে তাঁকে রাক্ষস কুলে জন্মাতে হয়েছে। রামরূপী নারায়ণের হাতে মৃত্যু হলে তার শাপ মোচন হবে।

দোষ কি দিব বিধাতায় অমারা দ্বার ছেড়ে দিলামনা তায়
মুণি মোদের অভিশাপ করে ॥
তোদের বৈকুণ্ঠে থাকা নয়, যুক্ত ধরায় বরা বাস উপযুক্ত
আসা অবনীতে সেই প্রযুক্ত তুচ্ছ অপরাধে।২

১, ২। দাশরথী রায়ের পাঁচালী—শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৫০

হলো পাপে পূর্ণ কলেবর। তাই ব্রহ্মার কাছে মাগি বর
ঐ ব্রহ্ম পীতাম্বর দেখতো আমাদের সেধে ॥
অন্য কি ছার শূলপাণি দরশানার্থে চক্রপাণি
যুগ্মপাণি করতেন আমাদের কাছে।
আমরা কি দেবতায় মাণি ছিলাম কত হয়ে মাণি
তাইতে হয়ে অপমানী ভূতলে থাকা মিছে ॥
তাই দাসের ঘুচাতে দুর্গতি রামরূপে অগতির গতি
করেছেন লঙ্কায় গতি পশুপতি আরাধ্য।
যারে পায়না যুগে যুগে আরাধিয়ে
রেখেছি সেই লক্ষ্মী বাঁধিয়ে
দেখেন ভক্তি ভাব যার হৃদয়ে হরি জন তার বাধ্য ॥[১]

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের আদেশে বিদ্যুৎজিহ্ব মায়াসীতা নির্মাণ করেছিল।

আর দাশরথীর রামায়ণ পাঁচালীতে রাবণের আদেশে বিশ্বকর্মা মায়া সীতা মির্মাণ করেছে—

"বলে কি করহে বিশ্বকর্মা! তোমায় কি কহিলাম আমি।
অবিলম্বে মায়াসীতা নির্মাণ কর তুমি ॥[২]

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালাটিতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর রাবণের যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ, মন্দোদরীর রাবণকে বাধা দান ও সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ, শক্তি শেলাহত লক্ষ্মণের শোকে রামচন্দ্রের বিলাপ, হনুমানের ঔষধি আনতে গন্ধমাদন পর্বতে গমন, সেখানে কুম্ভিরিনী উদ্ধার, কালনেমি বধ, হনুর ভানুকে বোগল চাপা করা এবং সর্বশেষে নন্দী-গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ভরতের বাঁটুলে হনুর ভূতলে পতন ও

১, ২। দাশরথী রায়ের পাঁচালী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪—৪৫০।

মূর্চ্ছা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনায় দাশরথী প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণ করেন। পালাটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা যাওয়ার সংবাদে কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাণীর করুণ বিলাপ।

হেথা কৌশল্যা রাণী সুমিত্রা শ্রীরামের শুনিয়ে বার্তা
আসিছেন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
ডাকিছেন অবিরাম কোথা রাম! কোথা রাম!
বলে পড়েন চেতন হারায়ে ॥

* * *

সেই কমল আঁখির চরণ লয়ে দিবে লক্ষ্মণের বুকে বুলায়ে
তার কাছে আর কি ঔষধ আছে।[১]

পালাটিতে রাম ভক্ত সুমিত্রা জননীকে শক্তি শেলাহত লক্ষ্মণের বুকে বনোষধির পরিবর্তে শ্রীরামচন্দ্রের চরণধূলি লাগিয়ে দিতে বলে রামভক্তিবাদ ও শ্রীরাম চন্দ্রের ঐশী মহিমা প্রচার করেছেন।

'মহীরাবণ বধ' পালাটিতে মহীরাবণ কর্তৃক বিভীষণের ছদ্মবেশে রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে বেঁধে নিয়ে এসে মধ্যরাত্রে কালীর নিকট বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করা, হনুমানের মক্ষিকার ছদ্মবেশে পাতালে প্রবেশ করে লক্ষ্মণকে পাতাল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনায় কবি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণ করেছেন। পালাটিতে কবি মানব চরিত্রের একটি বিশেষ দিকও উদ্ঘাটিত করেছেন। যতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোকনা কেন মন্ত্রগুপ্তি হোকনা কেন মন্ত্রগুপ্তি গোপন রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রাম্য মেয়েদের পক্ষে ত মোটেই নয়। হনুমান ঠিকই বলেছিল—

"নারী ছিদ্র পেলে পরে গুপ্তকথা ব্যক্ত করে
সব জানিব সরোবরের ঘাটে[২] ॥

মহীরাবণ রাম লক্ষ্মণকে বেঁধে নিয়ে রাত্রে কালীর নিকট বলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গোপন রেখেছিল। খবরটি জানত কেবলমাত্র মন্দিরের পুরোহিত। তাই মহীরাবণ পুরোহিতকে বলে দিল কথাটা যেন গোপন থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণীকে না জানিয়ে পারল না।

১, ২। দাশরথীর পাঁচালী প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৬, ৪৭১।

ব্রাহ্মণী তার সখী রামমণিকে পরে, রামমণি ঘাটের অন্যান্য মেয়েদের কাছে এই গোপন তথ্য ফাঁস করে দিল। আশ্চর্য্য এই যে প্রত্যেকেই অপরের নিকট কথাটা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু কেউই কথা রাখতে পারছে না—

"ব্রহ্মণী কয় কৃষ্ণ গোপাল। এমন বলার পোড়া কপাল
কারে বলিব তুমি করিলে মানা।
তখন প্রবেশ হয়ে কথার ছিদ্রে রাত্রে ধনীর না হয় নিদ্রে।
বলে, বলিনে পতির নিন্দা হয়।
যা থাকে তাই হবে কপালে একা তো রাত্রি পোহালে
ছোট দিদিকে না বলিলে নয়।[১]

ছোটদি রামমণি ব্রাহ্মণীর কাছে কথাটা গোপন রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—

"রামমণি কয় হরি হরি ধিক ধিক মোর গলায় দড়ি
বলিলে কথা তোর হবে সঙ্কট লো,
ভাল বাসিস বললি আমাকে এই কথা বার, করিমু কোন মুখে।
আগুন দিয়া পোড়াই এমন ঠোঁট লো।
তোর সঙ্গে কি সম্বন্ধ, তোর ভাতারের ভালমন্দ
হবে দায়, তাই আমি করিব মরলো
তুই খেলে ভাতারের মাথা
মোর তাতে কি থাকে মাথা
তোর ভাতার আর মোর ভাতার কি পরলো।[২]

কিন্তু রামমণিও কথা পেটে রাখতে পারলো না—

পুরুত ঠাকুরাণী করিলেন মানা
বলিলেন কথা কারে বলোনা॥
অতএব আমার প্রকাশ করা হয়না।
কেবল বলছি কথা লুকায়ে ঘাটে

১, ২। দাশরথীর পাঁচালী—প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭১-৪৭২

তোরা পাছে বলিস হাটে
তোদের পেটে কথা জীর্ণ পায়না
আমাদের মত নহিস যে পেটে
বারোশো জন্মের কথা পেটে
জীর্ণ করে গিন্নী হয়েছি বাছা।[১]

হনুমান কর্তৃক দেবীর নৈবদ্য ভক্ষণ ও হনুমানের সঙ্গে মহীরাবণের দুই পুত্রের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। হনুমান দেবীর নৈবেদ্য 'নমঃ রামচন্দ্রায়' বলে ভক্ষণ ত করলই অধিকন্তু দেবীর উপর তীব্র বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করল।

"খেয়েছি তোর ক্ষতি কি মা।
তোমার খাবার অভাব কি মা।
জন্ম সুখী রাজার ঘরে জন্ম
বিশেষ একটু মনে বুঝ, জগত জুড়ে করে পুজো।
নানা দ্রব্য দিয়ে করি ঘটা।
খেতে কি বাকি আছে হেঁটে, ব্রহ্মাণ্ড ভরেছ পেটে।
খাবে কি আর আলো চালী কটা[২] ।।

মহীরাবণের সদ্যজাত দুইপুত্র হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে হনু তাদের 'পুনকে শত্রু' বলে গালাগালি দিয়েছে—

হাসিয়া কয় পবনপুত্র আরে মলো পুনকে শত্রু
চুসনে বেটারা কি করিস, কি করিস
এখনো তোদের কাটে নাই নাড়ী ঘৃণা হয় কেমনে মারি
নেয়ে আয়তো তবে আমারে মারিস
হাসি হনুমান কয় হেলে হেলে আহা মরি দিব্য ছেলে।
কাল কাল চুলগুলি মাথায়
এখনি হলি আগুন করবে আতুড়ে গিয়ে সেক নে পড়ে।
থোড়াল থোড়াল গড়ন দেখি নাকটি যেন টিয়ে পাখী
বাপের মতন সব কি হয়েছে ছেলে।

১। দাশরথী রায়ের পাঁচালী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭২-৭৩,

নাড়ি কাটায়ে থালে নাওগে পোয়াতির কোলে মাই খাওগো।
বাহিরে এসো পাঁচুটের দিন গেলে[১]।

মহীরাবণের দুই পুত্রের সঙ্গে হনুর যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সুকোশলে নবজাতকের জন্মের পর নাড়িকাটা, সেঁক দেওয়া, থালায় নাওয়ানোর পর পঁাচুটি প্রভৃতি নবজাতকের জাত কর্মের বিহর বর্ণনা করেছেন।

রাবণবধ পালাটিতে সীতার অগ্নি পরীক্ষার সময় সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলে পত্নী শোকে অধীর রামচন্দ্র অগ্নির উপর ধনুর্বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত হন। তখন অগ্নিদেব স্বয়ং আবিভূর্ত হয়ে সীতার প্রতি এবং অগ্নির প্রতি নিষ্ঠুর বিবেচনা-হীন ব্যবহারের জন্য রামচন্দ্রকে বিদ্রূপ করে বলেছেন রামচন্দ্র রাজা হলে দীন দরিদ্র প্রজাদের উপর কি রকম বিচার করবে তা এখন বোঝা যাচ্ছে—

অগ্নি বলে করি স্তুতি কি দোষ অগ্নির প্রতি
প্রভু তুমি অগ্নি অবতার।
তখন রামকে দিয়ে রামের শক্তি খেদে অগ্নি করে উক্তি
প্রণাম করি জানকী বল্লভে
দেখিলাম এইতো কার্য্য যেদিন হবে রামরাজ্য
দীনের প্রতি তো এমনি বিচার হবে[২]।

এই অংশটির সঙ্গে কৃত্তিবাস পরিকল্পিত পৃথিবীর উক্তি তুলনীয়। কৃত্তিবাসের পৃথিবী ও অগ্নিদেবের মত সীতার পাতাল প্রবেশের সময় সশরীরে আবিভূর্ত হয়ে রামচন্দ্রকে অনুরূপ ভাবে তিরস্কার করেছেন—

  

'রামচন্দ্রের দেশাগমন' পালাটিতে সীতা উদ্ধারের পররামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে এক রাত্রি ভরদ্বাজ আশ্রমে অতিবাহিত করলেন মুনি বিশ্বকর্মা ও মাতা অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করে অথিতি সেবার আয়োজন করলেন। এমন কি পায়ের নখ ও দাড়ি কামাবার জন্য ক্ষুর হাতে নাপিতও এসে উপস্থিত হল। বনের বানর তথা নাগরিক সভ্যতায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ দেহাতি মানুষ

১, ২। দাশরথীর পাঁচালী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৭৮, ৪৯৫

নাপিতকে দেখে ভয়েই অস্থির। প্রাণ বাঁচানোর জন্য কিল চাপড় মেরে তাকে ধরাশায়ী করে দিল।[১]

ক্ষুর দেখে নাপিতের হাতে ভয়ে বানর যায় তফাতে
এক বানর উঠিল বৃক্ষ ডালে।
করে দন্ত কন্ত কড় মড় এক বানর মারে চড়
নাপিত করে ধড় ফড়, পড়িয়া ভূতলে।
মুণি বলে কেন মেলে কি দোষী নাপিতের ছেলে
বানর বলে মেরেছি বটে মুণি।
ও বেটা কি জন্য আনে শানিয়ে অস্ত্র গলা পানে
অপমৃত্যু ঘটেছিল এখনি।
একটা অস্ত্র পাথরে ঘষে পায়ের অঙ্গুলী কাটিতে আসে।
দাড়ি ভিজায়ে দিল কিসের তরে
জানেনা যে রামের ভক্ত বেটার এত ঘাড়ে রক্ত
আমাদের ঘাড় নুয়ায়ে ধরে।[২]

বানরেরা অন্নপূর্ণার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে মুনি তাঁকে নিজের মা এবং হরের ঘরনী বলে পরিচয় দেয়। সরল বুদ্ধি বানরেরা বুঝতে পারে না বৃদ্ধের কি করে ষোড়শী নারী মা হয়? তারা মুনিকে আর একপ্রস্থ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করল—

তোমার মা কি ঐ ষোড়শী মেয়ে?
তোমার হাঁড়িতে বসেছে কথা বাহির হয়েছে যমের খাতা
পাকা ফল আর কয়দিন রয় গাছে।
তুমি যদি হও উহার কুমার, ইনি যদি হন মা তোমার
তবে ওর কপালে পুত্র শোক আছে[৩]।

অন্যত্র ভরদ্বাজ আশ্রমে মোচার ঘণ্টে ঝাল খাওয়া, পানের রসে মুখ লাল করা বানরদের দুরাবস্থার মাধ্যমে কবি দাশরথী নাগরিক সভ্যতায় অনভ্যস্ত গ্রাম্য সরল মানুষদের কথা বর্ণনা করেছেন—

"খাইয়ে মোচার ঝাল ঝাল লাগে বানর পাল
আপনার গাল আপনি চড়াচড়ি"।[৪]

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৫২৯।

২, ৩, ৪। দাশরথী রায়ের পাঁচালী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৭-৪১৮, ৪১৮।

নাগরিক সভ্যতার পটভূমিকায় গ্রামের আটপৌরে মানুষকে স্থাপন করে নির্মল হাস্য রসের সৃষ্টি করেছেন। বনপ্রকৃতি যাদের বাসস্থান, গাছে গাছে যাদের আহার, গুরু ভোজনের পর পান খেয়ে মুখ শুদ্ধি করা তাদের পক্ষে বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে!

'লবকুশের যুদ্ধ' কাণ্ডটিতে দাশরথী সহজ সরল ভাষায় রামভক্ত হনুমানের বীরত্ব বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের আত্মজ লব কুশ বীর বটে। পিতা রামচন্দ্রকেও তারা পরাজিত করেছে। কিন্তু রামভক্ত হনুমান এদের চাইতেও বড় বীর। স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার না কয়লে কেউ তাকে বাঁধতে পারে না। চার যুগের অমর সে। মাতৃদরশনেচ্ছায় লবকুশের হাতে সে বন্ধন স্বীকার করেছে—

বড় আয়াসে যাচ্ছ বলে ভর দেয় নাই বালক বলে
বাঞ্ছা করেছি মাকে দরশনে
বেঁধেছ বৃহৎ অঙ্গ ঐ রসে করিছ রঙ্গ
হেতু বিনে কি ইনি হন বাধ্য
মিছে তোদের আস্ফালন ইনি আপনি বন্ধন
নৈলে কি বাঁধিতে তোদের সাধ্য।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত কবিগান, ঢপ, ঝুমুর, যাত্রা, পালাগান, পাঁচালীগান ও নাট গীতাভিনয় ছিল বাংলার লোক জীবন ও লোক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাংলা দেশে তখনও সখের নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চণ্ডীমণ্ডপে খোলামাঠে, বাবুদের বৈঠক খানায় মুক্তাঙ্গণ অভিনয় বাঙ্গালীর নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করত। এসমস্ত গীত ও যাত্রাভিনয়ে আদি রসের ছিল ছড়াছড়ি। অল্প বয়স্ক কিশোর কিশোরী ও তরুণ তরুণীরা এসব অশ্লীল গীতাভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করার ফলে সমাজ জীবন উচ্ছৃঙ্খল ও বেপথগামী হয়ে পড়ল। এই অবক্ষয়ীমান বাঙ্গালীর সমাজ ও পরিবার জীবনের সামনে একটি উচ্চ নৈতিক আদর্শ তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিল। স্বভাবতই রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে বাংলা লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির দরবারে হাজির করা হল।

১। দাশরথী রায়ের পাঁচালী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৪।

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে যাত্রা পালাগান, নাটগীতি রচনা শুরু হল। এদের মধ্যে মনোমোহন বসু, মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে অভিনয় উপযোগী পালাগান রচনা করেন।[১] আবার অনেকে বহু যাত্রার দলকে পালা লিখে দিতেন। ঠাকুরদাস দত্ত নামে একজন বিখ্যাত পালা লেখক দীননাথ চৌধুরীর দলে লক্ষ্মণ বর্জণ ও দুগো ঘোড়েলের দলে রাবণ বধ, সাধুখাঁ ও বকো দুই দুই মুসলমান যাত্রাওয়ালার দলে শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমণ ও ঝড়ু দাসের দলে রাবণ বধ পালা যাত্রাভিনয়ের জন্য লিখে দিয়েছিলেন। এছাড়াও আসাম, নেপাল, মিথিলায় ও বাংলা ভাষায় নাটক রচনার নিদর্শন পাওয়া গেছে।[২]

'ব্রজমোহন রায়' রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে রামাভিষেক, শতস্কন্ধ রাবণ বধ লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং লক্ষ্মণ বর্জন প্রভৃতি চারিখানি যাত্রাগান রচনা করেন। এই পালাগুলিতে রামায়ণের কাহিনীর মাধ্যমে তিনি মানব-জীবনের উদারতা মহানুভবতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, ভালমন্দ, সৎ-অসৎ প্রভৃতি মানব মনের বিচিত্র প্রবৃত্তি গুলি সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন। যাত্রা হচ্ছে লোক শিক্ষার একটি বিশেষ মাধ্যম যাতে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। নীচ প্রবৃত্তির চরিত্রগুলি দেখে তাদের প্রতি লোকের ঘৃণা ভাব জন্মে। এ যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। মন্থরা, কৈকেয়ী, রাবণ সুর্পনখা প্রভৃতি চরিত্রের নীচতা, স্বার্থপরতা, কামুকতা, দেখে এই ধরণের মানুষের প্রতি লোকের মনে ঘৃণা জন্মে, এদের সম্বন্ধে সচেতন হয়। আবার রাম, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতির চরিত্র মাধুর্য্য ও মহানুভবতা সমাজকে উচ্চ আদর্শের দিকে আলোক বর্তিকার মত পথ দেখায়। এক কথায় রামায়ণ কাহিনীগুলি এ যুগে যাত্রাদলে অভিনীত হয়ে বাঙ্গালীর লোক সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনই লোকশিক্ষারও ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

১। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, শ্রী বৈদ্যনাথ শীল।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড), ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৩৫, ৫৪৯।

ব্রজমোহন রায়ের 'রামাভিষেক' যাত্রাভিনয়টিতে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন এবং কৈকেয়ী কর্তৃক ভরতকে রাজ্যদান ও রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানো বর্ণিত হয়েছে। এই যাত্রাভিনয়টিতে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় দেবী সরস্বতীর প্রভাবে কৈকেয়ী রামকে বনবাসে পাঠায়।

"আমি ত্বরায় ধারায় গিয়ে যাহাতে দশরথের নিকট কৈকেয়ী রাম নির্বাসনের বর প্রার্থনা করে তার উপায় করিগে। সত্বর কার্য্য সমাধা হবে তার আর সন্দেহ নাই[১]।"

ব্রজমোহনের মন্থরা চরিত্রটি গ্রাম্য, নীচ স্বার্থপর নারী চরিত্রের একটি জীবন্ত মূর্ত্তি। সরলা কৈকেয়ী প্রথমে মন্থরার কুমন্ত্রনায় প্রলুব্ধ হয়নি। তাঁর কাছে রাম ও ভরত সমান—"আমি রাম ভরতকে কখনো ভিন্ন দেখিনা[২]। কিন্তু মন্থরার কুটিলতার কাছে কৈকেয়ী হার মানল। মন্থরা কৈকেয়ীর হৃদয়ে একটু একটু করে বিষ ছড়াতে লাগলো।

সতীনের সঙ্গে সাপের ছোঁয় তুলনা করে কৈকেয়ীকে সে রামবিদ্বেষী করে তুলেছে—

সতীনের হাত সাপের ছোঁ।
চিনি দিলে তুলে সো।
সতীনের রা নিশির ডাক।
তিন তাকে চুশ মেরে থাক ॥
খাই যদি সতীনের কড়ি।
মরবো দিয়ে গলায় দড়ি ॥[৩]

বিষকন্যা মন্থরার মুখে লেখক তার উপযুক্ত ভাষাই প্রয়োগ করেছেন। মন্থরার শিক্ষায় শিক্ষিতা কৈকেয়ী তার সমস্ত সরলতা মানবতা হারিয়ে ফেলেছে। রামকে কেবল রাজ্যচ্যুত করে সে ক্ষান্ত হল না রাজ্য, হরণ করে বনেও পাঠাল।

১, ২, ৩। ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী, ব্রজমোহন রায়, সম্পাদিত শ্রীনটবর চক্রবর্তী, বঙ্গবাসী কার্যালয়, ১৩১৩, পৃঃ ৩৫, ৫৪

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে রামচন্দ্র বনে লক্ষ্মণ ও সীতার কষ্ট দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বনবাস দুঃখের জন্য নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করেছেন।

লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে লেখক পঞ্চম পর্ভাঙ্কেই রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তণ, সিংহাসন আরোহন ও রামসীতার যুগলরূপ বর্ণনা করেছেন। অভিনয়ের জন্য রচিত বলে সংলাপ অত্যন্ত বস্তবানুগ হয়েছে।

ব্রজমোহন রায়ের 'শতস্কন্ধ রাবণ বধ' পালাটিতে রামচন্দ্র দশানন রাবণকে বধ করে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর অগস্ত্যমুনি একদিন রামচন্দ্রকে জানালেন যে আহু লঙ্কাপুরে শতানন রাবণ বাস করছে। তখম রাক্ষসারি রামচন্দ্র তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে শতানন রাধণকে বধ করার জন্য যাত্রা করলেন। সীতাদেবী এই যুদ্ধ যাত্রার কথা জানতে পেরে রামকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। একান্তই রামচন্দ্র যখন যুদ্ধে যাবেনই তখন সীতাও রামচন্দ্রের সঙ্গে যেতে চাইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে নিতে সম্মত হলেন না। রামচন্দ্র আহ লঙ্কাপুরে শতানন রামচন্দ্রের কাছে সসৈন্যে পরাজিত হলেন। রামচন্দ্রের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সীতা অসীতা রূপ ধরে আহুলঙ্কাপুরে উপস্থিত হয়ে শতানন রাবণকে বধ করেন। মহাশক্তি রূপিনী সীতার পরিচয় পেয়ে রামচন্দ্র তাঁকে আর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারলেন না, দেবীরূপে তাঁর পূজা করলেন।

সীতা নানাভাবে রামচন্দ্রকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন পতি পরমগুরু। পত্নী তাঁর দাসী মাত্র। রামচন্দ্র কেন পতি হয়ে পত্নীর পূজা করবেন? কিন্তু রামচন্দ্র কিছুতেই সীতাকে স্বীয় পত্নীরূপে ভাবতে পারলেন না। এখানেই রাজমহীষী সীতার মানবী সত্ত্বার বিসর্জন ও দেবী সত্ত্বার প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে দেবীত্বের আবরণে আবৃতা নারীও হল নির্বাসিতা।

"অসীতা রূপ ধরে সীতা বধিল রাবণ।
শ্রীরামচন্দ্র সেই মূর্ত্তি করি দরশণ॥
গুরু স্ত্রী জ্ঞানে তাঁবে না করেন গ্রহণ।
মতান্তরে সীতাকে রাম করেন বর্জ্জন[১]॥"

১। ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত পৃঃ ২১৯

লক্ষ্মণের শক্তি-শেল যাত্রাভিনয়টিতে মায়াসীতা বধ, লক্ষ্মণ কর্তৃক নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ বধ, পুত্র শোকাতুর রাবণের শক্তি শেলের আঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধি আনতে যাওয়া, সেখানে কালনেমি বধ, ও কুম্ভিরিণী উদ্ধার, সূর্যকে বগল দাবা করা, ভরতের বাটুলে হনুমানের মূর্ছা, হনুমান কর্তৃক ভরতকে তিরস্কার করা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনায় লেখক প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। কি পুরুষ, কি নারী প্রত্যেকটি চরিত্র লেখকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সীতা, সরমা ও সুর্পণখা চরিত্রের কথোপকথনে তিনি তিনটি ত্রিকোণী নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। মন্দোদরীর চরিত্রেও নারীত্ব ও মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে।

বাল্মীকি, কৃত্তিবাস বা অন্য কোন রামায়ণে রাবণের চেড়িরা সীতাকে প্রহার করে নাই, কিন্তু ব্রজমোহন রায়ের যাত্রাভিনয়ে রাবণের চেড়িরা সীতার দেহে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করেছে। সরমা সীতার রক্তাক্ত দেহ দেখে শোকে অভিভুত হয়েছেন। শুধু সরমা নয়, সরমার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও চোখে জল এসেছে। রাবণের আদেশে উল্কামুখী, বজ্রমুখী প্রভৃতি চেড়িরা সীতাকে নির্মমভাবে প্রহার করেছে। প্রহারের যন্ত্রনায় সীতা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছেন।

সীতার রক্তাক্ত দেহ দেখে সরমাও শোকে আর্তনাদ করে উঠেছেন—'একি মা গো, এ যে সর্বাঙ্গে রক্ত ফুটে বেরিয়েছে। একি, এযে বেতের দাগ? বিধাতঃ তোর মনে এত ছিল? তুই নিরপরাধিনী সাধ্বী সতীকে বনবাসিনী করেছিস। তাকে স্বামী সহবাসে বঞ্চিতা করে রাক্ষস মধ্যে রেখেছিস। তাতেও নিরস্ত হলিনে! তার উপর আবার এই পীড়ন।[১]

অত্যাচারী রাক্ষস গৃহে যেমন বিভীষণ তেমনই তার উপযুক্ত পত্নী সরমা। বনবাসিনী সীতার দুঃখে সরমাই একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়স্থল। সরমা সীতাকে সব সময় সঙ্গ দান করেন এবং রামের কুশল বার্তা পেঁছে দেন। সীতাও সরমাকে মায়ের মত মনে করে বলেছেন "তুমি আমার জন্ম জন্মান্তরের

১। ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত পৃ ৩৩১—৩২৪।

মা ছিলে, তাই এ জন্মেও মাতৃস্নেহ ভুলতে পার নাই। তাই আমায় কন্যার মত দেখ।[১]

যেমন রাবণ তেমনই তার সহোদরা সুর্পনখা। তার কাজ যেমন নির্লজ্জ বেহায়ার মত তার কথার ধারও তাই. নারী ধর্ম, সতী ধর্ম এই রাক্ষস রাজকুমারীর কাছে মূল্যহীন। ভোগ ও লালসার পরিতৃপ্তি তার একমাত্র কাম্যবস্তু। সীতাকে সে অনায়াসে বলতে পারে—

"এমন ত্রিভুবনের রাজা মদন মোহন ছেড়ে সেই জটাধারীর চিন্তা কেন কর। দুধ ত্যাগ করে তোমার ঘোলে রুচি হোল, না? আখের টিকনি ত্যাগ করে সজনে খাড়া খেতে চাচ্চ।[২]

সীতা ও সরমা চরিত্র লেখক যতই দরদ দিয়ে অঙকন করুন না কেন? সুর্পণখা চরিত্র অংকনেই লেখকেয় কৃতিত্ব সর্বাধিক। পাড়াগাঁয়ে ঝগড়াটে মেয়েদের মতই সে সীতা ও সরমাকে গালাগালি দিয়েছে। দুশ্চরিত্রা রাক্ষসী সুর্পণখা মিথ্যাবাদিনীও বটে। লক্ষ্মণের নামে অপবাদ দিয়ে সে বলেছে—"পঞ্চবটী বনে আমার রূপ দেখে সেই লখা ডাকরার মুণ্ডু ঘুরে গিয়েছিল। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে কিনা সুর্পণখা তোমার রূপের আগুনে আমার মন ফড়িংয়ের পাখা পুড়ে গিয়েছে। আমায় বাঁচাও, আমায় বিবাহ করে আমার জীবন দান কর।"[৩] সে আরও জানে যে পৃথিবীতে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী—"সেই পোড়াকপালে লখা ড্যাকরা আমার এই চাঁদের মত রূপে কলংক করে দিয়েছে। আমার এই পদ্মের মত মুখ খানির পাঁপড়ি ছিড়ে দিয়েছে। সেই ড্যাকরার বেটা জানেনা যে আমা অপেক্ষা সুন্দরী পৃথীতে নাই"।[৩] কুরূপা কুৎসিতা সুর্পণখার রূপ বর্ণনা করে লেখক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। সুর্পণখার মত এমন ভ্রাতৃবধূ বিদ্বেষী খল দুশ্চরিত্রা রমণী আমাদের সমাজে আশে পাশে প্রচুর রয়েছে। ড্যাকরা,, খাগুদোরি, ক্যাত-ক্যাত প্রভৃতি গ্রাম্য প্রচলিত শব্দ ও বাগবিধি ব্যবহার করে লেখক রামায়ণের অতি গুরুগম্ভীর ঘটনাকেও লোক মনোরঞ্জনের উপযুক্ততা দান করেছেন।

ব্রজমোহনের মন্দোদরী চরিত্রটিও সীতা ও সরমার সমগোত্রীয়া। তার মধ্যে

১, ২, ৩। ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত পৃ, ৩২৫—৩২৭

চিরন্তন মাতৃ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রতিহিংসাবৃত্তি বা প্রতিশোধ স্পৃহা তার মধ্যে জাগে নাই। রাবণ পুত্রহন্তা লক্ষ্মণ বধে কৃতসংকল্প হলে সে বাধা দিয়েছে।—"নাথ আর যুদ্ধে কাজ নেই, লক্ষ্মণকে বধ করলে ত আমার হারা নিধি পুনঃ প্রাপ্ত হবোনা ? যে অনলে দগ্ধ হচ্ছি এর ত আর নির্বাণ হবে না।"[১] বাল্মীকি, কৃত্তিবাসী ও অন্যান্য রামায়ণে মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধযাত্রায় বাধা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তার কারণ নিজের পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে অন্যের পুত্রের প্রাণ হানিতে বাধা দেওয়া হয়। আর এখানে স্বামীর জীবনাশঙ্কায় রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে রাবণকে যুদ্ধে প্রতি নিবৃত্ত করেছেন।

পালাটির আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রাবণের দেশাত্মবোধ। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—"তুমি যথার্থই ভাগ্যবতী। তাই এমন বীর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলে। যে বীর দেশহিত ব্রতে জীবন ত্যাগ করে সেই ধন্য, সেই বীর প্রসূতি"।[২]

ব্রজমোহন অঙ্কিত লোভের আর একটি জীবন্ত চরিত্র কালনেমি। কিছু ধূর্ততারও সে পরিচয় দিয়েছে। রাবণ কালনেমিকে গন্ধমাদন পর্বতে যাওয়ার জন্য ডেকে পাঠালে প্রথমে সে খুব বীরত্বের আস্ফালন করেছে কিন্তু পরে যখন জানল হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধি আনতে গেছে তখন তার সব আস্ফালন থেমে গেছে। কিন্তু রাবণ যখন গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে হনুমানকে বধ করার বিনিময়ে রাজপ্রাসাদ ও রাণীদের সহ অর্ধেক স্বর্ণ লঙ্কা দিতে চাইল তখন সে বিনা দ্বিধায় সম্মত হল। মনে মনে সে রাবণের সমস্ত ধন দৌলত ভাগ করতে লাগলো। রাণী মন্দোদরীকে কিভাবে নিজের বশে আনবে তার সেই পরিকল্পনা যেমন হাস্যাস্পদ তেমনই প্রচণ্ড লোভের পরিচায়ক—'ওরে আমার ভাগনে বৌরে ভাগের ভাগ তার আবার ভাগনে বৌ আর টাগনে বৌ। তা যা হোক আর সব না হয় তার থাকবে কেবল সেই মন্দোদরী—প্রথম প্রথম মামা শ্বশুর বলে একটু লজ্জা লজ্জা করবে। তারপর দুদিনে গা ঘাসা হয়ে যাবে তার জন্য চিন্তা কি ? আর আমার চেহারাটাও মন্দ নয় যেন কার্তিক ময়ূর ফেলা বেড়াচ্ছি' ?[৩]

১, ২, ৩। ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৭—৩৪১, ৩৪২, ৩৪৮

লক্ষ্মণ বর্জন যাত্রাভিনয়টি রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হলেও লেখক কাহিনীর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছেন ! এই পালার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ঊর্মিলা চরিত্রের বিকাশ ও বিস্তার। মিথিলার বিবাহ বাসরে বধূ বেশিনী ঊর্মিলাকে আমরা একবার মাত্র দেখতে পাই। তারপর অযোধ্যার রাজ পরিবারের উত্থান-পতন, ভাঙ্গাগড়ার মহা-কোলাহলের মধ্যে বধূ ঊর্মিলা কোথায় হারিয়ে যায়। ব্রজমোহন রায়ই সর্বপ্রথম এই উপেক্ষিতা রঘুকুলবধূকে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরলেন। এই পালায় সীতা নেপথ্যচারিণী। ঊর্মিলার খেদোক্তিতে আমরা সীতার কথা জানতে পারি।

নিদ্রার মধ্যে ঊর্মিলা তার আসন্ন সর্বনাশের স্বপ্ন দেখে। অট্টালিকার উপরিভাগে এক আলুলায়িত কুন্তলা রমণী রোদন করতে করতে তাকে জানালেন যে, নীশিথ সময়ে তিনি রঘুকুল ত্যাগ করে যাবেন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ঊর্মিলা আরও দেখেন, আকাশ দ্বিধা হয়ে শত সূর্যের কিরণ প্রকাশিত হচ্ছে। আর এক হরিত বর্ণের সপ্ত অশ্বযোজিত একচক্র বিশিষ্ট অপূর্ব রথ আকাশ মণ্ডলে দৃশ্য হল। সেই রথোপবিষ্ট এক জ্যোতির্ময় মূর্তি হস্ত প্রসারিত করে লক্ষ্মণকে কোলে নিলেন। ঊর্মিলা সূর্যবংশের আদি পুরুষ সূর্যদেবকে চিনতে পেরে কাতর স্বরে কাঁদতে লাগলা। এতে লক্ষ্মণ হাসতে লাগলো কিন্তু চোখে তার জল। পত্নীর কাতরতায় লক্ষ্মণ তাকে পার্থিব সুখ শেব হয়ে থাকলে রথে উঠে আসতে বলল। ঊর্মিলা আহলাদে লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করলে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। নিদ্রা ভঙ্গে ঊর্মিলার কাতর আর্তনাদ—"এতদিনে অযোধ্যার আশা ফুরাল। এতদিনে বুঝি স্বামী ধনে বঞ্চিত হলেম। এতদিনে বুঝি অভাগিনীর কপাল ভাঙ্গলো[১]।

নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হল। সন্ন্যাসী বেশধারী মহাকালের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রামচন্দ্র দ্বাররক্ষক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও মাতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঊর্মিলার কাছে উপস্থিত হলেন চিরবিদায় জানাতে। লক্ষ্মণ নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে এবারও ঊর্মিলাকে গৃহে রেখে যেতে

১। ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত পৃ ৩৯৩।

চাইলেন। কিন্তু তিনি কোন প্রবোধ বাক্যই শুনলেন না। রামের বনগমনের সময় তিনি পতিবিরহিতা হয়ে গৃহে বাস করছিলেন। আজ মহাপ্রস্থানের সময় স্বামীর সঙ্গিনী হলেন। লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্মিলাও সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এখানে সীতা অপেক্ষাও উর্মিলা ভাগ্যবতী কারণ সীতা জীবনের শেষ দিন স্বামী রামচন্দ্রকে সঙ্গে পাননি, উর্মিলা পেলেন।

লক্ষ্মণের প্রাণ বিসর্জনে রামচন্দ্রও ভ্রাতৃ শোকে সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। রামায়ণে রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের ঘটনা সাড়ম্বরে বর্ণিত হয়েছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে অযোধ্যাবাসী এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ বর্জন পালাটিতে রামচন্দ্র একাকী সরযূ সলিলে আত্মবিসর্জন দিয়ে পত্নীশোক ও ভ্রাতৃশোকের উপশম করেন। লক্ষ্মণ বর্জনে লক্ষ্মণের ভূমিকায় বড় কিন্তু এখানে লেখক সচেতনভাবেই হোক বা অবচেতন ভাবেই হোক উর্মিলাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন বলে মনে হয়।

মতিলাল রায় আদিরসাত্মক কাহিনী, ভাঁড়ামী, ও অশ্লীল কাব্যরসের পরিবর্তে বাংলা যাত্রাভিনয়ে রামায়ণ, পুরাণ, কৃষ্ণকথা ও লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করে অভিনয়যোগ্য যাত্রা ও পলাগান রচনা করেছিলেন। তিনি কেবল যাত্রাভিনয়ের জন্য পালা লিখে ক্ষান্ত হন নি। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর যাত্রাদলটিও পরিচালনা করেন। লোকশিক্ষা ও লোকচরিত্রের উন্নতি সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তাঁর পালাগানগুলি রচনা করেছিলেন বলে প্রথম প্রথম খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তাঁর মৃত্যুর পর পালাগুলির চাহিদা কমে এল। তাঁর দুই পুত্র বহু চেষ্টা করেও দলের জনপ্রিয়তা রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে দলটির এখানে অকাল সমাপ্তি ঘটল।[১]

রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে তিনি অহল্যা উদ্ধার, হরধনুভঙ্গ, রামবিবাহ, রামবিদায় ভরতাগমন, সীতাহরণ, সীতান্বেষণ, তরনীসেন বধ, রাবণ বধ, রামরাজা ও লক্ষ্মণ ভোজন প্রভৃতি যাত্রাভিনয়ের জন্য পালা গান রচনা করেন। প্রতিটি পালায় ভক্তিরসের অতি প্রাবল্য ঘটলেও কিছুটা হাস্যরসেরও সৃষ্টি করেছেন। অভিনয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন ও দর্শকদের রুচির দিকে লক্ষ্য করে

২। ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য 'যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায় গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এসব পালাগানে তিনি কিছু কিছু নূতন নূতন কাহিনীরও সংযোজন করেছেন।

'ভরতাগমন পালাটির' সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু হল রামচন্দ্রের বনগমন, দশরথের মৃত্যুর পর বশিষ্টাদির উদ্যোগে ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, ভরত কর্তৃক কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা, কুব্জা শাসন। কৌশল্যাকে সান্ত্বনা প্রদান, দশরথের শব সৎকার, রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের সসৈন্যে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা, পথে গুহকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার এবং চিত্রকূট পর্বতে ভরত ও কৌশল্যা প্রভৃতির সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন পালাটিতে ভক্তিরসের সঙ্গে করুণ রসের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে। রসসৃষ্টির প্রয়োজনে লেখক কিছু কিছু নূতন কাহিনীরও সৃষ্টি করেছেন এবং অপ্রধান চরিত্রকে সক্রিয় ভূমিকা প্রদান করে যাত্রাপালার উপযোগিতা রক্ষা করেছেন। রামায়ণে ভরতের মাতামহ কৈকেয় রাজের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নাই। ভরতাগমণ পালায় এই চরিত্রটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অযোধ্যার দূতেরা ভরত ও শত্রুঘ্নকে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এলে তারা প্রথমেই আসন্ন অমঙ্গল আশংকায় উদ্বিঘ্ন চিত্তে মাতামহের কাছে উপস্থিত হয়েছে। মাতামহ ও দৌহিত্রের বিষণ্ণতার কারণ জানার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন—

কেন করিসরে রোদন
কিভাবে এভাব তোমার কি শোক প্রভাবে[১]

জামাতা দশরথের জন্যও এই স্নেহ প্রবণ বৃদ্ধের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল—

"বল বল দূত শুনিরে এ কেমন।
কি ব্যাধি করেছে আমার দশরথে আক্রমণ"[২]

দশরথের মৃত্যু সংবাদ না দিয়ে পীড়া সংবাদ দেওয়াটা অধিকতর স্বাভাবিক হয়েছে।

১। ভরতাগমন শ্রীমতিলাল রায়, প্রকাশক শ্রী ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়, নিউমূন প্রেস, ১২৯৫, পৃ. ১৮।

রামচন্দ্রের ভাগবত সত্তা সকলের কাছে সুবিদিত এবং রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতনরূপে সকলের কাছে প্রতিভাত। রামের ভাগবতসত্তা প্রচার করতে গিয়ে লেখক রাম নামের মাহাত্ম্যও প্রচার করেছেন। গুহকের কাছে রামের জটা-বল্কল ধারণের খবর পেয়ে ভরত মূর্ছিত হয়ে পড়লে গুহক ভরতের কর্ণমূলে রাম নাম উচ্চারণ করে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করেছে। রামনামের এমনই মাহাত্ম্য।

ভক্তাধীন ভগবান সর্বভূতে বিরাজমান, ভক্তের দেহে ক্ষুদ্র আঁচড়টিও তাঁকে বিদ্ধ করে। একটি ক্ষুদ্র সরস কাহিনীর সৃষ্টি করে লেখক এই তত্ত্বটি প্রতিভাত করেছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন ভাবলেন, রামচন্দ্রের সঙ্গে কৈকেয়ীর দেখা হলে তিনি যদি আবার রামচন্দ্রকে বনগমন করতে এবং ভরতকে রাজ্য দিতে বলেন রামচন্দ্র তাই করবেন। তবে আর তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। এই ভেবে তাঁরা কৈকেয়ীকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে রাখলেন। কৈকেয়ী যাতনায় অস্থির হয়ে অগতির গতি করুণানিধান রামচন্দ্রকে স্মরণ করতে লাগলেন। ভরত রামের নিকট গিয়ে দেখল রামচন্দ্রের হস্ত দৃঢ় রজ্জুবদ্ধ। রামচন্দ্র তখন ভরতকে বলল—কৈকেয়ী মাকে বন্ধন করনি, সে আমাকে বন্ধন করেছ। আমি আর বন্ধন যাতনা সহ্য করতে পারিনা। ভরতরে শীঘ্র আমার বন্ধন খুলে দে [১]।

রামলক্ষ্মণ ও সীতাকে বনে পাঠিয়ে দাসীদের কাছে কুব্জার আত্মপ্রসাদ, কুশনেমীর কাছে গহনা পরার সাধ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন কতৃক প্রহারের দ্বারা গহনা পরার সাধ পূরণ। কুব্জার দুর্দশা দেখে প্রতিবেশিনীদের তাকে উপহাস করার ঘটনা বর্ণনা দ্বারা লেখক কাহিনীতে বৈচিত্র ও হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

রামচন্দ্রকে বনে পাঠাতে গিয়ে সীতা ও লক্ষ্মণকে বনে পাঠাতে পেরে কুব্জার আহ্লাদের সীমা নেই। রাজা দশরথ মরে যেন তাদের আরও সুবিধা করে দিয়ে গেল, সে তার সহচরীদের বলে—পরমায়ু ফুরিয়েছে মরেছে, মরেও ফল মন্দ হয়নি। পাছে চৌদ্দ বৎসর পরে রামকে আবার ফিরিয়ে আনেবী, যা হোক জিড়িয়ে বাঁচলাম, এখন আমার ভরত এলে বাঁচি"[২]।

১, ২। ভরতাগমন—প্রাগুক্ত; পৃ, ১০৫, ২৩

'সীতাহরণ গীতাভিনয়টিতে' রামচন্দ্রের অগস্ত আশ্রমে আগমন থেকে শুরু করে সূর্পণখার নাসিকা কর্ণচ্ছেদ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুর মৃত্যু পর্যন্ত রামায়ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মোটামুটি রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হলেও কিছু কিছু কাল্পনিক কাহিনীও সংযোজন করেছেন। রামচন্দ্রের ভাগবত সত্তা সর্বত্র প্রকাশিত। গ্রন্থের আরম্ভে অগস্ত্য পূর্ণ ব্রহ্মের দর্শন কামনা করেছেন। লক্ষ্মণও জানেন রামসীতা দেবারাধ্য। রাবণ পরম ভক্ত। সূর্পণখার মুখে রাম নাম শুনেই তার ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে—"রাম ! রাম! আহা এমন সুমধুর নাম তো কখনো শুনিনি" নাম শুনে কর্ণকুহর যে পবিত্র হলো"[১]।

সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসার সময় জটায়ুর সঙ্গে উক্তি প্রত্যুক্তিতে ভক্ত রাবণের আর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। সপরিবারে ভবসমুদ্র পারে যাওয়ার জন্যই সে সীতাকে লংকায় নিয়ে গেছে— "একাই ভবসমুদ্র পারে যাব ? এই সূত্রে সপরিবারে পারে গমন করব। সেইজন্য তরণী লয়ে যাচ্ছি [২]।

এ কোন রাবণ, এযে পরমভক্ত সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধ ভক্ত ভগবানের লীলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ভক্তি-রসের প্লাবনে নাটকীয় রস ব্যাহত হয়েছে। অথচ ঘটনায় নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। ভক্তিরসের আকুল পাথারে নিমজ্জিত হয়ে লেখক সেই সুযোগ গ্রহণ করেন নি। একমাত্র সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন অংশে কিঞ্চিৎ হাস্যরস ও নাট্যরস পরিবেশিত হয়েছে।

'রাবণ বধ গীতাভিনয়' পরমভক্ত রাবণের ভগবান রামচন্দ্রের হাতে মহামুক্তির কাহিনী। এই গীতাভিনয়টিতে লক্ষ্মনের শক্তি-শেলাঘাতে মূর্ছা যাওয়া থেকে রাবণের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক রামায়ণ এবং পুরাণ কাহিনী ছাড়াও অন্যান্য বহু লৌকিক কাহিনী সন্নিবেশিত করেছেন।

১, ২। সীতাহরণ, শ্রী মতিলাল রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ১৩১৯ সাল, পৃঃ ৩৮।

অন্যান্য পালার ন্যায় এই পালাটিতেও ভক্তি-রসের আতিশয্য ঘটেছে। রাবণ, সুর্পণখা, শেষ মুহূর্তে তপস্বিনী হয়ে রামারাধনায় আত্ম নিয়োগ করেছে। মহাদেব স্বীয়গুরু রামচন্দ্রের ভক্ত। রামচন্দ্র ও ভগবতী মহামায়ার ভক্ত এবং মহাদেবেরও উপাসক। হরপার্বতীর ঘটনায় লেখক তুলসী দাসী রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কাহিনীর সর্বত্র দেবতাদের অবাধ সঞ্চরণ, বহু দেবতার একত্র সম্মিলন ও যুগল মিলন দেখিয়ে লেখক শ্রোতা ও দর্শকদের মন ভক্তিরসে পরিপূর্ণ করেছেন। মতিলাল রায়ের ভক্ত রাবণ সম্বন্ধে ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "লেখক রাবণকে কোন অসভ্য দানবরূপে বর্ণনা করেন নি। ঁার রাবণ পরমভক্ত, জ্ঞানী এবং সুসভ্য জাতির এক অমিত শক্তিধর নায়ক[১]।"

ভক্তিরসের আতিশয্যের মধ্যেও লেখকের স্বকপোল কল্পিত কয়েকটি কাহিনীতে আধুনিক যুগ মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন রাবণের শক্তি বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করতে ইন্দ্র ও চন্দ্র বলেছেন দেবতাদের অনৈক্যই তাদের সর্বনাশের মূল —"দেবতাদের মধ্যে ঐক্য থাকেতো তা হলে কি আর এত যাতনা পাই। কোথায় সমুদ্র পারে এক বেটা বাস করতো সে কিনা আমাদের অধিকার কেড়ে নিলে"[২]।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রা লিখতে গিয়ে লেখক ভারতের পরাধীনতার কারণ নির্দেশ করেছেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অনৈক্যও বিচ্ছিন্নতা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার অন্যতম কারণ। আর একটি কাহিনীতে রাবণ রামচন্দ্রকে বধ করার জন্য মাটির নীচে গর্ত করে যজ্ঞ আরম্ভ করে। এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে পারলে রাবণকে কেউ বধ করতে পারবেনা রামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে বানরেরা এই যজ্ঞ পণ্ড করার ব্যবস্থা করে। যজ্ঞস্থল দেখিয়ে দেওয়ার জন্য হনুমান চুপি চুপি সরমার কাছে গিয়ে নির্দেশ দেয় যে বানরেরা এলে সরমা যেন সমার্জনী হস্তে স্থান পরিষ্কার করার ছল করে তিনবার আঘাত করে দেখিয়ে দেয়।

১। যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়, ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য. পৃ ৫৭।

২। রাবণ বধ গীতাভিনয়—মতিলাল রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৩ সাল, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, পৃ ৭।

সর্বশেষ কাহিনীটি হল হনুমান কর্তৃক মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ করা। মন্দোদরী প্রথমে পুত্র মেঘনাদ ও স্বামী রাবণের নাম করে বিলাপ করতে থাকে। কিন্তু হনুমান যখন কিছুতেই তাকে ছাড়েনা তখন রাণী মন্দোদরী শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করতে লাগলেন। এবার হনুমান বুঝল রাণী মন্দোদরীও রামচন্দ্রের ভক্ত। এখন হনুমানের অনুশোচনা হল, সে মনে মনে ভাবল মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ করার ফল তাকে ভোগ করতে হবে। "যে মায়ের উদ্ধারের জন্য আমি এত করলাম সে মাতার সঙ্গে রামের সম্মিলন কখনো হবেনাঃ আমার মন যেন আমাকে ডেকে বলছে হনুমান! কাজ ভাল করনি"[১]।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণের ছায়াবলম্বনে এই গীতাভিনয়টির শেষাংশে, রাবণ ও মন্দোদরীর কথোপকথনে ভারতীয় দর্শনানুযায়ী রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। রাম জীবাত্মা, সীতা ভক্তি, পঞ্চবটী পঞ্চভূতময় দেহ, সুর্পণখা স্পর্দ্ধা এবং দূষণ মদ ও মাৎসর্য, আর রাবণ যেন এদের সহকারী অহঙ্কার।[২]

রাবণ বধের পর রামচন্দ্রের সিংহাসনে আরোহন পর্যন্ত রামায়ণ কাহিনী 'রাম রাজা' গীতাভিনয়ে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য পালার ন্যায় এ পালাটিতেও সংলাপের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—ভক্তিরস পরিবেশনই মুখ্যতর উদ্দেশ্য। পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে লাভ করতে হলে কি যে ভক্তি, কি যে ব্যাকুলতার প্রয়োজন তা এই গীতাভিনয়ের ছত্রে ছত্রে দেখান হয়েছে। সাধনার বিভিন্ন পর্যায়গুলিও এখানে সুপরিস্ফুট। ভরদ্বাজের সাধনা তত্ত্বজ্ঞানীর, বিভীষণ ও গুহকের সাধনা সখ্যভাবের, কৌশল্যা, কৈকেয়ী. সুমিত্রা এবং সরমার বাৎসল্যভাবের। ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাবের এবং হনুমানের দাস্যভাবের সাধনা। ভক্তি ও ত্যাগের অপূর্ব সমণ্বয় হয়েছে প্রত্যেকটি চরিত্রে। ভক্তি ও করুণরসের আতিশয্যের ফলে দর্শক ও শ্রোতাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে। সীতার অগ্নি পরীক্ষা ও রামের রাজা হওয়ার দৃশ্যে দেবতারা সব মর্তে নেমে আসায় স্বর্গ মর্ত্যের দুস্তর ব্যবধান লুপ্ত হয়েছে। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের সমন্বয়ও হয়েছে এই পালায়।

১, ২। রাবণ বধ গীতাভিনয় মতিলাল রায়, প্রাগুক্ত পৃ, ১৩, ১৪, ৪৮।

নাট্যকার অদ্ভুত রামায়ণের অনুসরণে মন্দোদরীর গর্ভে সীতার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন আর বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হওয়ার ইঙ্গিতের মত সীতার পরজন্মে রাধারূপে আবির্ভূত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণরূপে বর্ণনা করে এবং কৈকেয়ীর প্রতি রামচন্দ্র এবং কৌশল্যার সহানুভূতি আকর্ষণ করে নাট্যকার কৈকেয়ী চরিত্রের নিষ্ঠুরতা অনেকটা লাঘব করেছেন। এই নাটকে কৈকেয়ী শ্রেষ্ঠ রামভক্তরূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

'লক্ষ্মণ ভোজন' গীতাভিনয়টিতে চতুর্দশ বর্ষব্যাপী অনাহারী, সংযম ব্রতধারী বীর লক্ষ্মণের ব্রত ভঙ্গের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র রাজা হওয়ার পর মহর্ষি অগস্ত্যের মুখে শুনলেন যে চতুর্দশ বর্ষব্যাপী আহার নিদ্রাত্যাগী সংযতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ না হলে ইন্দ্রজিৎকে বধ করা সম্ভব হতো না। বিস্মিত শ্রীরামচন্দ্র তখন সর্বসমক্ষে লক্ষ্মণের এই ব্রতানুষ্ঠানের সত্যতা পরীক্ষা করলেন। রাজসভায় ফল আনা হলে চতুর্দশ বৎসরের আহার্য ফলের একটি কম পরল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রের কাছ থেকে দূরে পালাবার চেষ্টা করলেন। আনন্দমুখর অযোধ্যায় আবার বিষাদের কাল ছায়া নেমে এল। শেষ পর্যন্ত গুহকের রামভক্তিতে ও শ্রীরামচন্দ্রের লুপ্ত স্মৃতির পুনরাবির্ভাবে শেষ রক্ষা হল। এই অংশটি লক্ষ্মণ চরিত্রের সংযম, দৃঢ়তা ও ভ্রাতৃভক্তিতে সমুজ্জ্বল। চতুর্দশ বৎসরের ফল রাজসভায় নিয়ে আসার প্রসঙ্গে হনুমানের দর্পচূর্ণ বর্ণিত হয়েছে। গন্ধমাদন পর্বতবাহী হনুমান মনে মনে অহঙ্কার করায় দর্পহারী হরি শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছায় লক্ষ্মণের সঞ্চিত ফলাধারটি তুলতে সে অক্ষম হয়েছে। লক্ষ্মণের ব্রতানুষ্ঠানের সত্যতা পরীক্ষার পর রামচন্দ্রের আদেশে সীতাদেবী লক্ষ্মণকে স্বহস্তে খাওয়ালেন। লক্ষ্মণ ভোজন সমাধা হল। এর পরে সীতার দর্পচূর্ণ বা হনুমান ভোজন। পরিতৃপ্তি ভরে হনুমানকে ভোজন করাতে গিয়ে সীতাদেবীর খাদ্য ভাণ্ডার নিঃশেষিত হল। সীতাদেবী তখন ধ্যানস্থ হয়ে জানতে পারলেন স্বয়ং কৈলাশেশ্বরকে তিনি আহারে বসিয়েছেন। মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করে সীতাদেবী হনুমানের মাথায় দিলেন অন্ন। এবার আহারে তৃপ্তি হল।

লক্ষ্মণ ভোজনে, লক্ষ্মণ চরিত্রের মহিমা কীর্ত্তন মূল লক্ষ্য হলেও রাম,

লক্ষণ, সীতা, হনুমান, বিভীষণ, গুহক এবং সকলেরই চরিত্র মহিমা এতে দেখান হয়েছে। রামচন্দ্রের মহিমা কীর্তনে অন্ধের অন্ধত্ব এবং খঞ্জের খঞ্জত্ব দূর হয়েছে। এই পালাটিতে আগামী জন্মে রামচন্দ্র যে লক্ষ্মণের অনুজ কৃষ্ণ এবং লক্ষ্মণ সংকর্ষণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন লেখক তাও ঘোষণা করে গেছেন—

"পুনর্জন্মেও কাটবেনা ভাই এ বন্ধন
তখনি দেখিবে সবাই
হব হে তোর কনিষ্ঠ ভাই।"[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোক মনোরঞ্জক আখড়াই, হাফ্ আখড়াই ও দাঁড়া কবির গান রচনা করতে গিয়ে মনোমোহন বসু রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী গ্রহণ করেছেন। রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি গান ও রাজ্যাভিষেক নাটক রচনা করেছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের অনির্বচনীয় রূপ ও অপার মহিমা কীর্তন করে লেখকের গীতিকাব্য—

নবজলধর রাম রঘুবর বিরাজে অযোধ্যা মাঝে!
কিবা বিরাজে অযোধ্যা মাঝে!
হর শরাসন করিয়ে ভঙ্গ মিলিও হেমাঙ্গী জানকী সঙ্গ।
পরম পবিত্র প্রণয় প্রসঙ্গ অপরূপ রূপ সাজে![২]

রামের সিংহাসন আরোহন উপলক্ষ্য করে আখড়াই গানের উপযুক্ত আর একটি গীতি কবিতায় রাম রাজার গুণগান করা হয়েছে,

সুখের সাগরে পরাণ ভেসতেছে!
রাম রাজার গুণ হিদে জেগতেছে?[৩]

এখানে ভেসতেছে, জেগতেছে, হিদে প্রভৃতি গ্রামীন শব্দ ব্যবহার করে লেখক গানটাকে লোক-মনোরঞ্জনের উপযুক্ত করেছেন। অযোধ্যার নব রাজা নব রাণী রামসীতাকে নিয়ে অযোধ্যাবাসীর উল্লাস বর্ণিত হয়েছে

১। লক্ষ্মণ ভোজন, প্রাগুক্ত পৃ, ৬৯।
২, ৩। মনোমোহন গীতাবলী—মনোমোহন বসু, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১২৯৩, পৃ, ১১৬, ১১৭।

"নব রাজা নব রাণী শ্রীরাম জানকী, নবছাঁদে মনোসাধে সাজাইব সখী
হেরিলে যুগল অঙ্গ রতি কামে হবে ভুল,[১]

আর একটি গানে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে শুধু অযোধ্যাবাসী নয় চরাচর বিশ্বপ্রকৃতিও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রভাতে সুরভি অতি সমীর সুধীর গতি তব যশঃ বহে অনুমানি।
বিহঙ্গ ললিত স্বরে, জগত উল্লাস করে সুধাসম সেই কলধ্বনি।
তেমতি তোমার ভাষা, শুনিতে করিছে আশা, কত রাজা কত ঋষি মুনি।[২]

রামের সিংহাসন আরোহণ সংবাদে যেমন অযোধ্যাবাসী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, তেমনই রামের বন গমন সংবাদে সমগ্র অযোধ্যাবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। জননী কৌশল্যার মাতৃহৃদয়ের আর্তি অযোধ্যার পৌরজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অযোধ্যাবাসের সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে তারা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসে যেতে চায়।

রামায়ণ, মহাভারত এই দুই মহাকাব্য অবলম্বন করে কেবল নাগরিক সাহিত্য গড়ে উঠে নাই, ভারত তথা বাংলার সুদূরতম, নিবৃততম পল্লীর কুটিরে কুটিরে পল্লী কবির কণ্ঠে কণ্ঠে অজস্র কলসঙ্গীতে মুখরিত হয়েছে অমৃত নিষ্যন্দী কাহিনী। কত কথা, কত কাহিনী, কত সঙ্গীত হয়েছে রচিত। পটুয়া, ঝুমুর, টুসু, সাথীগান, সারিগান, ভাদুগান, নৌকা বাইচ প্রভৃতি পল্লী বাংলার এক একটি বিশেষ আঞ্চলিক সঙ্গীত ও রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে রসসমৃদ্ধ হয়েছে। এইভাবে রামায়ণ কাহিনী বাংলা সাহিত্য তথা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে হয়েছে ঘনসন্নিবদ্ধ—বাঙ্গালীর নিত্য জীবন হয়েছে এতে প্রতিফলিত।

বাংলার শুদূর পল্লী অঞ্চলে পটুয়া গান এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। সাধারণতঃ পটুয়া গানের বিষয়বস্তু ছিল রাধাকৃষ্ণের যুগল লীলা, হরপার্বতীর লীলা, অন্যান্য দেবদেবী ও বহু লৌকিক কাহিনী। আবার কোন কোন পটুয়া গানের বিষয়বস্তু ছিল রামলীলার বিভিন্ন অংশ। এসব

১, ২। মনোমোহন গীতাবলী, প্রগুক্ত, পৃ, ১১৮

রামলীলা কীর্তনে শ্রীরামচন্দ্রের ঐশ্বর্যগুন কৃষ্ণ চরিত্রের প্রভাবে লুপ্ত হয়ে মাধুর্যগুণে পরিণত হয়েছে। তবে শ্রীকৃষ্ণ কাহিনীর মত এগুলি রসপ্রধান নহে, পারিবারিক কর্তব্য প্রধান। এসব পটুয়া কবিরা কোন নাগরিক সভায় সম্বর্ধনা লাভ না করলেও এদের অশিক্ষিত বলা চলে না। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীতে এদের ছিল অসাধারণ জ্ঞান।

একটি পটুয়া গানে রাজা দশরথের সঙ্গে জটায়ু পক্ষীর মিত্রতা বর্ণিত হয়েছে।

আর একটি পালাগানে অন্ধ মাতা-পিতার পারণের জল আনতে সিন্ধু মুনির মন কিছুতেই এগুতে চাইছিল না, কিন্তু মাতা-পিতার অনুরোধে তাকে শেষ পর্যন্ত জল আনতে যেতে হল—

পুত্র—আজ তো যাবোনা পিতা কি আছে কপালে।
পিতা—যাওরে, বাপ, গুণের সিন্ধু কররে গমন।
কালকে গিয়াছে একাদশী আজ ব্রাহ্মণ-ভোজন।[১]

এই পটুয়া গানটিতে সিন্ধু যেন তার আসন্ন মৃত্যুর কালছায়া দেখতে পেয়েছিল। তাই সে নদীতে জল আনতে যেতে সম্মত হয়নি। কিন্তু নিয়তি অলঙ্ঘনীয়, তাকে সেদিকে যেতেই হল। এছাড়াও কয়েকটি পটুয়া গানে রাজা দশরথের প্রতি বিশ্বামিত্রের অভিশাপ এবং শ্রীরামচন্দ্রের তারকাবধ বর্ণিত হয়েছে।

পরের পুত্র মেরে যেমন রাজা পরের প্রাণ কাঁদালি
এখন নিজের পুত্র বনে দিয়ে নিজ প্রাণ ত্যজিবি''।[২]

শ্রীরামচন্দ্রের তাড়কা বধে বর্ণিত হয়েছে—

''উপরে হয়েছে রবির তাপ, নিচে খর বালি।
চলিতে না পারেন রাম প্রাণের বিজুলী।
রাম, ধরো গো তরু ডাল, লক্ষ্মণ ধরো গো শিরে।
ইয়ার, ইয়ার, বলে রাম যাও ধীরে ধীরে।
ছয় মাসের পরে যাবোনা, মুনি ছয় দিনে চলে যাব।
কেমন যে তাড়কা বধ দুই ভায়ে দেখিব।

তাড়কা বীর পড়ে কেমন পর্বতের সমান।
তাড়কাকে দেখে রাম ধনুকে জুড়েলেন বাণ
শত শত বাণ মারে তাড়কা ধরে খাই।
রাম-লক্ষ্মণ বনে তখন তাড়কা বধ হয়।"[১]

আদিবাসীদের প্রেম সঙ্গীত ঝুমুর গানে কৃষ্ণ লীলার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য ধর্মাশ্রয়ী রামলীলা কাহিনীও প্রবেশ করেছে। রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ হনুমানের বীরত্ব প্রভৃতি রামলীলা ঝুমুরের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে এগুলি রচিত হলেও এর মধ্যে পূর্বাপর রামায়ণী কথার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। কবি কল্পনা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এগুলি রচনা করেছে। কয়েকটি ঝুমুর গান নিম্নে উদ্ধৃত করে দেখান হল[২] —

(১) নারী না হয় আপন কত করিগো যতন।
নারীর জন্য মরে গেছে লঙ্কার রাবণ,
ঐ নারীর জন্য লঙ্কাপুরে হল মহারণ,

(২) কেকয়ের মন্ত্রণা ভরতে জানেনা,
নয়লে মারিতাম বেতের বাড়ি,
রাম যাবে বন ভরত না জানে
নয়লে ঘর হইতে দিত তাড়িয়ে।।

(৩) রাম যদি যাবি বন সঙ্গে নেরে,
কোথায় পাবি ও চাল বাতিরে
কোথা বন স্থল কোথা পাবি জল।[৩]

(৪) শালুক ফুলে বলে, রে ভাই,
আগম দরিয়ায় ভাগেরে মণ বাঁধিব কিসে?
কণ্ঠার উপর কুঠরি দরজার উপর আয়নারে,
সেই দেখে দেখে পর সিন্দু হয়ে দিশা হারারে।

১। বঙ্গীয় লোক সঙ্গীত রত্নাকর, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪৭।
২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ছয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২২
৩। প্রাগুক্ত, পৃ, ৭২৪-২৫, ২৭।

মন বাঁধব কিসে, পিয়া পরদেশে গো ।।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই, নয়ণেরি তারারে
বনে বনে ঘুরে বেড়ায় হয়ে সীতা হারা রে ![1]

প্রথম পালাটিতে কবি নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। যত চেষ্টা যত যত্ন করা হোক না কেন সহজে নারীর মন জয় করা যায়না।

তৃতীয় পালাটিতে ভেতো বাঙালী অরণ্যচারী হওয়ার সময় চাল ও জলের অভাবে রামচন্দ্রের কষ্ট হবে বলে দুঃখ প্রকাশ করছে। এই সঙ্গীতটিতে কবি বাটির পরিবর্তে লৌকিক ভাষা 'বাতি' ব্যবহার করেছেন।

চতুর্থ সঙ্গীতটিতে কবি কল্পনা সুদূর প্রসারী। কবি এখানে সুন্দর উপমার সাহায্যে পত্নী বিরহী শ্রীরামচন্দ্রের মনোবেদনা বর্ণনা করেছেন।

বীরভূম অঞ্চলের লোকসঙ্গীতে রামায়ণ কাহিনীর একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। এতে দশরথের সঙ্গে জটায়ুর বন্ধুত্ব, দশরথের সিন্ধু বধ, রাম-লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতির জন্ম, রামচন্দ্রের তাড়কাবধ, রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহ, রামের বন গমন এবং সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এই সঙ্গীতগুলির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

অজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ।
শোভা করে বসলেন রাজা লয়ে প্রজাগণ ।।
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পায়।
গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট ঘরের লক্ষ্মী উড়ে যায় ।।
০ ০ ০
পুত্র যদি আছে রাজা নিপুত্রিয়া হবি।
পুত্র যদি নাই তোর চার পুত্র পাবি ।।
একথা শুনে রাজা রাণী আনন্দিত হলো।
মরা সিন্ধুক কোলে নিয়ে নাচিতে লাগিল ।[2]

এখানে রামায়ণ কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি একটি চিরাচরিত সত্য প্রকাশ করেছেন। রাজার অন্যায় ও দুষ্কৃত কর্মের ফল প্রজারা ভোগ করে ঠিক তেমনই গৃহিণীর অন্যায় বা পাপাচরণের ফলে গৃহস্থ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়।

১, ২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীতে রত্নাকর, প্রাগুক্ত পৃ, ২৭।

"তালপাতার কঁুড়া খানি খড়িকার টিপ্‌নী,
পথে বসে পাশা খেলে জনক নন্দিনী ।।
খেলিতে খেলিতে পাশা পড়ে ভূমি তলে
রাবণের ভগিনী সূর্পণখা পুষ্পের অন্বেষণে
বিয়া কর, বিয়া কর ঠাকুর রঘুনাথ
আমার বিয়া হইয়াছে লক্ষ্মণের বিয়া নাই
এই কথা বলে গেল লক্ষ্মণের কাছে।
ধেনুকের হুলে সূর্পণখার নাকটি নিল কেটে।
বনের মায়া মৃগ হয়ে মারিচ নাচিতে লাগিল
আনরে দেওর লক্ষ্মণ মৃগটা ধরিয়ে পালিব পুষিব
চৌদ্দ বৎসর হলে মৃগ দেশে লয়ে যাব।
লহ লহ জিহ্বা করে মুখে হুঙ্কার ছাড়ে
স্ত্রী লোকের কথা রাম কর্ণেতে না শুনে।
ধেনুক বাণ লয়ে সবে মৃগের পেছা দৌড়ে
মার-মার, ধর-ধর বলে খেদাড়িয়ে যায়
আদিপুরের বনের স্রোতে মায়া মৃগ দুখান হয়ে গেল।
যোগীর বেশে রাবণ রাজা ভিক্ষার ছলে যায়।
ঘন ঘন ঘটা নড়ে শিঙায় দিচ্ছে সাণ
কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিবে লক্ষ্মী রক্ষা করি প্রাণ
বাটায় করে ফলমূল সাজায়ে সীতা ভিক্ষা লয়ে এল।
কাছে ছিল পুষ্পক রথ সীতা হরে নিল"[১]।

অপর একটি পালাগানে কবি রামের পঞ্চবটী বনে বনবাস যাপন বর্ণনা করতে গিয়ে স্বভাবতই দরিদ্র পল্লীবাসীর খড়ের ছাউনি তাল পাতার কঁুড়ে ঘর গুলিরই বর্ণনা দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ মায়ামৃগ বধ, যোগীর বেশে রাবণের সীতা হরণও একই পালায় বর্ণনা করেছেন 'তালপাতার কুড়াখানি খড়িকার টিপ্‌ণী পথে বসে পাশা খেলে জনক নন্দিনী'' ।[২]

১, ২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৭

আর একটি পল্লী সঙ্গীতে ওস্তাদ জেকের আলী বিমাতা কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন—

"যাবে যদি বনে তবে রাজ বেশ কেনে,
খুলে পড় জটাবাকল, সাজাল, জগৎ স্বামী পাগল,"[১]
কাঁদে সীতা আর লক্ষ্মণ রমের ধরিয়া চরণ।
কি বলিব বিমাতারে সর্ব কর্ম কপালে করে,
তুমি করলে দাস দাসী আজ হব বনবাসী
এখন কথা না শুনিব আমরা তোমার সঙ্গে যাব !
সাজে এরা তিনজন, সীতা আর রাম-লক্ষ্মণ।
ওস্তাদ জেকের বলে ভূমণ্ডলে সৎমায়ের এই গুন[২] ।।

বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চলে নিরক্ষর আদিবাসীদের টুসু গানের কয়েকটি ছড়ায় রামায়ণ কাহিনীর পরিচয় মেলে। অবশ্য কাহিনীগুলি এলোমেলো। পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন। যেমন—

"রাম গেছেন মা মিরগা মারতে পথে পেলেন জোড়া বেল,
কোথাছিল দুষ্টু রাবণ রামের বুকে মারল শেল।
ও রামের মা, রামের মা, রাম কেনে ধুলায় পড়ে,
রামের মা যে অভাগিনী ধুলা ঝেড়ে নে কোলে।
o o o
অশোকবনে পাতার কুঁড়ে সীতা পাশা খেলছে,
মুনির বেশে রাবণ এসে সীতাহরণ করছে।
হরণ করলে ভালই করলে রাখবে সীতা যতনে।
সোনার লংকা ছারখার করবে একাই হনুমানে।
অশোক বনে কানছ সীতা অশোকেরই ডাল ধরে,
কাইন্দনা কাইন্দনা সীতা তোমার রাম আসবে ফিরে।
o o o
রাম পুড়িলে লংকাতে গো রাম পুড়ি ডাহান হাল
নাড়ে না ছাড়ে না রামকে লাল চরণ উঠ্যে গেল।

১, ২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

কেন মরবি রাবণ, রামের নারী সীতারে করে হরণ।
মানুষ নয় রাম রঘুমণি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ
ভাব অবতার তার রূপে করিতে দুষ্টের দমন ।।১

প্রত্যেকটি টুসু গান 'রাম ধরিছেন যজ্ঞের ঘোড়া এই ধুয়া দিয়ে শুরু হয়েছে। অথচ এতে সীতার লবকুশকে রামের ঘোড়া ছেড়ে দিতে বলা ছাড়া রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় কোন ঘটনা নাই। অন্যান্য যে কাহিনীগুলি বর্ণিত হয়েছে তা পূর্বাপর সম্বন্ধহীন। চেইলে (ছেলে) মুড় (মুণ্ডু), বড়শী গাড়া (তীর আঁটা), ডাহান (শোকজ্বালা) প্রভৃতি লোকজীবনে প্রচলিত বহু শব্দ এতে ব্যবহৃত হয়েছে। সবশেষে শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন রূপে দেখান হয়েছে।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলের জনপ্রিয় লোক সঙ্গীত হল 'ভাদু গান'। রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী, রামসীতা, সাবিত্রী-সত্যবান, সুভদ্রা-অর্জুন, উত্তরা-অভিমন্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ভাদু গান রচিত হয়েছে। এছাড়াও আছে বহু লৌকিক কাহিনী। সাধারণতঃ কুমারী মেয়ে ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভাদুরাণীর ব্রতানুষ্ঠানে দলে দলে ভাদু গান করে।

রামের বনবাস সম্বন্ধে ভাদুগান :

রামের হাতে সোনার ছাতি আজ কি রামের অধিবাস।
চৌকাঠেতে লেখা আছে চৌদ্দ বৎসর বনবাস।
রাম না ফিরে বনে যাবে মাকে কেন বলনা।
মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য্য ধরে ও রাম বনে যেয়োনা২ ।

রামসীতার বিবাহ উপলক্ষ্য করে পল্লী কবি দীর্ঘ ভাদু গান রচনা করেছেন—

ও রাম, গুনমণি, কেমন করে ভাঙ্গালি ধনু তাই শুনি।
আমার রামের বিয়ে পাত্র মিত্র ডাক রাজা এইবারে।
পাত্র মিত্র ডেকে রাজা রথ সাজাতে বলিল।
দুটি পুত্র সঙ্গে নিয়ে রাজা রথে চাপিল ॥

১, ২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮১৯—৮২৪।

দুটি পুত্র নিয়ে রাজা মিথিলার পথে গেল ।
জনক রাজা সংবাদ পেয়ে রাজা নিতে আসিল ।।
দশরথ রাজা তখন মিথিলাপুরে গেল
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুটি ভায়ে পিতার কাছে দাঁড়াল
চারটি পুত্র নিয়ে রাজা রাজসভায় বসিল
মিথিলার লোক সবে রাজা দেখতে আসিল ।
জনক বলে ও মুনিবর চারটি পাত্র আইল
দু'ভায়েরি চারটি কন্যা চারটি পাত্রকে দিব ।।
রাজার অনুমতি নিয়ে জনক বিদায় বসিল ।

সীতার বনবাস সম্বন্ধীয় কয়েকটি ভাদুগান উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে—

সীতার উক্তি :

বামেতে আজ সর্প হেরি দক্ষিনে শিবা গণে ।
ঘরের বাহির হলাম কেনে এই ছিল বিধির মনে ।।
শুধাইলে, কওনা কথা নীরব হলে আজ কেনে ।।"

লক্ষ্মণের উক্তি :

মুখে সরেনা বাণী শুন মাতা জানকী ঠাকুরাণী ।
তোর বিসর্জন আমার বর্জন হবে না আমি জানি ।।
তোমায় গহণ বনে তপোবনে কে দিবে আনি ।
আমি মা বলিয়া ডাকবো কারে শুনব কার মধুর বাণী[২] ।।"

সীতার বনবাসের অপর একটি পালায় সীতা সখীদের অনুরোধে ভূমিতে রাবণের মূর্তি অংকন করে তার উপর ঘুমিয়ে পড়েন। রামচন্দ্র নদীর ঘাট থেকে স্নান করে ফেরার পথে সীতাকে ভূমিতলে শয়ান অবস্থায় দেখে হাত ধরে তোলেন এবং মুখ মুছিয়ে দেন। কিন্তু হঠাৎ ভূমিতলে সীতার অংকিত মূর্তিটি দেখে রামচন্দ্র সীতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। লক্ষ্মণকে ডেকে তিনি সীতাকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে একটি পাতার কুটীরে পরিত্যাগ করে যান। তখন সীতাদেবী নিজের

১, ২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ, ১৬১৭-১৮, ১৬১৫, ১৬।

অদৃষ্টের কথা ভেবে করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলেন—

"আনগো ছুরি কপাল বারি, কি লিখেছে ভগবান
আনগো গরল খায়ে মরি আপনি ঘুচাব প্রাণ।
সীতার নামে বড় কষ্ট, সীতা নাম কেউ রেখ্যনা,
হায়রে, জনম দুঃখিনী সীতা পাটে বসতে পাল্যনা
কপালে কলঙ্ক ছিল জলে ধুয়া গেল না।
হায়রে, বিধি, কি লেখোছে মরণ কেন হল্য না [১] ।"

পল্লীকবির অঙ্কিত সীতার বনবাসের আর একটি চিত্র যেমন করুণ তেমনই হৃদয়গ্রাহী। সীতার যমজ পুত্র লব ও কুশ রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে মায়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করার পর আব্দার ধরল মা যেন তাদের যুদ্ধ যাত্রার উপযোগী পঞ্চচূড়া স্বর্ণহার ও স্বর্ণ নূপুর দ্বারা সাজিয়ে দেন—

বাঁধ্যে দাও, মা, পঞ্চ চূড়া গলায় দাও মা স্বর্ণহার,
পায়ে দাও সোনার নূপুর বাজে যেন চমৎকার[২] ॥

পুত্রদের আব্দার শুনে দুঃখিনী সীতার মন কেঁদে উঠল—

'কি বল্লিরে অবোধ শিশু শুনালি দারুণ কথা
জনম দুঃখিনী সীতা স্বর্ণহার পাব কুথা[৩] ।'

সবশেষে যুদ্ধ জয়ী মাতা পুত্রের সংলাপ—

সীতা— "ওরে আমার লবণ চাঁদরে ওরে আমার কুশান চাঁদরে।
কোন বনে বাপ মার‍্যে আলি রামের বুকে দারুণ বাণ" ॥

লবকুশ— 'ভেবোনো ভেবোনা মাগো রামচন্দ্র কার স্বামী।
মারিলে মরিবেনা সে জগতের চিন্তামণি'[৪] ॥

বাংলার পল্লীকবিরা তাঁদের লোকসঙ্গীত কেবল রামলক্ষণ ও সীতার কথা বলেন নি। সীতার সঙ্গে সঙ্গে পতিহারা রাবণের পুত্রবধূদের বিলাপও বর্ণনা করেছেন—

আবার কতকগুলি ভাদুগান সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। একটি ভাদুগানে দেখতে পায় অরণ্যচারী রাম পাহাড়ে উঠেছে অরণ্য ভ্রমণ বা রাক্ষস নিধনের জন্য নয়— জমি জরিপ করার জন্য। হয়ত

১, ২, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬২০।
৩, ৪। প্রাগুক্ত পৃ ১৬২০, ২১, ১৬, ১৬।

পল্লীকবির মুখে মুখে এই সঙ্গীতগুলি রচিত হওয়ার সময় জরিপের কাজ শুরু হয়ে গেছে, সমসাময়িক ঘটনা এতে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার অজয় নদীতে বাণ ডাকলে যে নদী পারাপার করা যায়না তাও কবি বিস্মৃত হননি।

'পাহাড়ে উঠিলে, রামরে, জমি জরিপ করিতে,
এত কেন দেবী হল্য অজয়ে বাণ পড়েছে।
পড়ুক পড়ুক অজয়ে বাণ, মিঠাই ভেঙ্গে জল খাব,
কাঁদছ কিসের সাধের, ভাদু কোলে নিয়ে পার হব।'[1]

'সাখীগান' সাধারণতঃ তরজার মত। একদল প্রশ্ন করে আর একদল উত্তর দেয়। আবার উত্তর প্রত্যুত্তর ছাড়াও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কিছু কিছু সাখী গান পাওয়া যায়।

একটি সাখী গানে রাক্ষসী সুর্পনখার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি হাস্যরসের অবতারণা করেছেন—

নাম তার সুর্পণখা চাউনি বাঁকা কানে মদন কড়ি,
কঁচি (কুচি) করে পরে আছে কমলা পাড়ের শাড়ী।
দেখায় যেন মেঘের মালা নীল কিনারা,
তায় দিয়েছে কোঁচা লম্বা হয়ে পড়ল মাগীর রাম কদলের মোচা
মাগীর ঠম, ঠমকা আড়ে ঘোমটা, আড় নয়ানে চায়।
বুকের উপর পীর পয়দা মুক্তা বেড়া তায়।
তিনি যেন তিলোত্তমা সত্যভামা উর্বশী মেনকা।
মেয়ে রূপে নবরূপে হলেন সুর্পণখা
এলেন রামের কাছে মধুর ভাষে জোর করি হাত."

o o o o

ঐ কথা শুনে দৌড়ে গিয়ে ধরল লক্ষ্মণ সুর্পণখার জটে।
গোটা দুই পাক দিয়ে ভূমে ফেলে টুটে নাক কান।
নাক ভেণ্টা নাকে শোভা টুটে গেল কান।
উঠেছে গুপ্তাচূড়ী ভেড়া দৌড়ে যেন উদাম সাড়ী,
জানকী হাসিয়ে বলে কি হলো লো, রাঁড়ী আহা কেনে বা আইলাম মান হারালাম পঞ্চবটীর বনে।

১। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯১-৯২

প্রায় প্রত্যেকটি লোকসঙ্গীতে রামসীতার পাশা খেলা বর্ণিত হয়েছে। রামসীতার পাশা খেলার সময় সোনার হরিণরূপী মারিচ এসেছিল রামকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে। রাঁড়ী সুর্পণখাও রামসীতার পাশাখেলার সময় রামকে ভোলাতে এল। এই সঙ্গীতটিতে রাক্ষস মেয়ে সুর্পণখার যেমন রূপ তেমনই তার পোষাক পরিচ্ছদ। তার কানে মদন কড়ি। কাঁচি কুচি করে কাপড় পরা। তার কালরূপ আকাশের মেঘমালার মত আর কাপড়ের কোঁচা যেন কলার মোচা। নাক কান কেটে লক্ষ্মণ অভিসারের উপযুক্ত পুরস্কারই দিয়েছে।

আর একটি সারি গানে রামের সঙ্গে লবকুশের উত্তর প্রত্যুত্তর বর্ণিত হয়েছে। এখানে পিতাপুত্র পরস্পরের পরিচয় জিজ্ঞেস করেছে এবং লবকুশ রামচন্দ্রকে বাক্যবাণে নাজেহাল করেছে—

লব—তোমার পাপে পিতা-পিতামহ যত জন ছিল,
আমার বাপের নাম করে পরম ধামে গেল।
তারা সবে মুক্তি পাইল আমার বাপের গুণে,
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর কি কারনে।

রাম—হেন বাপের বেটা যদি বটে দুই জন,
রাজ্য অট্টালিকা বিনা কেন কানন ভ্রমণ।
তৈল কেন গায়ে নাই উড়িতেছে খড়ি,
অন্ন বিনা গাত্র মাংস হয়ে আছে দড়ি।

লব – তুমি কেন বনে গিয়াছিলে হয়ে রাজার বেটা,
স্বর্ণ মুকুট রাখি আবার ধরিলে জটা।
তব পিতা পিতামহের কিবা নাম।

তারপর পিতাপুত্রের মধ্যে আবার কথাকাটাকাটি—

সারিগান আসলে নৌকা বাইচেরই গান। নদীমাতৃক বাংলা দেশে নদী তীরে কেবল সমৃদ্ধ সহর গড়েনি। নদীর কূলে কূলে অসংখ্য পল্লীবাসীও বাস করে। নদীকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন যাত্রা ও শিক্ষা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। নৌকা বাইচ বা নৌকা প্রতিযোগিতা তাদের নাব্য জীবনের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান; এতে বাইচের নৌকাগুলি ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হতে

থাকে। প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে যখন বিজয়ী নৌকা স্বগ্রামে ফিরে আসে তখন মৃদু তালের একপ্রকার সঙ্গীত শোনা যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, হরপার্বতীর দাম্পত্য জীবন, ও বিভিন্ন লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে অনেক সময় রামলীলাও তারা গান করে—

''জয় দেগো, রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে।
ধান্য, দূর্বা, বরণ কুলা, দে তোরা দেগো ওই গলুয়ার কপালে,
নাড়িয়া চাড়িয়া তোমার গোপাল নে যাও ঘরে ।।
সাত সাগরের পার থিকা যে আনছে বরণ মালা,
দুধের বাটি ক্ষীরের নাড়ু আনো থালা থালা ।।
সেই দেবতার দয়ায় আসে তোমার গোপাল ঘরে।
সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্নাম যাই তারে' ।।[১]

অন্যত্র আছে—

'মায়ের কথা মনে হইলরে লক্ষ্মণ ভাই
চল আমরা দেশে যাই।
হেঁইয়া, হেঁইয়া হো'।[২]

সঙ্গীত গুলিতে নৌকা করে রাম গোপালের ঘরে আগমন। রামলক্ষ্মণের মায়ের কথা মনে পড়তে ঘরে ফিরে আসার আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে নৌকাচলার 'সুর হেঁইয়ো হেঁইয়া হো' শোনা যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যের অতি প্রত্যুষযুগে গ্রামীন পরিবেশে গ্রাম্য কবিদের হাতে কবি গানের জন্ম। নিরক্ষর বর্ণজ্ঞানহীন অসংখ্য পল্লীবাসীই ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করত। অবশ্য ক্রমশঃ ইহা গ্রাম ছাড়িয়ে সহরের বাবুদের আসরে প্রবেশ করেছে। বহু লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে কবিগানে পরিবেশন করা হয়। অনেক সময় কবিওয়ালারা আসরে গান রচনা করে উত্তর প্রত্যুত্তর করতেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে রামায়ণ

১, ২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০২৮, ১১১৩

মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করেও তাঁরা গান রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে নীলু ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে কয়েকটি কবিগান রচনা করেন।

অন্ধমুণির শাপে নারায়ণের দশরথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করার বিষয় নিয়ে কবি গানটি এখানে উদ্ধৃত করা হল—

ও মাধব অযোধ্যাপতি আমায় অন্ধ বলে ঠাট্টা করিস না
আমি যোগবলে দেখিলাম ধ্যান করে
আপনি পরম ব্রহ্ম রামরূপে ধরে
জন্মিবেন তোমার ঘরেতে।
তুমি মাগের কথায় বনে দিবে প্রাণের সীতে।
শোকে মরবি বালির পিন্ড খাবি কলার পিণ্ডি পাবি না।
কিসে ভালমন্দ হয় কিছুই ভাবিসনে।
যে জন বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য হয়
তারে কেউ করে না বিশ্বাস
তুইত রাজার বেটা জন্মেছিস
কেন তোরে রেখেছে যম বেটারে করে উপবাস ॥
দশ হাজার বৎসর প্রায়ই তোমার শেষ হল এবার
যম ভবনে তোমার নামে খাতা উঠবে কোনদিনে।
কায়মনেতে অভিশাপ দিতেছি তোরে
রাজা দশরথরে মুনির বাক্য নয় অলঙ্ঘন
বাল্মীকি ষাট হাজার বৎসর অগ্রেতে
করেছেন পুরাণ রচনা আমার আছে সব জানা।
চন্দ্র সূর্য্য আকাশে যদি সব পড়ে খসে।
তবু মুনির বাক্য কোন অংশে মিথ্যা হবে না
সাধ করে কি কল্লেম অভিশাপ মনস্তাপ
এবার কালসাপে দংশিল তোরে
তাগা বাঁধবি কোন খানে [১] ॥

১। প্রাচীন কবিওয়ালার গান, শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র পাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ, ২৮৩।

কবি রামজী দাস কবির-লহরে সীতার জন্ম কাহিনীর উপর তীব্র কটাক্ষ করেছেন—

আমি তোকে ত্রেতা যুগের কথা কিছু জিজ্ঞাসি এখানে
সেই সীতার জন্ম বিবরণ হয়েছে কেমন,
ওরে কার যৌবনে সে হল কি প্রকার
এই সেই তদন্ত কও দেখি একবার
কার গর্ভেতে সে জন্মেছিল কে হলো তার মাতা।
ওরে কার গর্ভেতে কি প্রকারে হল সীতা সতী
কে বটে তার জন্ম দাতা পিতা, কেন পৃথিবীতে স্থিতি।
শুনেছি জনক রাজার নাকি লাঙ্গলে উৎপত্তি।
এই কন্যাভাবে নিয়ে তার রাখিল ভূপতি ।।
o o o o
সভার সঙ্গে খাটিবেনা করিবে যে ফাঁকি
আর না পারিলে রামজী সকলি হবে বৃথা[১]।

রামজী দাসের আর একটি কবিগানে সীতা হরণের পর রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণিত হয়েছে—

রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে হনুমান চরিত্রই কবিওয়ালাদের বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তাই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা হনুমান বিষয়ক কবি গানই বেশী পাওয়া গেছে। লালু নন্দলাল হনুমানের সীতা প্রদত্ত ফল ভক্ষণের বিষয়টি নিয়ে কবিগান রচনা করে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন—

আমি তোমায় দিলাম পাঁচটি ফল।
দুটি কেবল দিও শ্রীরাম লক্ষ্মণে
আর একটি দিও স্বর্গের রাজাকে, একটি দিও বাঁদরের গলে।
ওরে পবনের নন্দন শোন আমার বচন
তুমি অবশেষে এই ফলটি করবে ভোজন
তোরে একগোটা ফল খেতে বললাম,
সকল গুলি খেয়েছ।
জ্ঞানবান বীর বাঁদর হয়ে একি করেছ ?
দিলাম রামের জন্য ফল, সে ফল কেমনে তুই খেলিরে পাগল।

১। প্রাচীন কবিওয়ালার গান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৫—৬৬।

বাছা টুঁটিতে লাগয়ে
আঁটা শ্রীরাম বলে ডেকেছ,
তুমি যার সেবক তাকে যে ফাঁকি দিয়েছ
তোর গলাতে আঁটি লেগেছে একটি
পড়ে সমুদ্রতে দণ্ড চার করলি ছটফটি।
সেই রামকে স্মরণ করে বাছা তবে প্রাণে বেঁচেছ।
ওরে সেই রঘুনাথের
দিও গো আমায় নিদর্শন, তুই মিষ্ট আস্বাদে
পাসরি গেলি, বাছা সকল করালি পেট ভোজন।
ওরে সরমা ফল দিলে মোরে
এই দিলাম তোরে শোনরে বাছা হনুমাণ
এই লঙ্কার মাঝে আম বাগান আছে
তোমারে বলি দেই প্রমাণ। যদি যাওরে সেখানে, রাবণে শুনে।
হাতে অস্ত্র ধরে দণ্ডেকে বধিবে প্রাণ।
আর লালু ভনে অশোক বনে তত্ত্ব করতে এসেছ'' ১ ।

এই পালাটিতে লোভী, পেটুক হনুমানের প্রতি সীতাদেবীর মৃদু তিরস্কার বর্ণিত হয়েছে। দাশরথী রায় তাঁর রামায়ণ পাঁচালীতে হনুমানের সীতা প্রদত্ত সমস্ত ফল ভক্ষণের অনুরূপ একটি পালাগান রচনা করেছেন।

হনুমানের ফল আনয়ণ নিয়ে লালু নন্দলাল আরও কয়েকটি কবিগান রচনা করেছেন। কবিগান গুলিতে হনুমানের বিভিন্ন বীরোচিত কার্যের যেমন প্রসংশা করা হয়েছে তেমনই ফলের ধরা আনতে না পারায় শ্রীরামচন্দ্র তাকে তীব্র ভৎসনা করেছেন। প্রসঙ্গত বাঁদর জাতির স্বভাবেরও এতে পরিচয় আছে। গানগুলিতে নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে বলে সকল শ্রেণীর শ্রোতা ও পাঠকের উপযুক্ত হয়েছে। এ ধরণের কিছু কিছু শারিগান নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

'লোকসঙ্গীতের' ন্যায় রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লোকনৃত্যও গড়ে উঠেছে। রামায়ণ বিষয়ক লোকনৃত্য গুলির মধ্যে

২। প্রাচীন কবিওয়ালার গান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫২-৫৩।

ছৌনাচ ও পুতুল নাচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুরুলিয়া জেলায় বান্দোয়ান এবং মেদিনীপুর জেলার বীনপুর থানায় প্রধানতঃ বাঁশপাহাড়ী ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে ছৌনৃত্যের এবং দক্ষিণ পশ্চিম চব্বিশ পরগনায় পুতুল নাচের প্রাধান্য দেখা যায়। ছৌ নাচে চরিত্রানুযায়ী মুখোশ পরে একটার পর একটা দৃশ্যের নৃত্যরূপ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ হরধনুভঙ্গ রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ, হনুমানের লঙ্কাদাহন, গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন প্রভৃতি চমকপ্রদ দৃশ্য ছৌনাচে দেখান হয়। ছৌনাচে হনুমানের একটি নিজস্ব ভূমিকা ও হনুমানের উল্লেখ করা হয়েছে—

'সিন্দুরের বিন্দু গণেশ বাহন।
সর্ব দেবে বন্দি আগে গণেশ চরণ ॥
শীঘ্র করে এস হনুমান পবণনন্দন
শনির দৃষ্টে মুণ্ড উড়ে কিসের কারণ
আসিছেন বীর হনুমান পবন নন্দন
গণেশ দেবের মুণ্ড উস্তে সিসের কারণ
হস্তীর মুণ্ড কেটে হনুমান গণেশে দেয় জীবন' ॥[১]

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় গণেশের সঙ্গে হনুমানের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু বাংলা লৌকিক পুরাণে সব অসম্ভবই সম্ভব এবং জগতের সব অসাধ্য-সাধনের কর্তা হনুমান। সেই সূত্রে গণেশের মুণ্ড যেদিন উড়ে গেল সেদিন বাংলার গ্রাম্য কবি হনুকেই তার প্রতিবিধান করার জন্য ডাকলেন, আর কাকেও নয়, এমন কি পিতা শিব ও মাতা পার্বতীও তার কোন প্রতিবিধান করতে পারলেন না। আর ঐরাবতের মুণ্ড কেটে আনার মত ক্ষমতাই বা কে রাখে?

বাংলার ছৌনাছ যে কত পুরাতন তা আজও স্হিরীকৃত হয়নি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার ছৌ নাচের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা, সুদূর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশের নৃত্যের আঙ্গিকগত ও বিষয়বস্তু গত সাদৃশ্য

১। বাংলার লোকনৃত্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য. ১ম সং, এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং ১৩৮৩, পৃঃ ৪৬।

লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ছৌনাচের একটি আঞ্চলিক সীমাও নির্দেশ করেছেন। সমগ্র অঞ্চলটির যদি একটা সীমানা নির্দেশ করা যায়, তবে বলতে পারা যায় যে পশ্চিম বাংলা তার উত্তর পশ্চিম সীমা, শ্রীলঙ্কা তার দক্ষিণ পশ্চিমসীমা, এমনকি দূর প্রাচ্যে জাপান তার একেবারে পূর্বসীমা'।১

ছৌনাচের মত পুতুল নাচও একটি সুপ্রাচীন নৃত্যানুষ্ঠান। পুতুল নাচের প্রতিটি চরিত্রের জন্য একটি করে পুতুল ব্যবহার করা হয়। নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন গ্রামে একশ্রেণীর নৃত্যশিল্পী পুতুল নাচের মাধ্যমে রামায়ণ কাহিনীকে নৃত্যরূপ দিয়েছে। সাধারণতঃ সীতাহরণ, রাবণ বধ, সীতার অগ্নি পরীক্ষা, সীতার বনবাস, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি দৃশ্যই পুতুল নাচের শিল্পীদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে।

কেবল 'নৃত্য. গীত ও যাত্রাভিনয়ে নয়' পূজা পার্বণ, মেলা ও বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি বাংলার লোক সংস্কৃতি ও লোকজীবনের উপর ও রামায়ণের প্রভাব অসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার গাজোল থানার রাণীপুর গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার করিমপুর থানার বৌড়াদহ গ্রামে হুগলি জেলার বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়া গ্রামে এবং চাঁচড়ার আথন বাজার প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লীতে মন্দিরে মন্দিরে রাম সীতার নিত্য পূজা হয়। এসব মন্দিরে অনেকসময় নিম্নজাতীয় লোকেরাই পুরোহিত হন। রাম নবমী ও অন্যান্য পূজা উপলক্ষ্যে এসব মন্দির প্রাঙ্গনে বিশেষ উৎসব ও মেলা বসে। মেলায় জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসমাবেশ হয় এবং রামসীতার মন্দিরে সকলেই পূজা দেয়। এসব মেলায় প্রতিদিন রামযাত্রা, রামায়ণী কথা গান ও কথক ঠাকুরের কণ্ঠে রামলীলা কীর্তন হয়।

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, স্থান পাত্র ও তাদের আচার আচরণ অবলম্বন করে বাংলার লোক জীবনে বহু 'ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন' রচিত হয়েছে। এগুলির সঙ্গে পৌরাণিক মহাকাব্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই ঠিকই অথচ বাংলার লোক জীবনে রামায়ণী ভাব-ভাবনা ও চরিত্র বৈশিষ্ট যে কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এগুলি।

১। বাংলার লোকনৃত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২।

রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকির রাম-সীতা, ভরত, রাবণ-মন্দোদরী ও কুশ চরিত্র অবলম্বন করে বহু ধাঁধা রচিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। যথা—

(১) "মুখেতে বলিতে রাম আম উচ্চারিল,
কত শত প্রাণী বধ হস্তেতে করিল।
কোন্দলের গুরুর কৃপায পরম তপস্বী,
হইল খ্যাত ত্রিভুবন।
পূর্বে তার মাতা-পিতা যে নাম রাখিল
সে নাম পাইয়া লোপ
কি নাম হইল"

—বাল্মীকি

(২) "পশু সঙ্গে ভ্রমে কিন্তু পশু সেত নয়।
কভু রাজবেশ কভু যোগী বেশে রয় ।।
অসম্ভব কার্য্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মায়" ।।[১]

—রামচন্দ্র

(৩) "বাপ জন্ম দিলা কিন্তু মা ছিলনা কাছে।
ভূমিতে উৎপন্ন বটে নাহি ফলে গাছে ।।
অসম্ভব কথা যদি মানহ সকলে।
এই কথা মিথ্যা নয়, মাটিতেত নারী মিলে" ।।[২]

—সীতা

(৪) "সূর্য্যবংশের জন্ম তার অজ রাজার নাতি,
দশরথের পুত্র, নয় সীতা দেবীর পতি।
রাবণের বৈরী নয়, লক্ষণের জ্যেষ্ঠ,
বুঝিয়া সভার লোক কর নির্দিষ্ট"।[৩]

—ভরত

১। বাংলার লোকসাহিত্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪।
২, ৩। বাংলার লোকসাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১, ৯৩, ৮৫, ৮৫, ৮৯, ৭৮

(৫) "খয়ের ক্ষুদি বাটার পান
স্ত্রী-পুরুষে বাইশ কান।
এ বাটার পান খাবে যে
এ কথার উত্তর দেবে সে"[১]

(৬) পিতা হল মাতা নহে
ভগ্নী হল মাতা,
ভাগ্না হল সহোদর
কোন শাস্ত্রের কথা" ?[১]

—কুশ

প্রবাদ-প্রবচন

রামায়ণের রঘু, রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হনুমান প্রভৃতি চরিত্র ও অযোধ্যা, লঙ্কা, প্রভৃতি রামায়ণের বিশেষ বিশেষ রাজ্যগুলি অবলম্বন করে বাংলার লোকজীবনে বহু 'প্রবাদ-প্রবচন' যুগ যুগ ধরে সৃষ্টি হয়ে আসছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হল। যেমন—

১। অযোধ্যার রঘু, বাঁশ বনের ঘুঘু।
২। একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর।
৩। রামকামারের ধন রাম কামারেই গেল।
৪। রাম খাই কি রাবণ খাই।
৫। রাম খোদা।
৬। রামচন্দ্র বিপদে পড়ে, মরা মাছও জলে চরে
৭। রাম নামে ভূত পালায়।
৮। রাম না হতে রামায়ণ।
৯। রাম পরাণে কানা মাঝ খানে দেয় হানা।[২]

১। বাংলার লোকসাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ, ৯১, ৯৩, ৮৫, ৮৯, ৭৮।
২। ১—৯, বাংলার লোকসাহিত্য, ষষ্ঠ খঃ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, পৃ, ১৪, ৮৩, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০।

১০। রাম মারল ফড়িং, সুজো গেল ফাঁসি।

১১। রাম, রহিম, কালী ভেদ করলেই মানি।

১২। রাম-লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চড়ে স্বর্গে যাই।

১৩। রাম-লক্ষ্মণ দুভাই।

১৪। রামের কুড়ে, লক্ষ্মণের কুড়ে, কিসের কুড়ে মোর গেল উড়ে।

১৫। রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।

১৬। রাবণের গুষ্টি বা রাবণের সংসার।

১৭। রাবণের চুলো বা রাবণের চিতা।

১৮। রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি।

১৯। রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।

২০। রাবণের দোষে হয় সমুদ্র বপান।

২১। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

২২। রামায়ণের মধ্যে বানরের কচকচি।

২৩। রামের বাণে মরা ভাল, বাঁদরের দাঁত-খিচুনি সয়না।

২৪। রামের হনুমান।

২৫। লংকা পোড়া।

২৬। লংকা কাণ্ড।

২৭। লংকা ভাগ।

২৮। লংকার আগুন নিভে, তবু লেজের আগুন নিভে না।

২৯। লংকায় গেলেন দরিদ্র নিয়ে এলেন হরিদ্রা।

৩০। লংকায় রাবণ মরলো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো।

৩১। অতি দর্পে হত লংকা।

৩২। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।

১। ১০—১৭। বাংলার লোকসাহিত্য, ষষ্ঠ খঃ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃ, ১৪, ৮৩, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০।

২। ১৮—৩২। বাংলার লোকসাহিত্য, ষষ্ঠ খঃ প্রাগুক্ত, পৃ, ৫১৮, ১৪৮, ৫২০. ৫২৪. ৪, ১৪।

অষ্টম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর রামায়ণ চর্চা

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর রামায়ণ চর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ পর্বে রামায়ণ চর্চার একদিকে রয়েছে মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবীয় ভাব ধারার শেষ অবলুপ্তির চিহ্ন স্বরূপ কয়েকটি গদ্য রচিত রামায়ণ পুঁথি. অন্যদিকে রয়েছে আধুনিক যুগের প্রস্তাবনা এবং বিভিন্ন যুগসমস্যার ইঙ্গিত। প্রথমোক্ত ভাবধারা অনুযায়ী রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে রঘুনন্দন গোস্বামী ও গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজ দুলাল, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমললোচন দত্ত, হরেন্দ্র নারায়ণ, দ্বিজ মহানন্দ, রাজকৃষ্ণ রায়, হারাধন চট্টরাজ প্রভৃতি কবিদিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশোদ্ভূত রঘুনন্দন গোস্বামী বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের পদাংক অনুসরণ করে তাঁর রামায়ণ কাব্য 'রামরসায়ণ' রচনা করেন. কেবল বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস নহে—বহু পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ ও প্রচলিত লৌকিক কাহিনী ও তাঁর রামায়ণ কাব্যে সংযোজিত হয়েছে। আদিকাণ্ডে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা রাণী গর্ভ ধারণ করার পর প্রতিদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন—

"প্রতিদিন দেখে স্বপ্নে রাণী তিনজন।
যেন চতুর্দিগে ফিরে চক্র সুদর্শণ ॥
চতুর্ভুজ শংখ-চক্র গদাপদ্মধারী।
বেড়ি রহে বিষ্ণু পারিষদ শারি শারি।
স্তুতি করে চতুর্দিগে কত ঋষিগণ।"[১]

১। শ্রীশ্রীরাম রসায়ণ, রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃ, ১২।

এ স্বপ্ন বিবরণ বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসে নাই। চৈতন্য চরিতামৃতে শচীদেবী গর্ভধারণের পর স্বামীস্ত্রীতে এরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন—

"মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি আন রীত।
জ্যোতির্ময় দেহ গেহে লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥
যাঁহা তাঁহা সর্বলোকে করয়ে সম্মান।
ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন দান ॥"[১]

ভাগবতে ব্রহ্মাদি কর্তৃক গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তবের অনুকরণে গর্ভস্থ শ্রীরামের চৌতিশা স্তব বর্ণিত হয়েছে। রামের বাল্যলীলা বর্ণনায়ও কবি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুসরণ করেছেন। শিশু রামচন্দ্র আকাশের চাঁদ দেখে হাতে নেওয়ার জন্য বায়না শুরু করলে বালক রামচন্দ্রের সামনে দর্পণ রেখে তাকে ভুলানোর চেষ্টা করা হয়। চাঁদে চাঁদে মেশামেশির এমন সুন্দর বাৎসল্য চিত্র জগতে দুর্লভ।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাড়কা নিধনে যাওয়ার সময়ও জননী কৌশল্যা পুত্রের দেহে রক্ষা-বন্ধন করেছেন—

মন্ত্র পড়ি পড়ি করে সর্বাঙ্গে রক্ষণ।
অজদেব রক্ষা কর, তোমার চরণ ॥
মণিময়ানু জানুযুগ উরু যজ্ঞেশ্বর।
শ্রী অচ্যুত কটিতট হয়াস্য জটর ॥
হৃদয়ে কেশব বিষ্ণু ভুজর যুগল।
উরক্রম সুখশির ঈশ্বর প্রবল ॥
চক্রধারি হরি অগ্রে পাছে গদাধর।
দুই পাশে খড়গ ধনু ধরি মধুহর ॥
কোনে শঙ্খ ধরি ঊর্ধ্বে গরুড় বাহন।
হলধর পৃথিবীতে করুণ রক্ষণ ॥[২]

এর সঙ্গে গোপীদিগের দ্বারা কৃষ্ণের শরীরে রক্ষা-বন্দন তুলনীয়—

১। শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, গোস্বামী কৃষ্ণদাস বিরচিত, প্রাগুপ্ত, পৃ, ১০৪।

২। শ্রীরাম রামায়ণ, প্রাগুক্ত পৃ, ৩৫।

"ও মোর দুলাল বাছনি বলিয়া
তরিতে করিলা কোলে।
দেব ঋষিকেশ, অচ্যুত মাধব!
গোবিন্দ, বামন, হরি
এসব দেবত্য রাখহ ছাওয়ালে ॥"[1]

কাহিনী বর্ণনায়ও কবি নূতনত্বের আরোপ করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দশরথ সপুত্র গঙ্গাস্নানে এসে গুহককে বন্দী করলে রামচন্দ্র তাকে মুক্তি দেন। তখন উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। রঘুনন্দনের রামায়ণে দেখা যায় মৃগয়া করতে এসে পরিশ্রান্ত রামচন্দ্র এক বৃক্ষতলে উপবেশন করেছিলেন। তখন গুহক এসে রামচন্দ্রের পরিচর্যা করলে রামচন্দ্র খুশী হয়ে তাঁকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করেন—

"তাহাতে কিঞ্চিৎপরে পাইয়া বিশ্রাম।
কহিছেন তাঁর প্রতি কৃপাময় রাম ॥
কে বট কে বট ওহে মধুর আশয়।
দেহ তুমি মোর প্রতি নিজ পরিচয় ॥
বান্ধবের মত কৈলে মোর উপকার।
অতএব তুমি সখা হইলে আমার ॥"[2]

রামচন্দ্রের নৌকায় করে জাহ্নবী পার হওয়ার ঘটনা বর্ণনায় কবি সরাসরি তাঁর পূর্ববর্তী কবি অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের অনুসরণ করেছেন—

বোলয়ে নাবিক প্রভু কহ এ কেমন।
শিলাতে কাষ্ঠেতে ভেদ না হয় দর্শন।
সেই জড় নীরস কঠিন প্রানহীন।
এই সেই মত নহে কোন রূপে ভিন।
যদি তার পদ ধূলি পরশে তোমার।
নারী হবে তবে যাবে জীবিকা আমার।"[3]

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণে আছে—

১। চণ্ডীদাস পদাবলী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ৩০৫।

২, ৩। শ্রীশ্রী রাম রসায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ., ৩০, ৪৯।

নাবিক বলয়ে গোসাঞি না ভাবিহ আর।
ও চরণ ধূলা গুনে শুনি চমৎকার।
পদধূলি লাগে যদি কাষ্ঠে কি পাষাণে।
ততক্ষনে শরীর হয় শুণিয়াছি শ্রবণে।
অতি দীনদুঃখী আমি নৌকা মাত্র পুঁজি
মনুষ্য হইলে মোর কিবা হবে আজি ॥[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের যে পূর্বরাগ নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে কবি তারই অনুসরণে রামসীতার পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন—

"বিরহে কাতর হইল্যা শ্রীরঘুনন্দন ॥
জাগয়ে জানকীরূপ নিরন্তর মনে।
সুখলেশ মাত্র নাহি শয়নে ভোজনে" ॥[২]

অনুরূপ ভাবে সীতারও রামের প্রতি পূর্বরাগ জন্মে—

শ্রীরামের নাম শুনি নিজ সখী মুখে।
স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলা সীতাদেবী সুখে ॥
অনেক বিলম্বে পুনঃ চেতন পাইয়া।
কহ সখী কি কহিলে কহ বিবরিয়া।[৩]

এরসঙ্গে চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদ তুলনীয়—

কিরূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে,
ঘরে যাইতে নাহি মন পরাণ কেমন করে।
নয়ানে লাগিল রূপ কি আর বলিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥[৪]

রঘুনন্দন গোস্বামীর আর একটি বিশেষ কৃতিত্ব রামের বনগমন সময়ে তিনি লক্ষ্মণকে এক পলকের জন্য হলেও বধূ ঊর্মিলার কক্ষে উপস্থিত করেছেন—

"নিজগৃহে শ্রীলক্ষ্মণ করিলা গমন ॥
ঊর্ম্মিলারে কৌশল্যার সেবার ভার দিয়া।
চলিলা শ্রীরাম পাশে অস্ত্রাদি লইয়া ॥[৫]

১। অদ্ভুত রামায়ণ, অদ্ভুতাচার্য ভট্টশালী সংস্করণ, পৃ. ১০৯।
২, ৩, ৫। শ্রীশ্রীরাম রসায়ন— প্রাগুক্ত, পৃ., ৫৪, ১০৩, ২৪৯।
৪। চণ্ডীদাসের পদাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ., ৫৭।

বস্তুতঃ রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়ণ' ঊনবিংশ শতাব্দীর একখানা সুবৃহৎ রামায়ণ কাব্য। কবি সচেতন ভাবেই হোক বা অচেতন ভাবেই হোক রামরসায়ণে কৃত্তিবাস অপেক্ষা তুলসী দাসকেই অধিক অনুসরণ করেছেন। কবির জবানীতেই জানা যায়—

শ্রীমান তুলসী দাস, নিজ রামায়ণ।
উত্তরা কাণ্ডেতে ইহা করেন বর্ণন।[১]

ঘটনাবহুল বহু বৈচিত্রপূর্ণ এই রামায়ণে কবি সর্বত্রই ভক্তিরসের আতিশয্য ঘটিয়েছেন এবং উত্তর কাণ্ডের সীতার বনবাস, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা বাদ দিয়ে তাঁর রামায়ণ কাব্যের বিয়োগান্ত পরিণতি হতে দেননি। একমাত্র রামায়ণ ছাড়া ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও ট্রাজেডির স্থান নেই। অবশ্য বিদ্বজ্জন মনে করেন বিয়োগান্ত পরিনতিমূলক উত্তর কাণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত, বাল্মীকির রচনা নয়।

"গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়" সর্বপ্রথম বাল্মীকি রামায়ণের মূলানুগামী বঙ্গানুবাদ করেন কিন্তু তিনি রামায়ণ অনুবাদ সম্পূর্ণ শেষ করে যেতে পারেন নি, লঙ্কাকাণ্ডের কিছু অংশ অনুবাদ করার পর তিনি কাল গ্রাসে পতিত হন। তাঁর অনুবাদের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল তেমনই হৃদয়গ্রাহী। আদি কবির রচনার সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ তুলনা করলে দেখা যায় তিনি কিভাবে মূলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে সহজ ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেছেন।

গঙ্গাপ্রসাদের ন্যায় রাজকৃষ্ণ রায় ও রামায়ণের মূলানুসারী বঙ্গানুবাদ করেছেন কিন্তু উভয়ের রচনা তুলনামূলক আলোচনা করলে গঙ্গাপ্রসাদের রচনার বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। বাল্মীকি রামায়ণের—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম॥[২]

এই শ্লোকটির গঙ্গা প্রসাদ অনুবাদ করেছেন—

রে দুরাত্মা! কাম মত্ত মিথুন হইতে।
যৎক্রৌঞ্চে বধি অপযশ রাখিলি ভূমিতে॥

১। শ্রীশ্রীরাম রসায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৩৩, ২৪১।
২। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, পৃ, ৭।

এই অপকর্ম্ম হেতু নীচত্ব পাইবি।
প্রতিষ্ঠা ভাজন তুই কভু না হইবি ।।[১]

আর রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদের ভাষা—
"নিষাদ। প্রতিষ্ঠা তুই না পাবি কখন।
কাম বিমোহিত ক্রৌঞ্চে বধিলি যখন ।।[২]

রাজকৃষ্ণ রায় ভাবকে ঘনীভূত করে সমপরিসরে প্রকাশ করেছেন। আর গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে না রেখে রচনা সরল ও প্রাঞ্জল করে প্রকাশ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একখানি খণ্ডিত পুঁথি দ্বিজ দুলালের কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হলেও মাত্র চব্বিশ পাতার মধ্যে পুঁথিটি সপন্ন করেছেন বলে ইহা একটি সার সংকলনে পরিণত হয়েছে। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে পুঁথিটির প্রতিলিপি তৈরী হয়, কাজেই উহা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিবের রচনা হওয়ায় সম্ভব। পুঁথিটির মধ্যে লেখক আত্ম পরিচয় রেখে গেছেন—

আমদানে ঘর মহামণ্ডল সুখ্যাতি
শ্রীবঙ্গ বিহারী রাজ ঘরে পান দীপ্তি।

কবি আমদানে বসে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—

গৌরীকান্ত আত্মজ সুভদ্রা গর্ভোদ্ভব
শ্রীরামরেণুকে সুখে রাখিবে রাঘব।[৩]

তাঁর রামায়ণ সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণে লেখা কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেকটি ঘটনা বর্ণনায় কবি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে অগ্নিসাক্ষী করে মিত্রতা করেছিলেন। তার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল তেমনই সরলতাপূর্ণ। রামচন্দ্র অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্বের সর্ত পাকা করে নিয়েছেন— "সুগ্রীব ইহার সাক্ষী এই

১, ২। বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড. প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬৭,
৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পরিষৎ পুঁথি সংখ্যা, ২৬২৯, পৃ, ২৩।

হুতাশন ।[১] তারা চরিত্রের মধ্যে নূতনত্ব আছে। কৃত্তিবাসের তারা বালিকে ভ্রাতৃবিরোধে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন বালির অমঙ্গল আশঙ্কায়। কিন্তু দ্বিজদুলালের তারা ভ্রাতৃবিরোধ দূষনীয় বলে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে বালিকে নিষেধ করেছিল। কৃত্তিবাসের তারার মতই দ্বিজদুলালের তারা বালিবধের পর পতি শোকে রামচন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিল—

''যেমন কান্দ্যালে মোরে মারি মোর ভর্ত্তা,
তোমাকে কান্দ্যাইয়া তেম্নি জনক নন্দিনী।
ত্যাগ করি যাইবেন যদি সতী আমি।[২]

এই ভাষা যেমন সরল তেমনি রচনা শৈলীও কবির নিজস্ব। কেবল কাহিনী অংশটুকু তিনি কৃত্তিবাস থেকে গ্রহণ করেছেন।

বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণ বিয়োগান্ত পরিণতি বর্জিত। লবকুশের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধের পর রামসীতার মিলন দৃশ্য বর্ণনা করে তিনি তাঁর রামায়ণ কাহিনী শেষ করেছেন। লক্ষ্মণ বর্জ্জন, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা তাঁর রামায়ণে অনুপস্থিত। কবি বাল্মীকি রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বন করে তাঁর রামায়ণ রচনা করেছেন। রচনায় গীতি ধর্মিতা এবং বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে ভক্তি ও বাৎসল্য ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়।

রামের বনগমনের সময় দশরথ ও সপত্নীদের সঙ্গে রানী কৌশল্যার করুণ বিলাপ কৃষ্ণ মথুরায় যাওয়ার পর নন্দ-যশোদা ও গোপীদিগের বিলাপের অনুরূপ—

কৌশল্যা জননী সঙ্গেতে সপত্নী
রামের পশ্চাতে ধায়।
ডাকে উচ্চ স্বরে ফিররে ফিররে
রাম অযোধ্যার প্রাণ ॥
দশরথ রায় অতিবেগে ধায়
ডাকে ঊর্দ্ধ কর করি।
রাখরে বিমান রামের বয়ান
জনমের মত হেরি ॥

১, ২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুঁথি সংখ্যা,—২৬২৯, পৃ, ২৪, ২, ১০

কহে নারীগণ শুনহ রাজন
রাম গেলা বহুদূরে।
তবে রাজা রানী পড়িলা অমনি
অশেষ বিলাপ করে।।"[১]

এর সঙ্গে তুলনীয়—

কৃষ্ণের বচনে নন্দ বিস্ময় মানিল।
অচেতন ভূমিতলে অমনি পড়িল।।
ক্ষন পরে চেতনা পাইয়ে গোপবরে।
একেবারে হল মগ্ন শোকের সাগরে।।
ঘোর রবে কান্দি কহে নন্দ মহামতি।
ওরে বাপ একি কথা কহ বাপধন।।
এস বাপ শীঘ্র কর ব্রজেতে গমন।
আমার জীবন তুমি ব্রজের জীবন।।
মরিবে যে ব্রজবাসী তোমার কারণ।
বৃথা কেন মোরে দাও এতেক যন্ত্রণা।
কেন মোরে কর আর এ বৃথা ছলনা।।
কেন বা কাঁদাও মোরে ওরে যাদু ধন।
তোরে ছাড়ি কিরূপেতে ধরিব জীবন।।[২]

অনুরূপভাবে শচীমাতাও নদীয়াবাসী নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে বিলাপ করেছিলেন। শক্তি শেলাহত লক্ষ্মণের জন্য রামের বিলাপের মধ্যে পদাবলীর কান্ত কোমল মাধুর্যই প্রতিধ্বনিত হয়—

ওঠরে লক্ষ্মণ মেলরে নয়ন
ওরে পূর্ণিমার শশী।
মোরে স্নেহ করি রাজ্য পরি হরি
হইলা কানন বাসী।।

১। সাহিত্য-পরিষৎ, ২য় খঃ পত্রিকা—১৩০২,
বাংলা সাহিত্য, মনীন্দ্রমোহন বসু, পৃ, ১৫৫।
২। শ্রীমদ্ভাগবত, দেবসাহিত্য কুটীর চন্দ্র মজুমদার, পৃ, ৮৪৯।

নয়ন গোচরে রাখিতে আমারে
আমি অঙ্গ, তুমি ছায়া।
কি দোষ পাইয়ে নিদারুণ হয়ে
ত্যাজিলা আমার মায়॥[১]

এখানে কবির রচনা রীতির সহজ সরলতাও চোখে পড়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির জোয়ারে বাঙ্গালীর শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে নব জাগৃতি দেখা দিয়েছিল। তখনও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাটিকে আঁকড়ে ধরে কয়েকজন কবি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে নিঃশব্দে সঞ্চরন করেছিলেন। তাঁদের এই বিরল সাহিত্য সাধনার ফলশ্রুতি হল ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনী প্রভৃতি। এতে আধুনিকতার ছাপ নেই, আছে বিনম্র ভক্তিবাদ।

কমললোচন দত্তের 'রামভক্তি রসামৃত' এইরূপ একটি ভক্তি রসাত্মক রামায়ণ কাব্য। কৃষ্ণ ভক্তি রসামৃতের অনুসরণে কবি রামভক্তি রসামৃত রচনা করেছেন। কবির নিজের মুখেই শোনা যায়—

"এই গ্রন্থমধ্যে রামভক্তি সুধা।
যার পানে নাশ হয় ভব ব্যাধি বাধা।"[২]

কমললোচন দত্ত রামভক্তি রসামৃতে তুলসী দাসী রামায়ণের দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে শক্তির মূর্তিমান দম্ভ ও লোভের প্রতিমূর্তি রাবণও জড়দেহের অসারতা সম্বন্ধে সচেতন ছিল। হনুমান এসে লঙ্কা ছারখার করে দেওয়ার পর রাবণের মন্ত্রীমণ্ডলী সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য অনুরোধ করে। রাবণ তখন তাদের এই নশ্বর দেহের অসারতা সম্বন্ধে বোঝাতে থাকেন—

"এ দেহ অনিত্য আর অত্যন্ত কুচ্ছিত।
দেহের সম্বন্ধ নাহি দেহির সহিত॥

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০২,
২। ৩২৪৩ সং পুঁথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনর্থ দেহের জন্য শত্রুর স্মরণ।
না লইব, রাম হস্তে হউক মরণ ॥...[১]

কমললোচন দত্ত এভাবে তাঁর রামায়ণে সংসারের অনিত্যতা প্রকাশ করেছেন।

কুচবিহারের রাজসভাকে কেন্দ্র করে রামায়ণের যে কয়খানি খণ্ডকাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কুচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের রামায়ণ অন্যতম। তিনি কেবল বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না, ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরাতন পন্থী সাহিত্যিকদের মধ্যেও একজন পুরোধা ছিলেন। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন! হরেন্দ্রনারায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি অন্যান্য রামায়ণ অনুবাদকদের মত তাঁর রামায়ণে বাল্মীকির রচনার সঙ্গে স্বীয় কল্পনার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন নাই। এই প্রসঙ্গে হরেন্দ্র নারায়ণের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় সম্পাদকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে যতদূর সম্ভব সর্গে সর্গে মূল অনুসরণের প্রয়াস পাইয়াছেন...... প্রাচীন লেখকেরা প্রায়ই এ প্রকারে অনুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না? মূলের অল্পমাত্র রাখিয়া নিজ নিজ কবিত্ব প্রকাশে সকলেই সচেষ্ট হইতেন। সুতরাং মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণের এই সংযম বিরল দৃষ্টান্ত।....[২]

বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করলে হরেন্দ্র নারায়ণের অনুবাদ যে কতটা মূলানুগামী তা বোঝা যায়, বাল্মীকির রামায়ণে আছে—

"তাং হরী নাং সহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ।
দিক্ষু সর্বাসু মার্গন্তে হ্যধশ্চোপরি চাম্বরে ॥
বৈনতেয় সমাঃ কেচিৎ কোচিত প্রাণি লোপমা:।
অসঙ্গ গতাঃ শীঘ্রা হরিবীরা মহাবলাঃ ॥
অহন্তু হনুমান্নাম মারুত স্যোবসঃ সুতঃ।
সীতায়াস্তু কৃতে তূর্ণং শেত যোজনমায়তম ॥[৩]

১। ৩২৪৩ সং পুঁথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
২। হরেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাবলী, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত,
কুচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩২৭, ভূঃ পৃঃ
৩। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩৫

হরেন্দ্র নারায়ণ এর আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন—

"কত শত জন কপি সু ভীষণ।
ধনেশ যেমন সুজিত শ্রমে ॥
কত যম সম মহাপরাক্রম।
অতিজিত শ্রম গান গতি ॥
বরুণ সমান কত বলবাণ।
ভয়ানক তান মারুতি অতি॥
বায়ুসম কত বলে মহোদ্ধত
উফারে পর্বত অতি ইঙ্গিতে।
অতিশয় ক্রোধী ঘোরশীলা যুধী
পরম সুবুদ্ধি উদার চিতে ॥
হেনমত কত সহস্রেক শত
মহামহোত কপিপ্রবর।
সীতান্বেষণে পর্বত কাননে
উদ্যানে ভবনে চলে সত্বর ॥"[১]

উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত যে কয়খানি রামায়ণ পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে দ্বিজ মহানন্দের উত্তর কাণ্ড অন্যতম। রামায়ণের রায়বার অংশ বাদ দিলে তিনিই প্রথম রামায়ণ কাহিনীতে হাস্যরসের অবতারণা করেন। অযোধ্যায় রামচন্দ্রের অভিষেকের পর তিনি রাক্ষস ও বানরদের দেশে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তখন বানরেরা রাক্ষসদের এবং রাক্ষসরা বানরদের প্রতি ব্যঙ্গ করে বলে—

বহুদিন ছাড়া দেষখানা গেলে যাবে বাবুআনা,
কাছীম ব্যাঘ্র হবিরে শ্রীগাল ॥
নানা দ্রব্য যতন কৈরে আনিদিবে গৃহিনিরে
তায় যুদ্ধ নহে তার মন।"[১]

রাক্ষসরাও বানরদের এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করল—

তোরা বটীশ পশুজাতি ঘরকন্না পাবি কতি
বাস করিস দুর্জয় কাননে।

১। হরেন্দ্র নারায়ণ গ্রন্থাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪

ফীরিস গাছের ডালে ডালে প্রাণ জায় দৈবে পেলে ;
মায়া মোহ জানবি কেমনে ।।[১]

রাক্ষস ও বানরদের এই উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে কবি তাঁর রামায়ণ পুঁথিতে প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর আর কোন রামায়ণ পুঁথিতে এরূপ হাস্যরস দেখা যায়না। কবির বাক্যবিন্যাস প্রণালীও যেমন সহজ তেমনই অনাড়ম্বর। সাধুভাষার ক্রিয়া প্রয়োগ ত্যাগ করে তিনি প্রচলিত চলতি ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন।

"রাজকৃষ্ণ রায়" বাল্মীকি রামায়ণের সম্পূর্ণ আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি রামায়ণের কাহিনী নিয়ে হরধনুভঙ্গ, অনলে বিজলী (সীতার অগ্নিপরীক্ষা) দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধু বধ, রামের বনবাস, তরণীসেন বধ প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করতে যাওয়ায় তিনি তাঁর রামায়ণের ভাষার সারল্য ও প্রাঞ্জলতা হারিয়ে ফেলেছেন। রচনার সর্বত্র ভাষার দৈন্যতা সুপরিস্ফুট—

তুমি ও যদ্যপি, ভাই। আজি মম সনে।
ত্যজিয়া অযোধ্যাপুরী যাও ঘোর বনে ।।
তাহলে কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।
কাঁদিবেন মহাশোকে দিবস রজনী ।।
কেবল তাঁদিগে ভাই ! করিবে পালন ?
কি হবে তাঁদের দশা ভাইরে লক্ষ্মণ ?[২]

উনবিংশ শতাব্দীতে রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ পুঁথি ছাড়াও রামের বনবাস, জানকীবন্দনা, রামবন্দনা সীতার বনবাস, হনুমানের রামবন্দনা, লক্ষ্মণের শক্তি-শেলে রামের বিলাপ। সীতার স্বয়ম্বর, সীতার অগ্নি পরীক্ষা প্রভৃতি রামায়ণের এক একটি বিষয় নিয়ে বহু কবি পদ রচনা করেছিলেন। এছাড়া বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধা কৃষ্ণের রূপবর্ণনার অনুকরণে বহু কবি রামসীতার রূপ বর্ণনা করেছেন। কেবল রাধাকৃষ্ণ নয় গৌরচন্দ্রিকার শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনারও সাদৃশ্য রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের রূপ বর্ণনায়—

"কি পেখলু অনুপাম রঘুকুল যুব রাজে।
হেন মনে বাসি অভিমানে শশী ।।
রহল জলনিধি মাঝে ।।

মুখ ঝলমল ভুবন উজর।
মকর কুণ্ডল সাজে।
সুরস সশোধর উদঅ করল
নিল জলধর মাঝে ॥"[১]

এর সঙ্গে তুলনীয়—

'কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধনি তীরে উজোর ॥
চঞ্চল চরণ কমল তলে ঝঙ্কার
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রঙ্ক অঘোর ॥
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরনে
অখিল মনোরথ পুর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস বহুদুর।[২]

"শ্রী হারাধন চট্টরাজের" উত্তর শ্রীরাম রসায়ণ রঘুনন্দন গোসামীর রাম রসায়ণের পরবর্তী অংশ। রামায়ণের উত্তর কান্ড অবলম্বণে এই পুঁথিটি রচিত হয়েছে। একে একটি খণ্ডিত পুঁথিও বলা যায়। শ্রীরাম রসায়ণে কবি গুরু বন্দনা, রাম বন্দনা, সর্ব দেবদেবী বন্দনা, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস বন্দনা এবং তাঁর পূর্ববর্তী কবি রাম রসায়ণ রচয়িতা রঘুনন্দন গোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তিনি গ্রন্থারম্ভ করেছেন। রাম সীতার সিংহাসনে আরোহনের পর অশোক কাননে বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে দিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে। নিবিড় সুখের মধ্যেও অযোধ্যার রাজমহিষীর অন্তর আসন্ন বিপদের কালোছায়ায় শিহরে উঠেছে। দিনমনির অস্তাচল গমনে বিরহিনী কমলিনীর

১। ৪৮৩১ সং পুঁথি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। গোবিন্দ দাস পদাবলী ও তাঁহার যুগ, বিমান বিহারী মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ, ১২।

বিষণ্ণতা দেখে সীতা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। সখীরা সীতাকে সুবেশে সজ্জিত করে দিলে দর্পণে নিজের ছায়া দেখে সীতা অন্তরে কেঁপে উঠলেন। কে যেন তাঁকে বলে দিল—

"সীতে তব বেশ বিরচন হৈল শেষ।
তে কারণে অদ্য হেন হইল সুবেশ।"[১]

এর পরে অয়োধ্যার রাজ পরিবারে বিষাদের কাল ছায়া নেমে এল। সীতার অপবাদ শুনে রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসনে পাঠাতে বদ্ধ পরিকর হলেন। লেখক পূর্ববর্তী রামায়ণ রচয়িতাদের অনুসরণে সীতার বনবাস, লবকুশের জন্ম, শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণ বধ, মুনি পত্নীগণের নিকট সীতা সরমার বৃত্তান্ত কথন, তরণী সেনের যুদ্ধ, মন্দোদরী ও মহীরাবণের কথোপকথন, মহীরাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর বিলাপ, মহীরাবণ ও তৎপত্নী প্রিয়ংবদার কথোপকথন, মহীরাবণের মৃত্যুতে তার বিলাপ, এবং প্রিয়ংবদা সকাশে শ্রীরামচন্দ্রের আগমন, প্রভৃতি লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনার রেশ উত্তরাকাণ্ডে টেনে এনে কবি কেবল তাঁর কলেবর বৃদ্ধি করেন নি, অনেক নূতন কাহিনীও সৃষ্টি করেছেন। যেমন শত্রুঘ্ন সীতার সূতিকাগারে প্রবেশ করে সীতাদেবীকে সম্ভাষণ করলেন ও নবজাত লবকুশকে দেখলেন—

"শুনিয়া এতেক তিহঁ উৎসক্যাতি শয়ে।
জানকীর পর্ণশালে প্রবেশ করিয়ে॥
যমজ যুগলে হেরি নয়ন যুগলে।
অভিষিক্ত হইয়া আনন্দ সিন্ধুজলে॥
কহিলেন সম্বোধন করি সীতা প্রতি।
সৌভাগ্য বশতঃ আজ ভুবন মোহন॥
সু প্রশব করিলেন যুগল নন্দন॥"[২]

মহীরাবণের পত্নী প্রিয়ংবদার উপাখ্যানটিও সম্পূর্ণ কবি সৃষ্ট। বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবির কাব্যে রাবণ থেকে শুরু করে মহীরাবণের সদ্য জাত পুত্র অহীরাবণ পর্যন্ত সকলেই রামচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ভক্ত।

১, ২। উত্তর শ্রীরামরসায়ণ, ডঃ হারাধন চট্টরাজ, গুপ্ত প্রেস, ১৩১৪, পৃঃ ১৬, ৮৬।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে পুঁথি রচনার যুগ প্রায় শেষ হয়ে এল। এযুগে আধুনিকতার জোয়ারে বাঙ্গালীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে বাঙ্গালীর সাহিত্য চর্চা অব্যাহত থাকলেও অধিকাংশ লেখকের হাতে সাহিত্যের স্বরূপ পাল্টাতে শুরু করল। আধুনিক জীবনবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এ যুগের লেখকরা রামায়ণের এক একটি খণ্ডাংশ মাত্র অবলম্বন করে কাব্য ও কবিতা রচনায় ব্রতী হলেন। মহাকাব্যের বিরাট পরিসরে রামায়ণের যে সব কাহিনী যে সব চরিত্র আভাসে ইঙ্গিতে ছিল বা একেবারে ছিল না, এ যুগের কবি মনীষিগণ নূতন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সব কাহিনী, সে সব চরিত্র আবিষ্কার করে গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য, আখ্যান কাব্য ও বহু নাটক-নাটিকা, গীতিনাট্য রচনা করলেন। তাই এ যুগে আমরা রামচন্দ্রের পরিবর্তে রাবণকে কাব্যের নায়ক হিসাবে এবং প্রমীলার মত বীরাঙ্গনা নারীকে পাই। ঊর্মিলা, শ্রুতকীর্তি প্রভৃতিও পাঠকের দৃষ্টি গোচর হল। পাষাণী অহল্যার কাহিনী এ যুগের কবি ও নাট্যকারদের হৃদয়কে বিশেষভাবে নাড়া দিল। 'অহল্যা', 'অহল্যার প্রতি', 'রামের প্রতি অহল্যা, ও পাষাণী' প্রভৃতি কাব্য ও নাটক অহল্যাকে নিয়ে রচিত হয়েছে এছাড়া আরও কত কাহিনী কত চরিত্র হয়েছে সৃষ্টি। এক কথায় ঊনবিংশ শতাব্দী রামায়ণ কাহিনীর নব মূল্যায়ন ও নবরূপায়ণের যুগ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে রামায়ণ কাহিনীর সম্পূর্ণ নবরূপায়ণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর চিরাচরিত স্নিগ্ধরসের এরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে মাইকেলের পূর্বে আর কোন কবি সাহসী হননি। কবির এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য অনুসরণ নহে। যদিও কবি বলেছেন তাঁর কাব্য 'Threc Fourth Greek' অর্থাৎ বার আনায় গ্রীক। সত্য বটে ইংরাজী শিক্ষিত কবি হোমার, ভার্জিল মিল্টন, টাসো প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদিগেব দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কাব্যে গ্রীক প্রভাবই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাই বলে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন কাব্য বলা যায় না। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় রীতির সংমিশ্রণে মাইকেলের কবি ধর্ম বিকশিত হয়েছিল। ম্যাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' সম্বন্ধে সমালোচকদের অভিযোগ এই যে তিনি আর্যকুল গৌরব

রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করে রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন এবং রামায়ণের মহাবীর লক্ষ্মণকে কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত করেছেন। তাঁর কাব্যের এই পালাবদল সম্বন্ধে তিনি নিজেই কৈফিয়ত দিয়েছেন—

I despaire Ram and his rabble, but the idea of Ravana elevates and hindless my imagination. He was a grand fellow."[১] রাজনারায়ণ বসুকে তিনি আরও লিখেছিলেন, নাম ও মূল গল্প ছাড়া তিনি আর কিছু রামায়ণ থেকে নেননি।

'মেঘনাদ বধ' কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ইহা উৎকৃষ্ট কাব্য কিন্তু মহাকাব্যের উপযোগী পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি মহাকাব্যোচিত ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারেন নি। রামায়ণের বীর চরিত্রগুলিকে তিনি ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় অঙ্কিত করেছেন। মেঘনাদ বধ কাব্যকে মহাকাব্য হিসাবে বিচার করলে উহার কাব্যরস ব্যাহত হবে ঠিকই। কিন্তু কবির সমসাময়িক কালের যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদনের কবিমানস পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করা যাবে। সমাজের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক এক সময় পুরাতন ভাবনা ও জীর্ণ সংস্কার ঘুচিয়ে দিয়ে নূতন ভাবনা ও নূতন সংস্কার দেখা দেয়। কি জীবনের ক্ষেত্রে কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন ভাবনা মধুসূদনকে পেয়ে বসেছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ ক্ষণে অন্তর্চেতনার এক গূঢ় প্রবৃত্তি বশে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের নবদিগন্তে বিদ্রোহী কবির ভূমিকা গ্রহণ করলেন। কিন্তু বিদ্রোহী ভাবনা পুরাতনকে অস্বীকার করে নয়। মধুসূদনের কাব্য বার আনা গ্রীক নহে। মধু কবির বার আনা পাশ্চাত্য প্রভাবের অন্তরালে ছিল খাঁটি বাঙ্গালী মন। তাই তিনি মেঘনাদ বধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সশ্রদ্ধ ও সকরুণ চিত্তে জনম দুঃখিনী সীতাকে স্মরণ করেছেন এবং অশ্রুজলে সীতা চরিত্র অংকন করেছেন। মোহিতলাল মজুমদারও মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদনের কবিভাবনার উপর সমসাময়িক যুগচেতনার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন,—" একদিকে নবযুগের নববাণীর বিপুল আশ্বাস, অপরদিকে এক অতিশয় জরাজীর্ণ অথচ অতিশয় করুণ মধুর জীবন

জীবন যাত্রার মমতাময় আহ্বান তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' সেই যুগের সেই বাণী এবং তৎসহ এক কবি হৃদয়ের সমগ্র উৎকণ্ঠা রূপকের আকারে ঘোষণা করিতেছে।" ১

উনবিংশ শতাব্দীর নবমানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মধুসূদন রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্রের মধ্যে নায়কোচিত গুণ ও স্বাদেশিকতা লক্ষ্য করেছিলেন বলে রামায়ণের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রকে নায়ক না করে রাক্ষসরাজ রাবণকে তাঁর কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে রাম ও লক্ষ্মণকে হেয় প্রতিপন্ন করে তিনি তাঁর মানস সৃষ্ট রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের মহত্ব ও বীরত্ব প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু তথাপি রামায়ণের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্র ও লক্ষণ চরিত্রের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ ক্ষুন্ন করতে পারেন নি। মাইকেলের অবচেতন মনে রামলক্ষ্মণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ ছিল। লক্ষ্মণ অন্যায়ের পক্ষাবলম্বী মেঘনাদকে কৌশলে বধ করেছেন সত্য বটে; কিন্তু তিনি ভীরু কাপুরুষ নহেন—স্বয়ং ত্রিশূলী মহাদেবকেও তিনি সম্মুখসমরে আহ্বান করেছেন—

"সতত অধর্ম কর্মে রত লংকাপতি,
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে।
ধর্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে—
সত্য যদি ধর্ম তবে অবশ্য জিনিব।[২]

লক্ষ্মণ কেবল বীর নহেন। সমস্ত নৈতিক শক্তিতেও তিনি শক্তিমান। জল-ধিতলে বারুণী, পাতালে অনন্ত নাগ, লংকার অধিশ্বরী দেবী এবং রাবণের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং মহাদেব এই শক্তিকে স্বীকার করেছেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে রামচন্দ্র নায়ক বা প্রতি নায়ক চরিত্র নহেন তথাপি মধুসূদনের অসতর্ক লেখনী রামচন্দ্রের স্বাভাবিক বীরত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করেছে। রামচন্দ্রের বাহুবলে লংকাপুরী বীরশূন্য শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

১। কবি শ্রীমধুসূদন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।
২। মাইকেল রচনা সম্ভার, প্রমথ নাথ বিশী সম্পাদিত, মেঘনাদবধ কাব্য, ৫ম সর্গ, পৃ ১৯৮।

দেখ, বীর শূন্য এবে নিদাঘে যেমতি
ফুল শূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর। আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে।১

বৈশ্বানরের মত লঙ্কায় প্রবেশ করে তিনি লঙ্কাপুরী ধ্বংস করেছেন। তাঁরই বাহুবলে শূলী শম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ, বীরচূড়ামণি বীরবাহু, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি লঙ্কার বীরবৃন্দ নিহত হয়েছে। রামচন্দ্রের পরাক্রম লঙ্কাপুরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। কাজেই মধুসূদনের রামচরিত্র কেবল স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন পরায়ণ কুসুমাদপি কোমল নহেন – তিনি বজ্রাদপি কঠিন ও ভীমপরাক্রমশালী কালান্তক যমের মতও বটে। মেঘনাদ বধ কাব্যে মধুসূদন রামলক্ষ্মণকে ভীরু ও কাপুরুষ করে এঁকেছেন একথা সত্য নহে"।২

মধুসূদনের রামলক্ষ্মণ চরিত্রের ন্যায় রাবণ মেঘনাদ চরিত্রও রামায়ণ ভিত্তিক। যদিও কবির মতে তিনি রামায়ণ থেকে কেবল কাহিনী ও বিভিন্ন চরিত্রের নামগুলি ছাড়া আর কিছুই নেননি। কবির মত সমর্থণ করে কোন কোন সমালোচক মনে করেন, রাবণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর বীরত্বের উপকরণ মহাকবিরা সুপ্ত রেখেছেন কিন্তু তাকে কবি প্রাণের ভালবাসার কণামাত্র দেননি। সে শক্তিধর কিন্তু স্রষ্ঠা কর্তৃক অবহেলিত। রামায়ণ কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাল্মীকির রাম বীর চূড়ামণি বটে, কিন্তু রামের প্রতিযোদ্ধা রাবণও কম বীর নহেন। রাবণের বীরত্ব বর্ণনায় মহাকবির লেখনী কার্পণ্য করেনি। রামায়ণের লঙ্কা কাণ্ডে রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে রাবণেরও বীরত্ব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, রামচন্দ্র তাঁর প্রতিদ্বন্দী রাবণের বীরত্ব বিশেষ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন।— "রাম মহাতেজা রাক্ষসেশ্বরের প্রদীপ্ত আকৃতি

১। মাইকেল রচনাসম্ভার, ৫ম সর্গ, পৃঃ ১৫৮।
২। মধুসূদন, কবি ও নাট্যকার, শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৬৭
এ মুখার্জী, ১৩৮০।

দেখিয়া তাঁহার তেজস্বীতার বিশেষ প্রশংসা করেন"। পুত্রশোকাতুরা রমণীদের উচ্চ বিলাপ শ্রবণে ক্রোধান্ধ রাবণের বীরত্ব আর একবার প্রদর্শিত হল—রাবণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্রোধান্ধ নয়নে অধর দংশন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মূর্ত্তিমান কালাগ্নির ন্যায় ভীষণ হইয়া তাঁহার নিকটস্থিত মহোদর, মহাপার্শ্ব, বীরূপাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষস বীরগণকে ক্রোধজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "সৈন্যদিগকে শীঘ্র বাহির হইতে বল আজ আমি যুগান্তকালের সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত বাণ সমূহে রাম লক্ষণকে যমালয়ে পাঠাইয়া খর, প্রহস্ত, কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ বধের প্রতিশোধ লইব।[২] রাবণ রামচন্দ্রের সমকক্ষ প্রতিযোদ্ধা, বীরত্ব ও শৌর্যবীর্যে কোন অংশে রামচন্দ্রের চেয়ে হীন নহেন। উভয়েই অতুলনীয় যোদ্ধা ও অতুলনীয় বীরত্বের অধিকারী—"সাগর যেমন সাগরের ন্যায়, আকাশ যেমন আকাশের ন্যায়, সেই রূপ রাম রাবণের যুদ্ধ ও রাম রাবণের যুদ্ধের ন্যায়"।[৩] এইভাবে দেখা যায় মেঘনাদ বধ কাব্যের রাবণ চরিত্র নূতন সৃষ্টি নহে। মধুসূদনের কবি কল্পনা ও স্বীয় আত্মস্বরূপের প্রতিফলনে মহাকবির সৃষ্ট চরিত্রের মহিমা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ইংরাজ ভাবাপন্ন ধর্মান্তরিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে ছিল একটি খাঁটি বাঙ্গালী মন। ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি, যা কিছু ভারতবাসীর গৌরবের বস্তু তা কবি চিত্তকে আলোড়িত করেছিল। তাই ভারতের কবিকুলের আদর্শ মহাকবি বাল্মীকি, নারী জাতির আদর্শ জনম দুঃখিনী সীতাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন।" বাল্মীকি কবিতায় লেখকের আত্ম স্বরূপের উপলব্ধি ঘটেছে। তিনি আদি কবি বাল্মীকিকে অগ্রাহ্য করে রামায়ণের বিষয় নিয়ে রামায়ণের ভাব বিরোধী কাব্য রচনা করে যশস্বী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন বাল্মীকিকে অস্বীকার করে তাঁর কাব্য প্রতিভা বিকশিত হতে পারেনা।

'রামায়ণ' কবিতায় তিনি বাল্মীকির মানসকন্যা জনম দুঃখিনী সীতাকে স্মরণ করেছেন। ভারতীয় আদর্শের প্রতি, সীতার সীমাহীন দুঃখের প্রতি

১, ২, ৩। বাল্মীকি রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬০, ৭৭৪, ৭৮৯

কবির ছিল এমনই সহানুভূতি—

"কে সে মূঢ় ভূভারতে বৈদেহি সুন্দরী।
নাহি আদ্রে মন যার তব কথা স্মরি।
নিত্য কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তিজলে"।[১]

"সীতার বনবাসে" রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্ত সীতার মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। সীতা লক্ষ্মণের কাছ থেকে তাঁর নির্বাসন সংবাদ জানতে পেরে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। রাম ভিন্ন তিনি নিজেকে কল্পনা করতে পারেন না। সীতার অবস্থা নদীর স্রোতমুখে কাণ্ডারী বিহীন নৌকার মত। অচিরে তরঙ্গে নৌকা ভাঙ্গবে। তাঁর জীবন দীপও হবে নির্বাপিত। অথবা বনভূমিতে পাষাণ প্রতিমা ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লে যে অবস্থা, বনভূমিতে পরিত্যক্তা সীতারও সেই অবস্থা।

"কাপি ভয়ে ভাসে ডিঙা কাণ্ডারী বিহনে
অচিরে তরঙ্গ চয় নিষ্ঠুর লো,
গ্রাসিবে। নতুবা তাডায়ে পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে।

o o o

মূর্চ্ছায় পড়িয়া সতী সহসা ভূতলে
পাষাণ নির্মিত মূর্তি কাননে যেমতি
পড়ে। বহে ঝড় যবে প্রলয়ের কালে।।"[২]

হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যের ছায়া অবলম্বনে দশাননবধ মহাকাব্য রচনা করেন। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ বধ এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। মাইকেল যেমন বহু দেব দেবীকে রাম ও রাবণের সহায়ক করে চিত্রিত করেছেন, সমস্ত মেঘনাদ বধ কাব্যকে দৈব নির্ভর করে এঁকেছেন অনুরূপভাবে দশানন বধ কাব্যেও দেবতাদের সাহায্যে রামচন্দ্র রাবণ বধে সমর্থ হয়েছিলেন। মহাদেব ও ভবানীর সাহায্য ছাড়া রামচন্দ্র রাবণ বধ করতে পারতেন না। হনুমানও অপ্সরা কন্যা প্রদত্ত অঙ্গুরী পরে

১, ২। মইকেল রচনা সম্ভার, প্রাগুক্ত, মিত্র ও ঘোষ
পৃঃ ৫০৭, ৫২৬।

রাক্ষস রমণীদের চোখে ধুলো দিয়ে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করতে পেরেছিল। এই কাব্যের আর একটি লক্ষ্মণীয় বৈশিষ্ট এই যে মেঘনাদের মৃত্যুর পর সাত দিনও রাবণ নিরুপদ্রবে বাস করতে পারেনি। কারণ ইন্দ্রজিৎ নিহত হলেও দেবতাদের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ থামেনি। রাবণ দেবতাদের যুদ্ধে পরাভূত করলেন। ভীত সন্ত্রস্ত দেবতারা যুদ্ধ বিরত রামচন্দ্রের শিবিরে দেখা দিলেন রামচন্দ্র দেবতাদের বিপদ দেখে আবার রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু রাবণের মত বীরকে পরাস্ত করা খুব সোজা নহে। হনুমান রাবণের জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীকে ছলনা করে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করল। তারপর হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে রামচন্দ্র দেবী পূজা করে রাবণ বধের বর লাভ করলেন—

"সঁপিলেন রঘুপতি খড়গ-ছিন্ন করি আত্মমদুল হৃৎপিণ্ডে।।
অখিল জগৎত্রয় হইল পুণ্যময় অনুপম অদ্ভুত কক্ষে,[১]

মেঘনাদ বধ কাব্যে যেমন রামলক্ষ্মণ দৈববলে বলীয়ান, দশানন বধ কাব্যে ও দেবতারা সর্বদা রামচন্দ্রের পক্ষে আছে—শংকর বীর্য লাভ করে রামচন্দ্র রাবণ বধে সক্ষম হয়েছিলেন—

"অতুল বিশিখবর দর্শহি আর্য,
ঝটিতি বিশিখ হৃদি অর্পি সুবীর্য,
গিরিশ শকতি লই সুস্থির চিত্তে,
বধহ বিষম-অরি দুর্জয় সত্বে।"[২]

রামায়ণের রাণী মন্দোদরীর মত এখানেও জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী রাবণকে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছে। অষ্টম সর্গে রাজ্ঞীরা যখন শিব লিঙ্গ পূজা করছেন তখন অমঙ্গলের সূচনারূপে শিবলিঙ্গ চড় চড় শব্দে ফেটে যায়। রাণী শিবমন্দিরে রাবণের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। বীরাঙ্গনা রমণী এবার শত্রু সৈন্য দমনে সমরাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন। রণক্ষেত্রে রামচন্দ্রের বিশ্বম্ভর মূর্তি দেখে তিনি রণস্পৃহা ত্যাগ করে রামচন্দ্রের স্তব করতে লাগলেন। এখানে মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবি প্রমীলার অনুকরণে মন্দোদরীকে রণসজ্জায় সজ্জিত করেছেন। কিন্তু কবির লেখনী বীরাঙ্গনা রমণীর চিত্রাংকন করার মত সবল ছিল না। তাই তিনি রামচন্দ্রের বিশ্বরূপ দেখিয়ে বীরাঙ্গনা

১, ২। দশানন বধ মহাকাব্য—হরগোবিন্দ নস্কর চৌধুরী, ১৩১০, পৃঃ ১৪৯, ২২৯।

রমণীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত পাঠালেন ! এই কাব্যে সীতার প্রতি রামচন্দ্রের কটূক্তি নেই। সীতার সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য রামচন্দ্র সীতার অগ্নি পরীক্ষা নিয়েছিলেন। রামন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন পথে ভক্তসখা গুহক মিলন বর্ণনায় অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গুহক রামচন্দ্রের জন্য শুষ্ক ফল মূল ও শুষ্ক মৎস্য সংগ্রহ করে রেখেছিল। রামচন্দ্র ফিরে এলে সে বন্ধুর কণ্ঠ আলিঙ্গন করে শুষ্ক ফল ও শুষ্ক মৎস্য মুখে পুরে দিল। ভরদ্বাজ আশ্রম হয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর রামচন্দ্র প্রথমে মধ্যম মাতা কৈকেয়ীর ঘরে প্রবেশ করলেন।

চিন্তি কথঞ্চিৎ নিরখি নৃপেশ্বর অনুত্তানিকরমুখ পদ্মে,
পশিলেন প্রথমত সম্ভ্রম সহ অতি কৈকেয়ী মনিময় সদ্মে।[১]

তারপর কনিষ্ঠা মহিষী সুমিত্রা এবং সর্বশেষে স্বীয় জননী কৌশল্যা দেবীর গৃহে প্রবেশ করলেন। এই অংশটিতে কবি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণ করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করার পর প্রথমে কৈকেয়ী সম্ভাষণে গমন করেছিলেন—

"অন্তরে জানিল তাহা রাম রঘুমণি ॥
হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে।
আগেতে চলিল রাম কৈকেয়ীর পুরে ॥
ধূলায় বসিয়া রাণী বিরস বদন।
হেনকালে রাম গিয়া বন্দিলা চরণ ॥"[২]

দশানন বধ কাব্যের পরবর্তী অংশ হিসাবে শশধর রায় 'রাঘব বিজয়' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ পক্ষের বীরবৃন্দ একে একে রামচন্দ্রের কাছে প্রাণ হারাল। সর্বশেষে পাতাল থেকে মহীরাবণ এসে রামলক্ষ্মণকে হরণ করে পাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে রক্ষঃকুলের শেষ দীপ শিখা মহীরাবণেরও হনুমানের হাতে মৃত্যু ঘটল। রাম-রাবণের মহাসমর এবং রাবণ বধে কাব্যের সমাপ্তি হয়েছে।

১। দশানন বধ মহাকাব্য, হরগোবিন্দ নস্কর চৌধুরী, পৃ ৩৭৮।
২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৭।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্দোদরীর ন্যায় রাবণ জননী নিকষাও রামচন্দ্রের কাছে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে এই কাল সমরের অবসান করতে চেয়েছেন। রাঘব বিজয় কাব্যে নিকষা বীর পুত্রের বীর জননী। রাবণ মন্দোদরীর শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করায় তিনি তাকে তিরস্কার করেছেন—

বীর দম্ভ করি, ঘেরি মাতৃভূমি তব,
অস্ফালিবে বৈরিদল যবে
একে একে ব্যাধ সম বিনাশি স্বগণে,
সেই ঘোর দিনে এ হেন নিশ্চেষ্টভাব
হইবে তোমার বাহু, হবে বল হত' ?[১]

সেনাপতি সারণ, রাবণ ও রাবণ পুত্র মহীরাবণকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলে জননী নিকষা আবার পুত্র ও পৌত্রকে সংগ্রামে উৎসাহিত করেছেন। রাবণও পুত্র মহীরাবণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে সুর্পনখার সমস্ত (সমস্ত) ঘটনাটিকে বিকৃত করে উপস্থিত করেছে—

''তারপর একদিন সেই নারী আসি
সুর্পের পূজার পুষ্প লইবার তরে
নিরর্থ কলহ করি ব্যর্থ মনোরথ,
বিসর্জ্জি কপট-আশ্রয় ফিরি গেল চলি।
শুনিয়াছি সুর্প-মুখে, অমনি ধাইয়া
সেই কাপুরুষ যুগ আইল সেখানে
দেখাতে বীরত্ব-দর্প অবলার দেহে।
বিদারিবে হিয়া তব শুনিলে সে কথা,—
শাণিত অসির ধারে প্রহারি বালারে
ছেদিল তাহার নাশা মুহূর্ত্ত মাঝারে।[২]

অথচ সত্য ঘটনা রাবণের অজানা নয়। অন্যত্রও রাবণ মন্দোদরীকে বলেছে নাসিকা ছেদন করে নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যানের এমন অভিনব পন্থা সে

১, ২। রাঘব বিজয় কাব্য, শ্রী শশধর রায়, পৃ ৩২, ১২৮, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩১০।

রাজা হয়ে কেমন করে সহ্য করবে। রাবণের মতে দণ্ডকারণ্যে তার অধিকারে মুনি, ঋষি, মনুষ্য সবাই সুখে ছিল। কোথা থেকে ভণ্ড তাপস রাজ-কুমারদ্বয় এসে উৎপাত শুরু করেছে। তাদের অত্যাচার রাবণ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। দুষ্কৃতকারীকে দণ্ড দেওয়া রাজার কর্তব্য। রাবণও সে কর্তব্য পালন করবে। কিন্তু রাবণের মনের এই দৃঢ়তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। কৃত্তিবাসের রাবণের মত এখানেও রাবণের মনে রামচন্দ্র দেব কি মানব এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল—

"আর যদি ব্যর্থ সেই মহাঅস্ত্রবল,
দেবদত্ত অস্ত্র যদি নিরস্ত নিধনে,
তবে নিশ্চয় বুঝিব, রানী মন্দোদরী,
কুলগুরু শুক্রাচার্য্য, সুপার্শ্ব, সারণ,
বুঝিয়াছে সব-কথা নাহিক সংশয়।[১]

সঙ্গে সঙ্গে রাবণের মনোবলও ভেঙ্গে পড়ল।

কিন্তু তা হইলে কি দশা হইবে মোর
কিসে পরিত্রাণ?[২]

তারপর গুরু শুক্রাচার্যের উপদেশে রামচন্দ্র যে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন এ বিষয়ে রাবণের আস্থা ফিরে এল। গুরুর কাছে সে সবিনয়ে জানাল শত্রু ভাবে ছাড়া মিত্রভাবে রাক্ষসেরা রামচন্দ্রের উপাসনা করতে পারত না। কলুষিত আত্মা রাক্ষসেরা রামচন্দ্রের হাতে মরে মুক্তি পাবে—

অনাহারে অনিদ্রায়, রামরূপ চিন্তেয়াছে মনে।
হউক সে অরিরূপে, কিবা ক্ষতি তাহে?
কার্য্য সদা কারণ প্রসূত, তাই মুক্তি পথে আজি
বাসনা-নিবন্ধ কীট রক্ষকুলোদ্ভব"।[৩]

এর সঙ্গে তুলনীয় কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্দোদরীর প্রতি রাবণের উক্তি—

ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পায় মুনি ঋষি।
সে রাম ভাবেন মোরে নিরাহারে বসি॥

১, ২, ৩। রাঘব বিজয় কাব্য, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫১, ২ ৭।

জাগিছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে।
ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে ॥
মরিব রামের হাতে ভাগ্য যদি আছে
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥[১]

কাব্যের শেষাংশে বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণে রামচন্দ্র সবিক্রম হয়ে রাবণ বধের জন্য তৈরী হয়েছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে কবি অমিত বীর্যশালী রাবণকে রামভক্তে পরিণত করেছেন। রামচন্দ্রও সমরক্ষেত্রে ভক্ত দেহে অস্ত্রঘাত করতে অসম্মত হন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে মন্দোদরীকে চির আয়তীর বর দিয়েছিলেন রামচন্দ্র আর রাঘব-বিজয় কাব্যে মন্দোদরী সীতার সেবা করে সীতার কাছ থেকে চিরায়তীর বর লাভ করেন--

"অশিষিলা বহুবার মোরে।
চির-সভর্তকা বলি জনক নন্দিনী ॥[২]

এই কাব্যে কবি রাক্ষস আহারের এক বিকট তালিকা প্রস্তুত করে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন এবং আর্য ও অনার্য জাতির আহার্য সামগ্রীরও যে পার্থক্য আছে তা দেখিয়েছেন। এই আহার্য বস্তুর মধ্যে আছে অপক্ক গৃধিনী মাংস, গলিত শ্বাপদ, দগ্ধ কচ্ছপের অন্ত্র, বিড়ালের প্লীহা, অৰ্দ্ধদগ্ধ পূতিগন্ধময় ভেক, জলৌকা, সধূম মহিষের অন্ড, পেচকের অক্ষি, কৃমি মাংস, ঘোটকের জিহ্বা, শামুকের শ্লেষ্মা, আর রয়েছে জ্বালাময়ী রক্ত বর্ণ মদিরা।[৩] অনার্য সুলভ বিকৃত এই আহার্য তালিকাটি কবির স্বকপোলকল্পিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু গীতি কবি রামায়ণের বরুণ কাহিনী থেকে তাঁদের গীতি কাব্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন এদের মধ্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিহারীলাল চক্রবর্তী, কবি কামিনী রায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'অহল্যা' কবিতায়, অহল্যার কামনা-বাসনার মধ্য দিয়ে সমাজ শাসনে বন্দী নারী জীবনের প্রেম মিলনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ

১। রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৩৭৬।

২, ৩। রাঘব-বিজয় কাব্য, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩১৯, ৯২৪।

পেয়েছে। বিবাহ বন্ধনে বন্দী হয়ে নারীকে তার স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জন দিতে হয়েছে। সে শাস্ত্র বাক্য আপ্ত বাক্য মানেনা। হৃদয় ধর্মকে সে বড় বলে মনে করে। নব নব ঋতু পর্যায়ে ধরণী যেমন মোহিনী রূপ ধারণ করে, নভমণ্ডলে যেমন নিত্য নব নব রঙের মেঘ রৌদ্রের খেলা দেখা যায় নারীর যৌবনেও যদি নিত্য নব অতিথির আগমন না ঘটে তবে যৌবন বৃথা। তাই অহল্যা সমাজ বন্ধনের নিগড় স্বরূপ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চায়। সে মুক্ত আকাশে স্বাধীন বিহঙ্গীর ন্যায় স্বেচ্ছা বিহারিণী হতে চায়—

মিথ্যা কথা। কুল, লাজ এস তুমি দেব রাজ।
তৃপ্তকর, ক্ষিপ্ত প্রাণ, নব ভোগ আশে।
যথা নব ফুল ফোটে, নব সমীরণ ছোটে।
এ নব যৌবন লয়ে যাব সেই দেশে।[১]

"সীতা" বিজয় চন্দ্র মজুমদারের আর একটি রামায়ণ বিষয়ক গীতিকাব্য। এতে রামময় জীবিতা সীতার অলৌকিক প্রেম ছবি অঙ্কিত হয়েছে। প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে দিয়েছেন। বনবাসিনী সীতা কিন্তু তার জন্য রামচন্দ্রকে একবারও দোষারোপ করেন নি। তাঁর মতে রামসীতার প্রাণ অভিন্ন। সন্তানতুল্য প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য রামচন্দ্র তাঁকে বনবাসে পাঠিয়েছেন সত্য বটে; কিন্তু সীতার প্রতি রামচন্দ্রের প্রেম পূর্ববৎ আছে। বিরহিনী সীতা যেমন গহন বনে একাকী বিচরণ করছেন, রামচন্দ্রও তেমনই অযোধ্যার সিংহাসনে বসে সীতা বিরহে নিঃসঙ্গ, একক।

"অযোধ্যার সিংহাসন আজি যে মহাবন।
কি যে ব্যাথা বুকে তার জানে বিরহিণী।
চিরদিন মোর তরে সে কমল আঁখি ঝরে,
এ দুঃখ কহিব কারে, কহিব কেমনে?[২]

'অজ বিলাপ' কাব্যে পারিজাত স্পর্শে রানী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অযোধ্যার রাজা পত্নী-শোকে বিলাপ করেছেন। রানী জীবনের পরপারে আর রাজা এ পারে। রাজা যেমন তাঁর প্রিয়তমা রানীকে খুঁজছেন, রানীও

১, ২। ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী, প, ১৬৮, ১৭০, ১৭২।

কি তেমন রাজাকে খোঁজ করছেন অথবা রাজার মত চির বিরহী হয়ে রাণী কি রাজার অপেক্ষায় আছেন? জীবন সিন্ধুর পারে আবার কি তাঁদের মিলন হবে?

"ভাসিয়া স্রোতে সিন্ধু পথে
তরিয়া আমি যাব কি?
জীবন পারে আবার তোরে
পাব কি আমি পাব কি?"[১]

বিহারী লাল তাঁর সারদামঙ্গলকাব্যে কাব্য-লক্ষ্মী যোগীর ধ্যানের ধন সারদা দেবীকে বাল্মীকির তপোবনে আবির্ভূতা জ্ঞানদাত্রী, সৌভাগ্য দাত্রী বাণী বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখেছেন—

শাখি-শাখে রস সুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
যতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,
হানিল শবরে বাণ
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।
ক্রৌঞ্চ প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পুরিল তার কাতর ক্রন্দনে
ক্রোঞ্চে করি দরশন
জড়িমা জড়িত মন
করুন হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়,
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ম্ময় কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।[২]

এমন সময় দশদিক বিমোহিত করে রবিচ্ছবি ম্রিয়মান করে জ্যোতির্ম্ময়ী মেয়ে কবি বাল্মীকির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

বাল্মীকি মুগ্ধ বিমোহিত। ক্রৌঞ্চ বধূর করুণ ক্রন্দনে বিহ্বল রক্তমাখা ক্রৌঞ্চের দিকে তাকালেন। একবার সেই ক্রৌঞ্চীর আর বার বাল্মীকিকে নিরীক্ষণ করলেন। দেবীর করধৃত বীণার সকরুন সুরে শোকসঙ্গীত বেজে উঠল। সেই সঙ্গীতে বনভূমি পরিপ্লুত। আদিকবির অন্তরেও সেই শোক নন্দিত ধ্বনি বীণার তারের ন্যায় হৃদয় বীণার সুরে সুরে বেজে উঠল।

নিরখি নন্দিনী-ছবি
গদ গদ আদি-কবি
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়'।১

'প্রমীলা' কবিতাটি মানকুমারী বসুর গীতিকবিতা সংকলন 'কনকাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এখানে রক্ষঃ কুলবধূ মেঘনাদ পত্নী প্রমীলার কুসুম কোমল সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও সরলতা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অসাধারণ শৌর্য বীর্যক বর্ণনা করেছেন। যে প্রমীলা বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে লজ্জাবতীলতার ন্যায় শাশুড়ীর পাশে অবনতমুখী ছিলেন, যে বালিকা পতির কর ধরে মিনতি করে বলছেন শাশুড়ী যেতে দিচ্ছেন না বলে তিনি একাকী ঘরে রয়ে গেলেন—

"ও কর-কমলে ধরি পতিকর
কহিছে বালিকা করুণ স্বরে,
শ্বশ্রূ তব সাথে না দিলেন যেতে
তাই দাসী একা রহিল ঘরে!"২

আবার সেই বালিকা বধূ প্রমীলাই রণরঙ্গিনী বেশে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন—

আবার-বুঝিবা দানব নাশিতে
ডাকিনী যোগিনী সখীর মনে,
অশিব নাশিনী, কলুষ হারিনী
অভয়া জননী পশিছে রনে!"৩

১। সারদামঙ্গল, প্রগেুক্ত, পৃঃ ৭।

২, ৩। কনকাঞ্জলি, মানকুমারী বসু, ১৩১১, পৃ, ১৬. ১৭।

এই রণরঙ্গিনীকে দেখে স্বয়ং রঘুপতি রামচন্দ্র এবং তাঁর বানর বাহিনীও ভয় পান—

"চমকি চাহিছে বানর বাহিনী,
চমকি ভাবিছে জানকী-পতি,
ধন্য বীর পত্নী ! ধন্য বীরাঙ্গণা !
সাবাসি সাবাসি প্রমীলা সতী।"[১]

দশরথের বাণে মুনি পুত্রের প্রাণ ত্যাগ কবিতাটি মানকুমারী বসুর 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। মৃগভ্রমে শব্দ ভেদী বাণে মুনিপুত্র বালক সিন্ধুকে বধ করে মহারাজা দশরথ যে কতখানি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন তা এই কবিতাটিতে দেখান হয়েছে। বাতাহত মুনিকুমারকে রাজা কি ভাবে বাঁচাবেন ঠিক করতে পারলেন না। বালকের বুক থেকে ধনুঃশর তুলে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হলে রাজা তাঁর চারদিকে মৃত্যুর একটা বিভীষিকা দেখতে পান। তাঁর জীবন হয়ে উঠল অসহ্য—

দশরথ নৃপবর
ছাড়ি শব্দ ভেদীশবর
বালক সিন্ধুর বক্ষ, মৃগ ভেবে বিধিয়া,
শেষে করে হাহাকার
উপায় না পায় আর,
কেমনে বাঁচাবে তাঁরে, মৃত্যু পাশ খুলিয়া !
রাখিতে সিন্ধুর প্রাণ
ধরি সে দারুণ বাণ,
সবলে স্বকরে রায় নিল যবে কাড়িয়া
বিষম বাজিল বুকে,
শোণিত উঠিল মুখে,
পড়িল বালক আহা ! ভূমে মাথা লুটিয়া
তার সে শোকের দায়—
অসহ্য বেদনে হায় !

১। কনকাঞ্জলি, মানকুমারী বসু, ১৩১১, পৃঃ, ১৬।

জীবনে মরিল ভূপ-মৃত সিন্ধু হেরিয়া,
শত মৃত্যু দাঁড়াইল দশরথে ঘেরিয়া ।।[১]

কবি কামিনীরায়ের 'রামের প্রতি অহল্যা' কবিতাটি রামায়ণের অহল্যা-উদ্ধার আখ্যান ভাগ অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এই কবিতাটিতে সদ্য শাপ মুক্ত অহল্যা রামচন্দ্রের বন্দনা প্রসঙ্গে বলেছেন করুণ হৃদয় সত্যব্রত রামচন্দ্রের কাছে পাপই ঘৃণ্য, পাপী নয়! শ্রীরামচন্দ্রের করুণার স্পর্শে অহল্যার জন্মজন্মান্তরের পাপ কালিমা ধুয়ে মুছে সে শুচিস্নাত হয়ে উঠেছে। অহল্যার জীবনে মৃত পুণ্য, হৃত ধর্ম পুণরায় জেগে উঠেছে। সচরাচর জীবনের মাঝে মৃত্যু আসে। আর রামচন্দ্র মৃত্যুর মাঝে জীবনকে এনেছেন। মানবসমাজে নারীর সতীত্ব লোপ হয় এ কথায় চিরকাল শোনা, গেছে; নারী হৃত সতীত্ব পুনরায় ফিরে পায় নরদেবতা রামচন্দ্র অহল্যার জীবনে তা দেখালেন।

"তব পুণ্য—শ্লোক স্পর্শ যে শান্তির সীমা
সে শান্তি জীবনে মোর দিয়াছে মহিমা
সমুজ্জ্বল। নরদেব, কিছু ভুলিনাই,
কাল যাহা পাপ ছিল, আজো আছে তাই,
শুধু সে পাপী নাই। পাপী চিরদিন
থাকে না পাপের পঙ্কে বিকৃত, মলিন,
অস্পৃস্য। প্রভাতালোকে ধরনী তেয়াগী
যায় যথা অন্ধকার, পুণ্যালোক লাগি
দুষ্কৃতি কালিমা হয় চির অন্তর্হিত,"
....
নারীর সতীত্ব যায়, মানব ভাষায়
শোনা ছিল, নারী কভু সতীত্ব যে পায়
তুমি তা দেখালে প্রভু, সে কারণে রাম
চির স্মরণীয় হবে অহল্যার নাম। [২]

এই কবিতাটিতে কবি কামিনী রায়, সমাজ কতৃ'ক নিগৃহীত নারী হৃদয়ের বেদনা নিজ অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। মানুষ চিরদিন ঘৃণ্য অস্পৃশ্য থাকতে পারেনা। পাপী পাপ স্খলনে আবার পুণ্যস্নাত হয়ে সমাজে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত যে হতে পারে রামের প্রতি অহল্যা কবিতায় কবি তা দেখিয়েছেন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে পতিতা, যে অস্পৃস্যা তাকে আরও ঘৃণ্য আরও হেয় করে তুলে, সে যে মানুষ তার অপরাধ ক্ষমা করে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে তাকে যে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া যায় একথা সমাজ মনে রাখে না। কিন্তু একথা মনে রাখলে অনেক পাপের বোঝা, অনেক অন্যায়ের বোঝা হাল্কা হয়ে যায়। যে পতিতা সেও পাপের ভয় ও পুণ্যের অনুশীলনে মনুষ্যত্বের গৌরবে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

'অশোক বনে সীতা' কবিতাটি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত। শৃঙ্খলিতা পরাধীন ভারতমাতাকে কবি অশোকবনে বন্দিনী সীতার সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখেছেন—

এই মূর্তিমতী শোক করি দরশন
জিজ্ঞাসিনু —'বনমাতা কে তুমি দুঃখিনী ?
এমন বিষাদ মূর্তি কিসের কারণ ?
বলিলা রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,—
দুঃখিনী ভারতলক্ষ্মী আমি বাছাধন।
আমিই অশোকবনে সীতা বিমোহিনী।"[১]

এই কাব্যে কবি বন্দিনী সীতার সংগে পরাধীন ভারতের তুলনা করে পরোক্ষে সীতাপহারক রাক্ষস রাবণকে ভারতের স্বাধীনতাপহারক ইংরাজদের সংগে তুলনা করেছেন। সীতার সংগে ভারতমাতার, রাবণের সংগে ইংরাজকে তুলনা করে কবি স্বীয় কল্পনা শক্তির উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

রামায়ণ মহাকাব্যে উপেক্ষিতা অনাদৃতা বধূ উর্মিলার বিলাপ দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'উর্মিলা' কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। উর্মিলা রাজপ্রাসাদ বাসিনী। আর সীতা বনবাসিনী। কিন্তু সীতা অপেক্ষা উর্মিলার দুঃখ বেদনা কিছু-মাত্র কম নয়। সীতার বনবাস পতি রামচন্দ্রের সাহচর্যে রাজপ্রাসাদের ভোগ বিলাস অপেক্ষাও আনন্দদায়ক। প্রাসাদ বাসিনী উর্মিলা বিরহিনী পতি

১। ঊনবিংশ শতকের গীতি কবিতা সংকলন, প্রাগুক্ত পৃ' ৫০৩। ১

বিচ্ছেদ বিধুরা তাপসী। বধূ ঊর্মিলা পত্রবাহক দ্বারা সীতার কাছে পত্র পাঠাবেন স্থির করেছেন। সীতা তা নিজে পড়বেন। রঘুবীরকে শোনাবেন, আর অবশেষে ঊর্মিলা হৃদয়ের নিষ্ফল প্রণয় জানাবেন লক্ষ্মণকে—

"জানাইও ঊর্মিলার নিষ্ফল প্রণয়,
জানাইও ঊর্মিলার নয়নের বারি,
জানাইও প্রিয় দিদি জানাইও তারে,
অযোধ্যার রাজপুরে কি নিশি দিবসে,
ঊর্ধ্বমুখে, কখনো কী অবনত মুখে,
বিগলিত—কেশপাশ, পান্ডুর অধরা,
একটি রমণী মূর্তি ঘোরে অবিরত !"[১]

এখানে কবি বিরহিনী ঊর্মিলার খাঁটি চিত্র এঁকেছেন। ঊর্মিলার সীমাহীন দুঃখ আরও অসহনীয় করে তোলার জন্য ঊর্মিলার প্রতি কৈকেয়ীর কটাক্ষ মন্থরার কটূক্তি পত্রের মধ্যে কবি সুকৌশলে বর্ণনা করেছেন। নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী বধূ ঊর্মিলাকে দিয়ে গৃহকার্য করায়। কুব্জা ঊর্মিলাকে মহারাণী কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে গৃহকার্যে নিযুক্ত করার জন্য ডেকে নিয়ে যায়—

"দণ্ডক কানন ত্যজি চল বধূ এবে,
ডাকিছেন অন্তঃপুরে মহারাণী মোর,
করিবারে গৃহকার্য্য—চল গো এখনি।"[২]

কৈকেয়ী রাণী ঊর্মিলাকে ব্যঙ্গ করে বলেন—

"একদা কৈকেয়ী দেবী সবার সম্মুখে
কহিলেন ব্যঙ্গ করি, 'বউমা মোদের
দণ্ডক ভাবেন বুঝি মোদের উদ্যানে,
অপনারে ঋষি কন্যা'। সে শ্লেষ্য উক্তির
গূঢ় অর্থ প্রিয় দিদি নারিনু বুঝিতে,"[৩]

ঊর্মিলা কাব্যে বধূ ঊর্মিলার সীমাহীন দুঃখের মধ্যে দিয়ে সপত্নী পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি সৎ শাশুড়ীর নির্মম অত্যাচার বর্ণনা করেছেন। বহু বিবাহের পরিণতি স্বরূপ বাংলার ঘরে ঘরে বধূ ঊর্মিলার মত বাঙ্গালী গৃহ-

১, ২, ৩। ঊর্মিলা কাব্য, দেবেন্দ্রনাথ সেন, ১৮৮০, পৃ ২২-২৩, ৩

বধূরা গৃহ কর্ত্রী সৎ শাশুড়ীর কাছে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে থাকেন। পুত্রদের বনে পাঠিয়ে কৈকেয়ী ক্ষান্ত হয়নি, পুত্রবধূকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করতে ও তাকে সামান্যা দাসীর ন্যায় গৃহকর্মে নিযুক্ত করতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নি।

গুরুতারণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বালিবধ' কাব্যে রামচন্দ্রের সঙ্গে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব, বালিবধ ও সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধ্যার সিংহাসনে স্থাপন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। বালিবধ কাব্য রামায়ণের বালিবধ আখ্যান অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকর্ষ লাভ করেছে। এই কাব্যে অশোকবনে বন্দিনী সীতার অনুকরণে রুমার বন্দী দশা বর্ণিত হয়েছে। মন্দোদরীর মত তারাও রুমার পক্ষাবলম্বী। সীতার সখী সরমার মত অরুণাকে রুমার সখী করে রুমার বন্দী জীবনের বিলাপ বর্ণনা করা হয়েছে।—

এ সুখ প্রভাতে হায়। বিষাদে ঢালিয়া কায়,
বিরলে বসিয়া রুমা আঁধার কুটীরে,
আলুথালু কেশ পাশ পরিধান চীর বাস
ভূষণ-বিহীনা বালা ভাসে আঁখি নীরে।
....
অরুণ বরুণ যিনি, অরুণা নামে ধবনি
হেনকালে উতরিল রুমার ভবনে,
তাহারে হেরিয়া বালা, জুড়াইতে দেহ জ্বালা,
বলিল দুঃখের কথা কাতর বচনে।[১]

রাবণের মত বালি রুমাকে লাভ করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সীতার মত রুমাও পতিব্রতা সতী—

ভাসুর হয়ে রাজা, করে কত অত্যাচার,
অবলার জাতি মান রাখা হল দায় লো,
কভু বা কাতর স্বরে কত বা মিনতি করে,
কভু রোষ ভরে বলে পরুষ বচন লো ॥[২]

রাবণের চেড়ীদের মত বালির চেড়ীরাও রুমাকে পাহারা দেয় অত্যাচার করে, মারধর করে—

১, ২, বালিবধ কাব্য, শ্রীগুরুতারণ মুখোপাধ্যায়, ১৮০১, আরমানীটোলা আদর্শ প্রেস, পৃ, ৬২-৬৩, ।

দুরন্ত চেরীর দলে নানা অপমান করে,
স্মরিলে সে সব কথা পরাণ বিদরে লো ;
কভু করে জোড় হাত, কভু বা দেখায় ভয়,
কভু প্রহার করে, কভু ধরে পায় লো ।[১]

শিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 'অজবিলাপ' কাব্যে ইন্দুমতীর শোকে অজরাজার বিলাপ বর্ণনা করেছেন। মহারাজ অজ ইন্দুমতীর শোকে রাজ্য পরিত্যাগ করে বনে বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তখন কুলগুরু বশিষ্ঠ রাজাকে রাজধানীতে ডেকে এনে জানালেন যে রাণী ইন্দুমতী শাপভ্রষ্টা অপ্সরা। শাপভ্রষ্ট হয়ে সে স্বরাজ্যে ফিরে গেছে। তার জন্য শোক করা বৃথা। রাজা যেন শোক পরিত্যাগ করে রাজ কার্যে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে ভুলতে পারলেন না। তিনি অষ্টম বর্ষীয় রাজকুমার দশরথকে সিংহাসনে স্থাপন করে সরযূ সলিলে আত্মবিসর্জন করলেন।

'কষ্টে অষ্ট বর্ষকাল, যাপিলেন নরপাল,
কুমারের শৈশব কারণ ৷৷
চিত্রে প্রিয়া-মূর্তি দেখি, কখনো জুড়ান আঁখি,
স্বপনে বা কভু দরশন ৷৷
প্রজার পালন তরে, কুমারে নিয়োগ করে,
বসাইয়া নিজ সিংহাসনে।
প্রিয়া শোকে নরবর ত্যজিলেন কলেবর.
সুরধুনী সরযূ মিলনে ৷৷'[২]

কবি এখানে মহারাজ অজ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে পত্নী প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

'লক্ষ্মণ ভোজন' কাব্যে অনাহারে অনিদ্রায় চৌদ্দবর্ষ ব্রহ্মচর্য পালন করে লক্ষ্মণ যে ইন্দ্রজিৎ বধে সমর্থ হয়েছিলেন তা জানতে পেরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে উপলক্ষ্য করে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। সীতাদেবী গিয়ে রন্ধনের ভার গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষ্যে কবি ত্রৈলোক্যনাথ দাস দে রামসীতার দাম্পত্য রসিকতার এক সরস চিত্র এঁকেছেন। অসময়ে রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরে দেখে সীতা তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রামচন্দ্র কারণ স্বরূপ বললেন যে

১। বালিবধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ, ৬৫।
২। অজবিলাপ, শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা. পৃ, ৩২।

তিনি সীতার বিরহ সহ্য করতে না পেরে তাঁর মুখ দেখার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। সীতার জন্য রামের যে কি কাতরতা তা সীতা বোঝেন না। সীতা রাবণ গৃহে সুখে ছিলেন, আর রাম বনে বনে কেঁদে মরেছেন—

"রাবণের গৃহে তুমি থাক মহাসুখে।
তোমার লাগিয়া আমি কেঁদে ভ্রমি দুঃখে।।"[১]

এর উত্তরে সীতা বলেন সতীত্ব যশ গৌরব লাভ করার জন্য তিনি বনবাসিনী হয়েছিলেন। অথচ তাঁর অপযশ হল। তখন রাম বলেন, 'তুমি পতিভক্তির জন্য বনে যাওনি যশের জন্য বনে গেছ।'

"যশের লাগিয়া যাও মোর সঙ্গে বনে।
পতিভক্তি তবে তব নাহি ছিল মনে।।"[২]

তারপর রামচন্দ্র পরিহাস ত্যাগ করে সীতাকে লক্ষ্মণ ভোজনের আয়োজন করতে বলেন।

ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত। রাক্ষস ও বানরসমাজ সহ লক্ষ্মণ ভোজনে বসেছেন। সীতাদেবী একের পর এক পরিবেশন করে যাচ্ছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুই মুখে দিচ্ছেন না। রামচন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে লক্ষ্মণ বললেন—

বসিবারে পাই আজ্ঞা না পাই খাইতে।
দেখিয়া শ্রীরাম হাত দেন কপালেতে।।
খাও হে লক্ষ্মণ ভাই দোষ না ভাব ইহায়।
ভুলিয়াছি খাও আজ্ঞা দিইতে তোমায়।। [৩]

ব্যঙ্গপ্রিয় কবি এখানে রামায়ণের গুরু গম্ভীর বিষয় বস্তুর মধ্যেও হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। লক্ষ্মণ ভোজনের নাম করে তিনি বাঙ্গালীর ভোজ-সভার একটি সুন্দর খাদ্য তালিকাও প্রস্তুত করেছেন।

'নির্বাসিতা সীতা' কাব্যে হরিশচন্দ্র মিত্র লোকোপবাদ ভীত রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসনের পর বনবাসিনী সীতার করুণ বিলাপ বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যে একদিকে যেমন সীতার পতিভক্তির নমুনা রয়েছে তেমন তাঁর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের দুর্ব্যবহারে তিনি রামচন্দ্রকে নানাভাবে অভিযুক্ত করেছেন শুক সারীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি সারীকে বলেছেন সে যেন কখনো শুকের

১, ২, ৩। লক্ষ্মণ ভোজন, ত্রৈলোক্যনাথ দাস দে, ১৮৭১, পৃ, ২১, ২২, ২৪।

প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিশ্বাস না করে। কারণ পুরুষ জাতি কখনো বিশ্বাসের যোগ্য নয়। সুখ-দুঃখ দাতা বিধাতাকে তিনি এই বলে দোষারোপ করেছেন যে বিধাতা সকলের কপালে সুখ দুঃখ সমানভাবে লিখেন, কিন্তু অভাগিনী সীতার কপালে কেবল নিরন্তর দুখই লিখেছেন।

সীতা ভাবছেন রামচন্দ্র সীতার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিশ্চয় নিজেও অযোধ্যার সিংহাসনে বসে জ্বলছেন। গর্ভবতী সতী পত্নীকে পরিত্যাগ করে রামচন্দ্র নারীহত্যার পাতকে পাতকী হয়েছেন। তিনি ধর্মের কাছে রামকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করেছেন—

"হে ধর্ম ! করিল নাথ যে পাপ অর্জন
ক্ষমিলাম আমি,—তুমিও করিও মার্জন।"[১]

সীতা আশংকা করেন রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসন দেখে পাঁচ মাসের গর্ভবতী নারীরা স্বামীর কাছে আর কোনদিন সাধ চাইবেনা—

"গর্ভিণী কামিনীদের জনমের মত,
নাশিলেন পতি পাশে সাধ চাওয়া সাধ,
মম দশা শুনে কেবা সাধে হবে রত ?"[২]

গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ্য করেও সীতা শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর সন্তান ভূমিষ্ট হলে সুবর্ণ সূতিকাগার, পিতামহীও মাসীদের স্নেহের পরশ ও পিতা রামচন্দ্রের কুসুম কোমল কোলের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবে।

লক্ষ্মণের দুর্ব্যবহার স্মরণ করেও সীতা বিলাপ করেছেন। লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠের প্রতি ছিল পিতৃভাব এবং সীতার প্রতি মাতৃভাব। পরশুরাম পিতৃ আদেশে মাতৃ হত্যা করেছেন; লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের আদেশে মাতৃসমা সীতাকে বনে নির্বাসিতা করল।

বনবাসের অসহ্য দুঃখ সহ্য করতে না পেরে ভাগীরথী সলিলে আত্ম-বিসর্জন দেবেন ঠিক করে তিনি পবনকে দূত করে রামচন্দ্রের কাছে এ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে ভাগীরথী সলিলে ঝাঁপ দিলেন—

"বলিতে বলিতে রাম বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে,

১, ২। নির্বাসিতা সীতা, হরিশচন্দ্র মিত্র, পৃ, ৪১, ২৮।

হইলেন গঙ্গা সলিল শায়িনী
জননীর কোলে ঘুমানো মেয়ে।"[১]

নির্বাসিতা সীতা কাব্যে অসহায় বাঙ্গালী নারীর প্রতি নিষ্ঠুর পুরুষ জাতির অত্যাচার বর্ণনা করা হয়েছে। পতি পরিত্যক্তা, সমাজ সংসার বিতাড়িতা হতভাগ্য বাঙ্গালী মেয়েদের সীতার মতই জলে ঝাঁপ দেওয়া বা আগুনে পুড়ে মরা ছাড়া আর কোন উপায়ন্তর থাকেনা।

নবীনকালী দেবীর 'মন্দোদরীর রণসজ্জা' কাব্য গ্রন্থটিতে রাবণের মৃত্যুর পর শোকসন্তপ্তা মন্দোদরী পতি শোকে অধীর হয়ে রামলক্ষ্মণের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য রণসাজে সজ্জিত হন—

"করিতে অরাতি—কুলের সংহার,
ধরিল দানবী ভীষণ আকার
কোথা সে লাবণ্য কোথা অলঙ্কার
কোথা মনোহর কবরী বন্দন।"[২]

এখানে দর্পিতা দানব নন্দিনী রাক্ষস বধূ মন্দোদরী রাবণের যোগ্যা মহিষী। নবীন কালী দেবীর মন্দোদরী রামসীতার ভক্ত নহে; মধুসূদনের প্রমীলার মত সে বীরাঙ্গনা। পতিহত্যার সে প্রতিশোধ চায়। কেবল বীরাঙ্গনা নয়, দর্পিতা অহংকারীও সে বটে। ত্রিজটাকে সে অমরাপুরীতে শচীর কাছে পাঠায়, শচী যেন তার জন্য পারিজাত মালা তৈরী করে দেয়—

"যাও তুমি ত্বরা করি যথা ত্রিদিব-ঈশ্বরী,
বলো মম নাম করি,
পারিজাত কুসুমে।
গাঁথি বৈজয়ন্ত হার, দেয় মোরে উপহার,
পরি, যুদ্ধে আগুসার,
হব আমি সুষমে॥"[৩]

১, ২, ৩। নির্বাসিতা সীতা, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫।
মন্দোদরীর রণসজ্জা, নবীন কালী দেবী, ১৮৮০, ওরিয়েন্ট প্রেস, পৃ, ২, ১৮, ৪৫।

রাবণের মৃত্যুর পরও মন্দোদরী শচীকে তার কিঙ্করী বলে মনে করে তার জন্য পারিজাত মালা গাঁথতে আদেশ দেয়। কিন্তু এই বীরাঙ্গনার বীরত্ব বিভীষণকে দু'চারটি গালি দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত পতিকে দেখে সে যুদ্ধ ত্যাগ ত করলই জীবন ত্যাগেরও বাসনা করল—

কি কাজ লঙ্কায় আর কিবা কাজ জীবনে,
অস্ত্র ত্যজি পতি পদে পড়িল ব্যাকুল মনে।[১]

কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের 'সীতা চরিত্র' কাব্যের শ্রোতা স্ত্রীলোক, সম্ভবত বক্তাও স্ত্রীলোক। এই কাব্য গ্রন্থটিতে সীতা চরিত্রের অসাধারণ পবিত্রতা, পাতিব্রত্য, সহনশীলতা ও সারল্য বর্ণনা করা হয়েছে আবার প্রয়োজনে তিনি ক্ষাত্র রমণীর তেজও প্রদর্শন করেছেন। পঞ্চবটী বনে বাস সময়ে তিনি বালিকার মত অপ্রাপ্য বস্তু পাওয়ার জন্য জেদ ধরেছেন। সীতা চরিত্রের মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলার জন্য রাম চরিত্রের উপর অযথা দোষারোপ করা হয়েছে। রামচন্দ্রের বিবাহ, রাজ্যাভিষেক, লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রামের বনগমন, লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পণখার নাসাচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনা কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুসরণ করে বর্ণনা করেছেন। পঞ্চবটী বনে মায়ামৃগ ধরতে রামচন্দ্র অস্বীকার করলে সীতা বালিকাসুলভ জেদের বশবর্তী হয়ে অভিমান করে বলেছে—

"রাম উপদেশ বাক্যে অনাস্থা প্রকাশি।
অভিমানে বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকে মুখ শশী॥
সবিষাদে বলে সীতা আমি দুর্ভাগিনী।
নতুবা বাসনা পূর্ণ হইত এখনি॥"[২]

রাবণ বধের পর সীতা রামচন্দ্রের কাছে যাওয়ার আগে সখী সরমার কাছে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলেছেন যে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সূচনা দেখতে পাচ্ছেন।

অশুভ বারতা, মনেতে নিশ্চয়,
কেহ যেন আগে বলে।

১। মন্দোদরীর রণসজ্জা. নবীন কালী দেবী, ওয়েয়েণ্ট প্রেস, ১৮৮০ পৃ, ১৮, ৪৫।

২। সীতাচরিত্র, কৃষ্ণেন্দ্র রায়. ১৮৮৪ সন, পৃ. ২৫, ৮৪।

দুশ্চিন্তাতে সীতা, হেরে শূণ্যময়—
চতুর্দিক, বসি ভূতলে ।।[১]

সীতাকে রামচন্দ্র যেভাবে কটূক্তি করেছেন তা বাল্মীক ও কৃত্তিবাসকে হার মানায়। রামচন্দ্রের স্বভাবোচিত মর্যাদা এতে ব্যাহত হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সীতাকে রামচন্দ্রের সভায় আনা হলে রাম কিছুতেই সীতা পরিগ্রহে সম্মত হলেন না। পতিব্রতা সীতা রামকে কত অনুনয় বিনয় করলেন। রামজননী কৌশল্যা সীতা পরিগ্রহ বিষয়ে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলে তিনি বললেন সীতা অভিমান করে পরীক্ষা দিচ্ছেন না। কারণ রামচন্দ্র জানেন সতীত্বের যে কোন পরীক্ষায় সীতা জয়ী হতে পারবেন—

"কেন সীতা হয় ভীতা ? পরীক্ষাতে সুপবিত্রা,
নিশ্চয় যখন হইতে পারিবে ।।
অযথা হয়ে দুঃখিতা, তোমারে করে ব্যথিতা।
লোকে বল, শুনি কি বলিবে ।।
করুক পরীক্ষা দান, এই সভা বিদ্যমান,
নিষ্পাপিনী হইবে প্রচার।"[২]

সীতা চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কবি মানবজীবন তথা নারী জীবনে প্রযোজ্য বহু প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(১) যখন যাহার দশা বামে হেলে যায়।
দুর্বা বনে তারে দিদি! বাঘে ধরে খায় ।।[৩]

(২) কত যে দুশ্চিন্তা মনে হতেছে উদয়।
বলে শেষ করা দিদি! মোর সাধ্য নয় ।।[৪]

সীতাহরণ উপলক্ষ্যে এসব প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন কবি তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন—

(১) 'একতা গৃহীর পক্ষে যেমন মঙ্গল।
অনৈক্য আবার তাহা হতে অমঙ্গল ।।
সতত বিবাদে শীঘ্র লক্ষ্মী তারে ছাড়ে।
অমনি অলক্ষ্মী আসি চড়ে তার ঘাড়ে ।।

১, ২, ৩, ৪। সীতাচরিত্র, কৃষ্ণেন্দ্র রায়, ১৮৮৪ পৃ, ২৫, ৮৪, ১৮৭, ৩০, ৭৪।

বিভীষণে পদাঘাত, করিয়া রাবণ।
স্ববংশ নিধন—সূত্রে করেন স্থাপন ॥"[১]

পদাঘাতে বিভীষণকে বিতাড়িত করে রাবণ যে অন্যায় করেছিল তার জন্য তাকে সবংশে নিধন হতে হল।

সীতার অগ্নিপরীক্ষাকে কবি জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী বা দৈবদুর্বিপাক বশতঃ বলে আখ্যা দিয়ে রামচন্দ্রকে অনেকটা দায়মুক্ত করেছেন—

"জন্মস্থ হইলে শনি, একাদশে থাকুন যিনি,
তাহে শুভ নাহি পায়।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুমণি, হইয়া তাঁর রমণী,
কর্মদোষে পতিতা ধরায় ॥"[২]

বিনা অপরাধে অন্যাকে কষ্ট দিলে সে কষ্ট নিজেকে ভোগ করতে হয়। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রামচন্দ্র। তিনি সীতাকে দুঃখ দিয়েছেন, নিজেও সে দুঃখ ভোগ করেছেন—

"বিনা অপরাধে দুঃখ যে দেয় অন্যরে।
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় সে অন্তরে ॥[৩]

এ জগতের পরিণাম সম্বন্ধে কবির বক্তব্য—

"নগর অরণ্য হয়, অরণ্য নগর।
একভাবে নাহি রয়, সমস্ত নশ্বর ॥
অদ্য দিদি! যে স্থানেতে, শুনিতেছ গান।
নাহি হবে সেখানেতে কে বলে শ্মশান ॥"[৪]

সামান্য কারণে মহা অনর্থকারী বিরাট ঘটনা ঘটে—

সামান্য কারণে হয় মহৎ অনিষ্ট।
একথার সপ্রমান রয়েছে যথেষ্ট ॥[৫]

'সীতাচরিত্র' কাব্যে কবি নারী জাতির বিভিন্ন সংস্কারের পরিচয় দিয়েছেন। সীতা গর্ভ ধারণ করলে জননী কৌশল্যাদেবী বহু দেবদেবীর স্থানে প্রসূতির

১—৫। সীতা চরিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৪, ৯২ ৯৬, ১০৯, ১১৭।

মঙ্গল কামনায় মানসিক করেছেন এবং সীতার গলায় অমঙ্গল নাশক তাবিজ বেঁধে দিয়েছেন—

"তাবিজ কবজ বাঁধে সীতার গলে।
যে যাহা আনিয়া দেয় রমণী সকলে ॥[১]

লবকুশের জন্মের পরে তপোবনে বালকদের যে জাত কর্ম হয়েছে তাতে বাংলা দেশে প্রচলিত বিধি ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুর অন্নপ্রাশন বা অন্নারম্ভ বাঙ্গালীর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। সীতা বাল্মীকির তপোবনে বসে বাঙ্গালী মায়ের মত পুত্রদের অন্নপ্রাশনের কথা ভেবে চিন্তিত হয়েছেন। কারণ তপোবন ভূমিতে ফলমূল কন্দ প্রভৃতিই প্রধান আহার্য। তণ্ডুল কোথায় পাওয়া যাবে? শেষ পর্যন্ত মুনি পত্নীদের সংগৃহীত তণ্ডুল চেয়ে নিয়ে সীতা পুত্রদের অন্নারম্ভ অনুষ্ঠান করেছেন। বাঙ্গালীর সৃষ্ট রামায়ণ কাহিনীতে ইহা বাঙ্গালী সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

নগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারীর 'রামবিলাপ' কাব্যে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পর জটায়ুর সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত রামচন্দ্রের করুণ বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এতে বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সংস্পর্শে এসে রামচন্দ্রের হৃদয়ে নিত্যনূতন সীতাবিরহ জেগে উঠেছে। সীতাহারা হয়ে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি সীতার অনুপম সৌন্দর্য দেখতে দেখতে প্রায় চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন। রামচন্দ্র মনে করলেন সীতার অতুল সৌন্দর্য রাশি ছিন্ন ভিন্ন করে বনপ্রকৃতি নিজে সজ্জিত হয়েছেন—

'আরে স্বার্থপর যত শোভাধর—
এই কিরে ছিল মনের ভিতর?
দেখে রমণীর শোভা চারুতর,
সকলে সৌন্দর্য নিয়েছ হরে!
o o o
হায় হায় মম একটি কুসুম,
সবে বুঝি নিয়াছ বিভাগ করে!"[২]

১। সীতাচরিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
২। রামবিলাপ, নগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারী, গুপ্তপ্রেস, ১৮৮৫. পৃ. ৫-৬, ৩০।

বিরহ সন্তাপিত রামচন্দ্র ভাবছেন সীতার বিরহে তিনি যেরূপ কষ্ট পাচ্ছেন, সীতা নিশ্চয় তাঁর মত তত কষ্ট পাচ্ছেন না। কারণ তিনি সর্বংসহা ধরিত্রী কন্যা, ধরিত্রীর মতই তাঁর সহনশীলতা। তিনি নিশ্চয় বিপদে ধৈর্য হারাবেন না।

"সর্বসহা-সুতা সীতা না হয় বিরহে ভীতা
অসহ্য কর্মকলাপ মাতৃগুণে সহিবে,
দুর্ভাগ্য কেমন করি বল দেখি বাঁচিবে ?" ১

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সার সংক্ষেপ করে কবি গোবিন্দ চন্দ্র রায় 'রামলক্ষ্মণ' কাব্য রচনা করেছেন। রামলক্ষ্মণ এমন দুটি নাম যা একটির সঙ্গে আর একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। রামায়ণের প্রতিটি ঘটনায় রামের সঙ্গে লক্ষ্মণ রয়েছেন। লক্ষ্মণ যেন রামেরই ছায়া। রামচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন—

"তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর ॥
আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য।
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য ॥"২

রামচন্দ্রের বনগমনের সময়ে লক্ষ্মণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নানাভাবে আস্ফালন করেছেন। কিন্তু রামচন্দ্রকে বনগমনে দৃঢ় নিশ্চয় দেখে অমনি সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের পথ ধরলেন—

"যেই তুমি সেই আমি বিধাতা তা জানে,
যদি আমি থাকি হেথা কি করিবে বনে।"৩

রামচন্দ্র সীতাহরণের অসহ্য দুঃখ সহ্য করেছেন কিন্তু লক্ষ্মণের বুকে শক্তিশেল দেখে আর সহ্য করতে পারেননি। তারপর প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে নির্বাসিত করার পরও রামচন্দ্র জীবিত ছিলেন। এমনকি সীতার পাতাল প্রবেশ বা মৃত্যুর পরও তিনি ধৈর্য ধরে রাজকার্য পরিচালনা করেছেন। কিন্তু সরযূ সলিলে লক্ষ্মণের আত্ম বিসর্জনের পর রামচন্দ্রও প্রিয় ভ্রাতার অনুগামী হয়েছেন।

১। রামবিলাপ, নগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারী, প্রাগুক্ত, ১৮৮৫, পৃ, ৫-৬, ৩০।

২, ৩। রামলক্ষ্মণ, গোবিন্দ চন্দ্র রায়, ১৮৯৭, পৃ, ১০, ১৯।

'বন্দিনী সীতা' কাব্যে লেখিকা আত্ম পরিচয় গোপন করে নিজেকে দুঃখিনী স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দিয়েছেন। বন্দিনী সীতা কাব্যে অশোক বনে বন্দিনী সীতার করুণ বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। শেষের দিকে সীতা ও সরমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত কথনের মধ্যে দিয়ে লেখিকা রচনাটিকে কিছুটা কৌতুকাবহ ও সরস করে তুলেছেন। সরমার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে সীতা ও সরমাকে নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত জানান। সীতা পূর্বরাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন রামচন্দ্রের সঙ্গে সরমার বিবাহ হচ্ছে—

"দেখিনু কি মনোহর রতনে সজ্জিত ঘর
সেই ঘরে বসি তুমি রত্ন সিংহাসনে,
বিবাহ হইল তব রঘুপতি সনে ॥"[১]

সরমাও পরমানন্দে প্রিয় সখী সীতার সঙ্গে কৌতুকে যোগ দিলেন—

"সরমা কহিল হাসি মনে যাহা ভালবাসি
মিলিল মনের মত সখা স্বামী আজ,
সম্পর্কে তো বাধিবে তা ইতে কিবা লাজ।"[২]

এখানে বঙ্গীয় মহিলা কবি রামায়ণের করুণ কাহিনীর মধ্যে মেয়েলী হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। এর পর লেখিকা 'গীতিকথা' নাম দিয়ে সীতা চরিত্রের অসাধারণ পাতিব্রত্য ও মাধুর্য বর্ণনা করেছেন।

ধর্মদাস তপস্বী রচিত 'রামলীলা' কাব্যে দেবতাদের অনুরোধে নারায়ণের অযোধ্যায় দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। রাবণের অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত দেবতারা কৈলাসে দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হলেন। দেবী রাবণের পূজায় এতই সন্তুষ্ট যে কিছুতেই রাবণ পক্ষে ত্যাগ করতে সম্মত হলেন না। অতঃপর দেবতারা মহাদেবের নিকট গমন করলেন। মহাদেব তাঁদের আশ্বস্ত করে বললেন যে রাবণ বধের জন্য নারায়ণ রামচন্দ্র-রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। অতঃপর দেবতারা ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে ভগবান বিষ্ণুর নিকট সমবেত হলেন। বিষ্ণু তাঁদের আশ্বস্ত করে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করার অভিপ্রায় করলে লংকায় রামচন্দ্রের জন্মের সম্ভাবনায় রাবণের মাথার মুকুট ভূমিতে খসে পড়ল ও নানারূপ অমঙ্গল দেখা দিতে লাগল।

১, ২। অশোক বনে সীতা, জনৈকা দুঃখিনী স্ত্রীলোক, নিউ বুক প্রেস, ১৯১২, পৃ. ৪৩।

"রাম নাম শুনে কাঁপে লংকার রাবণ।
মুকুট খসিল তার, সহে না যে অঙ্গভার,
ভূতলে পড়িল ত্যজি রত্ন সিংহাসন ॥"১

এই কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "রামায়ণ মহাকাব্যকে আধুনিক পাঠকের রুচি সম্মত করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করবেন, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনা, বিশল্যকরণীর দ্বারা লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচানো ইত্যাদি ঘটনা পাঠক বিশ্বাস করতে চাহেন না। তাই কবির মতে লক্ষ্মণকে অন্য কোন বৈজ্ঞানিক মতে বাঁচাতে হবে। গন্ধমাদন নামক কোন বিচক্ষণ কবিরাজের হাতে লক্ষ্মণ আরোগ্য লাভ করেছিলেন বলতে হবে।" অর্থাৎ লেখক রামায়ণ কাহিনীর চিরাচরিত ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রামায়ণের পদ্যানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যানুবাদরও শুরু হয়। এ যুগের রামায়ণ রচয়িতারা স্বভাবতই বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদ করতেন এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা রামায়ণের এক একটি অংশ মাত্র অনুবাদ করেছেন। এসব অনুবাদকদের মধ্যে বিপ্রদাস তর্কবাগীশ, উমাকান্ত ভট্টাচার্য, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদ করেছিলেন। কেবল অনুবাদ নয়, এযুগে রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে মৌলিক গদ্য নিবন্ধও রচিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ বিষয়ক প্রবন্ধ ও রামায়ণ কাহিনীর উপর সমালোচনামূলক নিবন্ধ রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভক্ত ও সাধকের দৃষ্টিতে রামায়ণ কাহিনীকে গভীরভাবে অনুধ্যান করেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ।

ভক্ত জনসমাগমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীম লিখিত রামকৃষ্ণ কথামৃতে সংকলিত হয়েছে। নূতন কোন ধর্মমত তিনি প্রচার করেননি, সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শকেই তিনি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ভোগ নির্লিপ্ত, সংসার বিমুক্ত জীবনের দিকে তিনি

১। রামলীলা, ধর্মদাস তপস্বী, পৃ, ১৩, ভূমিকা,

জনসাধারণকে পথ দেখিয়েছিলেন, যা চরম ভোগের মধ্যে পরম ত্যাগের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। ভারতীয় পুরাণ, গাথা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে তিনি লোক শিক্ষাদান করতেন। শ্রীম লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে দেখা যায় এই মহান আচার্য তাঁর দিব্যজীবনে যাঁদের প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন যাঁদের ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্র অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতৃদেবও রঘুবীর রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে রঘুবীরের বিগ্রহ পূজিত হত। রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে রাধাকৃষ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতির সঙ্গে রামলীলার মূর্তি পূজা করতেন। পরমহংসদেব বহুবার শ্রীরামচন্দ্রের ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়েছেন এবং ভক্তদের উপদেশ দেওয়ার সময় রাম-সীতা, হনুমানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতেন। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অধ্যাত্ম ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামায়ণী কথা আলোচনা ও রামযাত্রা অভিনয় দেখেও তিনি সমাধিস্থ হতেন। রামলীলা দর্শন করতে করতে ঠাকুর সব রামময় দেখতেন। যাঁরা রামলক্ষ্মণ সীতা ও হনুমানের অভিনয় করতো তিনি তাদের মধ্যে এঁদের দর্শন করতেন। একবার একটি মেয়েকে তিনি সীতার ভাবে দেখেছিলেন—'একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীলবসন পরে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ্যা। দপ্ করে একেবারে সীতার উদ্দীপনা। ও মেয়েকে ভুলে গেলুম, কিন্তু দেখলুম সাক্ষাৎ সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন।''[১]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যজগতের অতীত হয়ে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার কথা বলেছেন। তিনি হনুমান, সীতা, নারদ ও অহল্যার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই শুদ্ধা ভক্তির উদাহরণ দিয়েছেন—"হনুমানকে একবার জিজ্ঞেস করা হয় আজ কি তিথি। হনুমান উত্তর দিল, 'আমি বার তিথি মানিনা, কেবল এক রাম চিন্তা করি। আমার ঠিক এই ভাব।''[২]

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব সীতার মত ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। "মা, সীতার মত করে দাও—একেবারে সব ভুল—

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম কথিত, ১য় ভাগ, সপ্তসং, ১৩৩৭, পৃ. ৯৭।

২। প্রাগুক্ত ৫ম ভাগ, পৃ. ১০৭।

দেহ ভুল ; যোনি, হাত পা, স্তন,—কোন দিকেই হুঁস নাই !—কেবল এক চিন্তা—কোথায় রাম।.....সীতা রামময় জীবিতা, –রাম চিন্তা করে উন্মাদিনী,—দেহ যে এমন প্রিয়, তাহাও ভুলে গেছেন !'[১] শ্রীরামকৃষ্ণও সীতার মত ঈশ্বর প্রেমে উন্মাদ হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পিত প্রাণা আরও একটি নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি পাষাণী অহল্যা। শাপমুক্তা অহল্যাকে রামচন্দ্র বর দিতে চাইলে তিনি বললেন— "রাম যদি বর দিবে তবে এই বর দাও— আমার যদি শূকর যোনিতেও জন্ম হয় তাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে।"[২]

মোহমুক্ত শুদ্ধা ভক্তির উদাহরণ দিতে গিয়েও তিনি রামায়ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন— "রামচন্দ্র নারদকে একবার বর দিতে চাইলেন। নারদ বললেন, যদি একান্তই আমায় বর দেবে তবে এই বর দাও, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই! রাম বললেন, আর কিছু বর লও। নারদ বললেন আর কিছুই চাইনা। কেবল তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি।"[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মতে অবতার বা ঈশ্বর কল্প ব্যাক্তিদের প্রভাবে মানুষের মনের মোহাবরণ ঘুচে যায়। তিনি রামায়ণ থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাঁর ভক্তদের মোহ-মুক্ত হয়ে ঈশ্বর জ্ঞান বা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে বলেছেন— "রামচন্দ্র যখন সভাতে এলেন, তখন সভায় শত সূর্য্য যেন উদিয় হল। তবে সভাসদ লোকেরা পুড়ে গেলনা কেন? তার উত্তর —তাঁর জ্যোতি জড় জ্যোতি নয়। সভাস্থ সকলের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হল। সূর্য্য উঠলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।"[৪]

দেবর্ষি নারদও রামচন্দ্রের কাছে মোহমুক্তি ও শুদ্ধাভক্তি কামনা করেছিল —রাম তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। কেবল শুদ্ধা ভক্তি দাও।

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম কথিত, ৪র্থ ভাগ, পৃ, ৩৪।
২। প্রাগুক্ত, ১ম ভাগ, পৃ, ২৯৬।
৩। প্রাগুক্ত, ৩য় ভাগ, পৃ, ২৩১।
৪। প্রাগুক্ত, ২য় ভাগ, পৃ, ১৮।

অবতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি রামাবতারের উল্লেখ করেছেন— "অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে জানতে পারেনা; গোপনে আসে। দুই চারিজন অন্তঃরঙ্গ ভক্ত জানতে পারেন। রাম পূর্ণ ব্রহ্ম, পূর্ণ অবতার, একথা বারজন ঋষি কেবল জানত। অন্যান্য ঋষিরা বলেছিলেন হে রাম, আমরা তোমাকে দশরথের ব্যাটা বলে জানি।"[১] ভরদ্বাজ ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন আর বলেছিলেন—'হে রাম তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে।"[২] পরশুরামও রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে স্তব করেছিলন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, রাম রাম বলে তাঁর সমাধি হত। হৃৎপদ্মে তিনি রামরূপ দর্শন করেছিলেন। রাম রাবণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি রামচন্দ্রকে ব্রহ্ম সনাতন রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন—

"রাবণকে একজন বলেছিল তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রামরূপ ধরনা কেন? রাবণ বল্লে রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে রম্ভা তিলোত্তমা এদের চিতাভষ্ম বলে বোধ হয়। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়। পরস্ত্রীর কথা দূরে থাক। রামরূপ দর্শনে শ্রবনে মননে মানুষের জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ভোগতৃষ্ণা দূরে যায়।"[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে দেবতা কেবল নিরাকার পরমব্রহ্ম অবাঙমানস-গোচর নন। তিনি সাকারও বটে, প্রেমময়ও বটে। রামচন্দ্রকে যেমন তাঁর কোন কোন ভক্ত পরমব্রহ্ম চিদঘন আনন্দঘন মূর্তিতে দেখেছেন আবার অনেকে তাঁকে প্রেমময় রূপে দেখেছেন— "বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে রামচন্দ্র সহস্র ঋষিকে দেখেছিলেন। তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন সস্নেহে। তাঁরা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। কোন পুরাণে আছে তারাই গোপী"।[৪]

অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে তিনি আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ঈশ্বরের প্রেমময় রূপ বর্ণনা করেছেন— "লক্ষ্মণ রামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাম তুমি কত রূপে কতভাবে থাক, কি রূপে তোমায় চিনতে পারবো। রাম বললেন

১, ২. ৩, ৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১ম ভাগ পৃ, ১৮, ১৯, ২১৫, ৮৪।

ভাই, একটা কথা জেনো, যেখানে উঙ্খিতা ভক্তি সেখানে নিশ্চয় আমি আছি। উঙ্খিতা ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কারও এরূপ ভক্তি হয় নিশ্চয় জেনো ঈশ্বর সেখানে স্বয়ং বর্তমান। চৈতন্যদেবের এরূপ হয়েছিল।" ভক্তেরা দেখল তাদের আচার্যদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনও তাই।[১]

বিশ্বাসই শুদ্ধা ভক্তির সহকারী। যার বিশ্বাস নেই তার ভক্তিও নেই। বিভীষণ একজনকে সমুদ্র পার হওয়ার জন্য কাপড়ের খুঁটে 'রাম নাম বেঁধে দিয়ে ছিলেন। লোকটি অনায়াসে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলল। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর সে কাপড়ের খুঁট খুলে দেখে তাতে কেবল রামনাম লেখা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল এই ক্ষুদ্র রাম নাম লেখায় কি হবে। যেই ভাবা অমনি জলের তলায় ডুবে গেল।[২] এসব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি তাঁর ভক্তদের ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস রাখার উপদেশ দিতেন।

সংসার পরম ব্রহ্মেরই লীলা। সর্বভূতে তিনি বিরাজমান। আবার তাঁরই মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অনন্তকোটি জগৎ বিরাজিত। "যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হল দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্ঠ দেবের শরণাপন্ন হলেন— যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি বিমনা হয়ে বসে আছেন, অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বললেন, রাম তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া? আমার সঙ্গে বিচার করো। রাম দেখলেন সংসার সেই পরম ব্রহ্ম থেকে হয়েছে, তাই চুপ করে রইলেন।[৩]

অপর একটি দৃষ্টান্তের দ্বারাও শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শনের কথা বলেছেন। 'জাহাজ ডুবি হয়ে একদিন এক সদাগর ভাসতে ভাসতে লঙ্কার কূলে এসে পৌঁছালো। বিভীষণ লোকটিকে দেখতে পেয়ে রামচন্দ্রের নররূপের বসনে ভূষণে তাঁকে পূজারতি করলেন'।[৪]

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতে তপস্যার দ্বারা, সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সাধন করতে হয়। মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনকের জীবনে এই জ্ঞান -কর্মের সমন্বয় সাধন হয়েছিল। জনক রাজার দুটি তলোয়ার একটি জ্ঞানের

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫ম ভাগ, পৃ, ১০১।
২। প্রাগুক্ত ১ম ভাগ, পৃ, ২৯।
৩। প্রাগক্ত ৩য় ভাগ, পৃ, ৭৫।
৪। প্রগুক্ত ৪র্থ ভাগ, পৃ, ৮৭।

আর একটি কর্মের। তিনি তপস্যা দ্বারা এই নিষ্কাম কর্ম সাধনা লাভ করেছিলেন।১

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব জগৎ প্রপঞ্চে ভালো মন্দ, আলো অন্ধকার লাভ ক্ষতি সবকিছুকেই সমান মর্যাদা দিতেন। রামায়ণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন "সীতা একদিন রামচন্দ্রকে বললেন অযোধ্যায় সব যদি অট্টালিকা হতো তো বেশ হতো। অনেক বাড়ী দেখছি ভাঙ্গা, পুরানো। রাম বললেন, সব বাড়ী সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কি করবেন।"

পরমহংস দেবের উপদেশের একটি বিশেষ বাণী ছিল যার যেমন তার তেমন'। বিভীষণের রাজ ভক্তি দেখিয়ে তিনি এর সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন।" সীতা উদ্ধারের পর বিভীষণ রাজ্য করতে রাজী হলেন না। তখন রাম বললেন তুমি মুর্খদের শিক্ষার জন্য রাজ্য করো। নাহলে তারা বলবে বিভীষণ রামের সেবা করেছে তার কি লাভ হলো। রাজ্য লাভ দেখলে তারা খুশী হবে।"২

এইভাবে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও লৌকিক রামায়ণ কাহিনী থেকে উদাহরণ দিয়ে তিনি ভক্তদের উপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ সীতা, হনুমান, নারদ, বিভীষণ প্রভৃতি ভক্তদের মত তিনিও ছিলেন রামময় জীবিত। রাম ও রামকৃষ্ণ ছিলেন অভেদ। বহুবার তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ভাবে উদ্দীপিত হয়েছেন। কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি শিষ্যদের সামনে তাঁর অন্তিম বাণী —"যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনি ইদানিং রামকৃষ্ণ।"

ভারতবাসীর যা সাধনা, যা আরাধনা তারই মূর্ত প্রতীক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ রামায়ণ মহাভারতকে দেখেছেন, বিশেষতঃ রামলক্ষ্মণ, ভরত সীতা চরিত্র তাঁর চিত্তে বিশেষ রেখাপাত করেছে, ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সীতা চরিত্রের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাই তিনি বহুবার ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ হিসাবে সীতা চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত প্যাসাপ্রোনায় সেক্সপীয়র ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তিনি

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃ, ২৩৬।

২। প্রাগুক্ত, ৫ম ভাগ, পৃ, ৬।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বন করে রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত সার সংকলন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি রামায়ণ মহাকাব্যকে ভারতবাসীর জীবনাদর্শের প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন। দস্যু রত্নাকরের ঋষি বাল্মীকিতে পরিণত হওয়ার ঘটনা তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণ করে বিবৃত করেছেন। রামায়ণ কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী সমূহে প্রচলিত কাহিনী, যেমন কৃষিক্ষেত্রে সীতার জন্ম, ভারতীয় কন্যাদের স্বয়ম্বরা হওয়া, রাজন্যগণ কর্তৃক বীর্যশুল্ক দ্বারা কন্যা লাভ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রামচন্দ্র হরধনুভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন। সত্যবদ্ধ রাজন্য-বর্গ যে কোন মূল্যে সত্য রক্ষা করতেন। রাজা দশরথ সত্য রক্ষার জন্য তাঁর প্রিয়পুত্রকে বনবাসে পাঠালেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজসিংহাসন ত্যাগ করলেন। সর্বশেষে রামচন্দ্র প্রজাসত্য পালনের জন্য বা প্রজাদের মনোগত বিশ্বাস ও অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সীতাদেবীকে নিষ্কলঙ্ক ও শুদ্ধ স্বভাবা জেনেও বনবাসে পাঠালেন।

স্বামীজী তাঁর প্রদত্ত ভাষণে রামায়ণের সমাজে আর্যদের সঙ্গে গভীর অরণ্যবাসী অনার্যদের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে প্রথম দিকে বেশী যোগাযোগ ছিল না। "আর্যগণ সে সময় ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসীগণের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তাঁহারা বন্য জাতিদিগকে 'বানর' নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত 'বানর' অর্থাৎ বন্য জাতিদের মধ্যে যাহারা অতিশয় বলবান ও শক্তিশালী হইত, তাহারা আর্যগণ কর্তৃক 'রাক্ষস' নামে অভিহিত হইত।" ভারতের জাতি পরিচয়' ও 'রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা' গ্রন্থেও স্বামীজীর এই মন্তব্যের সমর্থন মেলে।

ভারতের প্রাচীন প্রথায় অগ্রজের পত্নী মাতৃ স্থানীয় গুরুজন। তাঁদের প্রতি এতদূর সম্মান প্রদর্শন করা হত যে, "লক্ষ্মণ সীতার বাহু বা গলদেশের, দিকে কখনও চাহিয়া দেখেন নাই, সুতরাং বানরগণ—প্রদর্শিত অলঙ্কারটিকে সীতার কণ্ঠহার বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। এই আখ্যানটিতে ভারতের

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয় পৃ, ২১৭-১৮।

প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়।[১] রামায়ণের যুগে আর্য রাজন্যবর্গ অনার্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রেও আবদ্ধ হতেন এবং পরস্পর সত্যরক্ষা করে চলতেন। আর্যই হোক বা অনার্যই হোক অত্যাচারী রাজাকে দমন করার জন্য সকলেই ঐক্যবদ্ধ হতেন। মহৎ প্রাণ অনেক অনার্যবীর আর্য রাজাদের একান্ত অনুগত ও গুণমুগ্ধ ছিল। সুগ্রীব হনুমান ও গুহক এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিবেকানন্দ তাঁর প্রদত্ত ভাষণে রামচন্দ্রের বানর বাহিনীর দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধনের ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণ করেছেন,—"সেখানে রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ করিল। উহার নাম 'সেতুবন্ধ'—ঐ সেতু ভারতের সহিত লঙ্কার সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছে। খুব ভাঁটার সময় এখনও ভারত হইতে লঙ্কায় বালুকাস্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।[২] বলাবাহুল্য ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যস্থলে ভারত মহাসাগরের, জলের গভীরতা কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু ভাঁটার সময় সেখানে যে খানিকটা বালির চড়া পড়ে তাও সত্য। স্বামীজীর এই তথ্যানুযারী রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনকে অস্বীকার করা যায় না। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীও কিরূপ সাহায্য করেছিল তাও স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায়নি; সে সঙ্গে তিনি সর্বজীবে সমদৃষ্টি সম্পন্ন রামচন্দ্রের মহত্ত্ব তুলে ধরেছেন। ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালী বালির উপর গড়াগড়ি যেত। তার গায়ে যে বালিগুলি লাগত সেতুর উপরে এসে সেগুলি ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলত। এভাবে সে নিজের সামর্থানুযায়ী রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন কার্যে সাহায্য করেছিল। বানরগণ এই ব্যাপার দেখে হাসাহাসি করলে তিনি তাদের বললেন—"কাঠবিড়ালটির মঙ্গল হউক, সে তাহার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিরা তাহার কার্যটুকু করিয়াছে, অতএব সে তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সমান। এই বলিয়া তিনি আদর করিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইলেন।"[৩]

রামায়ণ কাহিনী আলোচনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। রাম-সীতা ভারতবাসীর

১, ২, ৩। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ, ২২২ ২২৩, ২২৭।

আদর্শ। ভারতের বালক বালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করেন। ভারতীয় নারীগণের চরম উচ্চাকাঙ্খা পরম শুদ্ধস্বভাবা পতি পরায়ণা সীতার মত হওয়া। সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সীতা সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শ হিসাবে আজও গণ্য। বিবেকানন্দ সীতাচরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। "পাশ্চাত্য দেশের বক্তব্য, কর্ম কর, কর্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও। ভারতের বক্তব্য দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করিয়াছে। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরমসীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি স্বরূপ, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা।"[১] সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব। ভগবান বুদ্ধও বলেছেন—

আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতিকার হইল না। উহাতে কেবল জগতে একটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হইবে।"[২] ভারতের এই বিশেষভাবটি সীতার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি আঘাতের প্রতিঘাত করার চিন্তা পর্যন্ত কখনো করেন নাই। সীতা চরিত্রের মাধ্যমে নারী জাতির প্রতি ভারতবাসীর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। —"যে জাতি সীতা চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে— ঐ চরিত্র যদি কাল্পনিকও হয় তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, নারী জাতির উপর সে জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগত তাহার তুলনা নাই।[৩]

কেবল সীতা, সাবিত্রী নয়, সীতা, সাবিত্রীর দেশের মেয়েদের প্রতিও ছিল তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—

"সীতা, সাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি, ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে মেয়েদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হতনা—ঠিক যেন পুরুষ! গাড়ি চালাচ্ছে, আফিসে বেরুচ্ছে, স্কুলে

১, ২। স্বামীজী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২২৩, ২২৭, ২২৮।

৩। প্রাগুক্ত ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৮১।

যাচ্ছে প্রফেসারি করছে। একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়াই।"১

বিবেকানন্দ তাঁর প্রদত্ত ভাষনে পাশ্চাত্য জাতির সম্মুখে দুঃখ কষ্টের প্রতিকারের দ্বারা দুঃখ লাঘব করার, দুঃখ কষ্ট সহ্য করে উহা নষ্ট করা, এই দুইয়ের মধ্যে মানবজাতির কল্যাণার্থে কোনটা অবলম্বন করলে মানব জাতির মধ্যে পশুভাব বশীভূত হয়ে দেব ভাব প্রতিষ্ঠা হবে তাই আলোচনা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাতের সম্মিলন চেষ্টাই ছিল এই মহান সাধকের জীবনব্রত। তাই তিনি এই দুই জাতিকে বিভিন্ন আদর্শ নিয়ে বিবাদ না করে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা প্রসূত একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে অনুরোধ করেছেন। প্রাচ্য তথা ভারতের জীবনাদর্শ রামায়ণে প্রতিফলিত। তেমনই হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসিতে পাশ্চাত্যের জীবনধারা প্রতিফলিত। এই দুই ধারার মধ্যে ভবিষ্যত মানব জাতি একটাকে গ্রহণ করবে।'

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামায়ণী কথা অবলম্বনে প্রথম রচনা। এতে তিনি ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' ও বাল্মীকির আদর্শ অনুসরণ করেছেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দরদী হৃদয়ের স্পর্শে উহা সর্বাংশে অনুবাদ না হয়ে বহুলাংশে মৌলিক রচনায় পরিণত হয়েছে। সীতার বনবাস কেবল জনকদুহিতা সীতার সীমাহীন দুঃখ বেদনার কাহিনী নয়—পুরুষ শাসিত সমাজে অবহেলিত লাঞ্ছিত নিপীড়ীত সমগ্র নারী জাতির দুঃখ বেদনার করুণ কাহিনী। "ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ ক্ষণে বাংলা দেশে হিন্দু সমাজের উপরিস্তরের বিক্ষোভের অভ্যন্তরে নারী জীবনের যে অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়েছিল সীতার বনবাস তারই সাহিত্যিক মহাভাষ্য হয়ে উঠেছিল।২

সীতার বনবাসের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে আলেখ্য দর্শন ও দুর্মুখের কাছে সীতার অপবাদ বার্তা শ্রবণে রামচন্দ্রের সীতা পরিত্যাগের সংকল্প বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী অংশে বিদ্যাসাগর বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। ভবভূতির রামচন্দ্রের মতই বিদ্যাসাগরের রামচন্দ্র দুর্মুখের মুখে সীতার অপবাদ বার্তা শ্রবণে সীতা পরিত্যাগের সংকল্প করেছেন বটে কিন্তু

১। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯বম খণ্ড, পৃ, ৩১

২। বাঙালী জিবনে বিদ্যাসাগর, সোমেন্দ্রনাথ সরকার, পৃ, ২৭৩

আসন্ন পত্নী বিরহে তিনি নিদারুণ শোকাভিভূত হয়েছেন। বিদ্যাসাগর ভবভূতির অনুসরণে রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণনা করলেও কোথাও তিনি দেশকালের সীমা অতিক্রম করে চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। উত্তর চরিতে শোকাভিভূত রামচন্দ্র সীতার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে নিদ্রিতা সীতার পাদদ্বয় মস্তকে ধারণ করে রোদন করেছেন।[১] কিন্তু বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালী মন, রামের শিরে সীতার পা ঠেকাতে বাঙ্গালী সুলভ দ্বিধায় পড়েছিলেন। তাই তিনি অন্যভাবে সীতার বিলাপ বর্ণনা করেছেন—" এই বলিয়া গলদশ্রু নয়নে বিশ্রামভবনে প্রতিগমন পূর্বক রাম নিদ্রাভিভূত সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক সাতিশয় করুণভাবে সম্বোধন করিরা বলিলেন, প্রিয়ে। হতভাগ্য রাম এজন্মের মত বিদার লইতেছে। এই বলিরা দুর্বিসহ শোকদহনে মুগ্ধহৃদয় হইয়া রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে বিদ্যাসাগর মোটামুটি বাল্মীকিকে অনুসংণ করলেও বাল্মীকির রামচন্দ্র অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের রামচন্দ্র অনেক বেশী শোক-বিহ্বল। রাম চরিত্র অংকনে তিনি ভবভূতিকেই অনুসরণ করেছেন। ভদ্রের মুখে সীতার অপবাদ বার্তা শ্রবনে বাল্মীকির রাম দুরপনেয় শোকাভিভূত হলেন কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন প্রকাশ পেল না। তিনি ভ্রাতাদের মন্ত্রণা গৃহে আহ্বান করলেন। ভ্রাতৃগণ সমবেত হলে রামচন্দ্র সীতার অপবাদও সীতা পরিত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করে লক্ষ্মণকে বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে রেখে আসতে বললেন—

১। সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা কত্বা, দেবী দেবী অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পাদপঙ্কজ স্পর্শঃ ইতি রোদিতি" —উত্তর রামচরিতাম —মহাকবি ভবভূতি প্রণীতম, হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ সম্পাদিত, পৃ, ৯৮।

২। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ, ৭৭।

৩। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, প্রাগুক্ত, পৃ, ২১৪।

"পৌরাপবাদঃ সুমহা স্তথা জনপদস্য চ।
অকীর্তির্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ॥
পতত্যেবাধমাল্লোকান যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে।
অকীর্তির্নিন্দ্যতে দৈবৈঃ কীর্তিঃ, লোকেষু পূজ্যতে।
কীর্ত্যর্থন্তু সমারম্ভঃ সর্বেষাং সুমহাত্মনাম।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান বা পুরুষর্ষভাঃ॥
অপবাদভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্।
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্ত পতিতং শোকসাগরে॥
ন হি পশ্যামাহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোধিকম্।
শ্বস্তং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতম্ রথম্॥
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্ত পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ॥
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈনাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দনঃ॥"[১]

এখানে রামচন্দ্রের কান্নাকাটি নেই—বিলাপ নেই। এই রামচন্দ্রের বাইরে সুখের কি শোকের বহিঃপ্রকাশ নেই। তিনি হিমালয়ের মত অচল অটল। মহাসমুদ্রের মতই গভীর গম্ভীর। তাঁর আদেশের অন্যথাচরণ করবে এমন কেহ নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর ভবভূতির অনুসরণ করতে গিয়ে করুণরসের বাড়াবাড়ি করেছেন। দুর্মুখের মুখে সীতার অপবাদ বার্তা শ্রবণে রামচন্দ্র স্ত্রীলোকের ন্যায় করুণ ক্রন্দন করেছেন—"হায়, কি সর্বনাশের কথা শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা আমার বক্ষস্থলে বজ্রাঘাত হওয়া ভাল ছিল। কি জন্যে এখনো জীবিত রহিয়াছি, আমি নিতান্ত হতভাগা, নতুবা কি নিমিত্ত উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বিসর্জন দিয়া আমায় বনবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল? কি নিমিত্তেই দুর্বৃত্ত দশানন পঞ্চবটীতে প্রবেশ পূর্বক প্রাণপ্রিয়া জানকীরে লইয়া গিয়া, নির্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব অপবাদে দূষিত করিয়াছিল? কি নিমিত্তেই বা সেই অপবাদ, অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে অপসারিত

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, বাল্মীকি প্রণীত, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, পৃ. ১৩৬৭-১৩৬৮।

হইয়াও দৈবদুর্বিপাকবশতঃ পুনর্বার নবীভূত হইয়া সর্বতঃ সঞ্চারিত হইবেক, সর্বথা, আমার জন্মগ্রহণ ও শরীর ধারণ দুঃখভোগের নিমিত্তেই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, অমূলক বলিয়া এই অপবাদ উপেক্ষা প্রদর্শন করি। অথবা এ জন্মের মত নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জন দিয়া কুলের কলঙ্ক বিমোচন করি ঃ কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনো আমার মত উভয় সংকটে পড়ে না।''[১] এই রামচন্দ্র শোকবিহ্বল অস্থির চিত্ত। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

রঘুপতি রামচন্দ্র প্রজাপালন কর্তব্যের অনুরোধে সীতাকে বনবাসিনী করেছেন। সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে তাই সীতাপেক্ষাও তাঁর মানসিক যাতনা বেশী। সীতা জানেন প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাম একান্ত সীতাগত প্রাণ হয়েও তাঁকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। কিন্তু রামের অন্তরে সান্ত্বনা কোথায়? তাই তাঁর অন্তর বিবিধ মানসিক দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত। তিনি অনবরত বিলাপ করতে লাগলেন—''কেনই আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, কেনই আমি পুনরায় রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলাম।.......... আমার আত্মঘাতী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃস্কর ছিল; ইত্যাদি প্রকারে তিনি অহোরাত্র বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।''[২]

সীতার বনবাসে বিদ্যাসাগর আধুনিক নগর সভ্যতার সঙ্গে তপোবন সভ্যতার তুলনা করে শান্ত রসাস্পদ তপোবন ভূমির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। লক্ষ্মণ ভাগীরথী তীরে সীতাকে পরিত্যাগ করে এলে রোরুদ্যমানা সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে মহর্ষি বাল্মীকি বলেছেন—''জনপদবাসীরা, বন, এই শব্দ শুনিলে ভয়াকুল হয়, কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। ঋষিদের তপস্যার প্রভাবে, হিংস্র জন্তুরাও স্বভাবসিদ্ধ হিংসা প্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া পরস্পর সৌহৃদ্যভাবে কালহরণ করে। তপোবনের এইরূপ মহিমা যে স্বল্পকাল অবস্থিতি করিতে পারিলেই চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন হয়।''[৩] বলাবাহুল্য নগর সভ্যতার প্রমাণ সীতার জীবনেই রয়েছে।

১। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯২-২৯৩।

২, ৩। ৩০৮-৩০৯।

নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ মাতৃত্বে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্মীকি ও ভবভূতিকে অতিক্রম করে সীতা চরিত্রে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়েছেন। বাল্মীকির আশ্রমে সীতা যুগল সন্তান প্রসব করার পর নিজের দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করে অনবরত অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। মুনি কন্যারা তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। ঋষিকন্যাদের সান্ত্বনাবাক্যে সীতার শোকাশ্রু আরও বৃদ্ধি পেল। এমন সময় সদ্যপ্রসূত বালকদের ক্রন্দনে সীতার শোকাগ্নি বিমোচিত হল। 'স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি যে, তাহাদের ক্রন্দনশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, জানকী এক কালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।" তাদের আধ আধ কথার মা। মা। ডাক শুনে তিনি অপরিসীম আনন্দ লাভ করিতেন। "যখন তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন, তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন। তাঁহার সর্বশরীর অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল ও নয়ন যুগল আনন্দসলিলে পরিপ্লুত হইত।"[১]

মাতৃত্বেই নারী জীবনের পূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি। তাই বিদ্যাসাগর ভবভূতির অনুকরণে রামসীতার দাম্পত্যজীবনের পুনরাভিনয় করেননি। বিদ্যাসাগরের সীতা আবার পরীক্ষার কথা শুনে সভা স্থলে মূর্চ্ছা গেলেন। বাল্মীকির শত চেষ্টাতেও তাঁর আর মূর্চ্ছাভঙ্গ হল না। সীতা মানবলীলা সম্বরণ করলেন। সীতার বনবাসে বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতীয় রাজতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। ভারতীয় রাজতন্ত্রে রাজা অমিত শক্তিধর। কিন্তু সেই শক্তি জনসাধারণের ইচ্ছা বা মতামতের দ্বারা ছিল নিয়ন্ত্রিত। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ স্থলে মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রের সীতা পরিগ্রহ বিষয়ে সমবেত জনমণ্ডলীর অনুমোদন প্রার্থনা করলেন। সমাগত রাজন্যবর্গ. অভিজাতবর্গ এবং উপস্থিত মুনি ঋষি সকলে সীতা পরিগ্রহ বিষয়ে সাগ্রহে সম্মতি দান করলেন। কিন্তু সাধারণ প্রজারা মৌন হয়ে রইলেন। প্রজাদের বিনা অনুমতিতে রামচন্দ্র তাঁর পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারলেন না।

১। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (৩য় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ, ৩১২—১৩।

নাগরিকগণের মতামতের ছিল এমনই মর্যাদা। ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে জনসাধারণ ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং রাম রাজত্বে রাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্রই প্রচলিত ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহু বৈচিত্রাপূর্ণ বিরাট সাহিত্যভাণ্ডারে মহাভারত ও গীতোক্ত কৃষ্ণ চরিত্র এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ অবাঙমানসগোচর কল্পলোক বিহারী দেবতা নহেন—তিনি মানব শ্রেষ্ঠ। বহুধা বিভক্ত অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জমান ভারতবাসীর একমাত্র উদ্ধারকর্তা পরিত্রাতা তিনি। বঙ্কিমের মতে একমাত্র কৃষ্ণ চরিত্রের অনুধ্যান ও অনুকরণে ভারতবাসী তার আত্মস্বরূপকে ফিরে পেতে পারে। কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় বাল্মীকির নরচন্দ্রমা শ্রীরামচন্দ্রও ছিলেন বহুগুণযুক্ত দেবদুর্লভ শ্রেষ্ঠ মানব। অথচ রাম চরিত্র বা রামায়ণ কাহিনীর প্রতি লেখকের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়নি। লেখকের সমস্ত সহানুভূতি ছিল কৃষ্ণ চরিত্রের উপর। বঙ্কিমের রামায়ণ বিষয়ক একমাত্র রচনা ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত'। এছাড়া কোন ইংরাজ লেখকের রামায়ণের উপর একটি সমালোচনা নিবন্ধ তিনি তাঁর লোকরহস্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইংরাজ লেখকের রামায়ণের সমালোচনাটিতে রামায়ণের প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্রকে বিকৃত করে দেখান হয়েছে। ইংরাজ সমালোচক রামায়ণের মর্মার্থ, কাব্যরস, চরিত্র মাহাত্ম কিছুই উপলব্ধি করতে পারেন নি। সমালোচক লক্ষ্মণকে নির্বোধ, সীতাকে অসতী, রামের রাজ্যত্যাগ ও বনগমন আলস্যতা নিবন্ধন, ভরতের অনায়াসলব্ধ রাজ্য রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতা এবং সীতার পাতাল প্রবেশকে রামচন্দ্র কর্তৃক সীতাকে পাতালে পুঁতিয়া ফেলা বলে বর্ণনা করেছেন। সমালোচক কৃত্তিবাস কবিকে বাল্মীকির পূর্ববর্তী এবং রামায়ণ কাহিনী 'রামারণ' নামে কোন এক মুসলমান ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচিত বলে মনে করেছেন। সমালোচক আরও বলেছেন—'রামায়ণ শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, শব্দটি রামযবণ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র! কেবল বকার লুপ্ত হইয়াছে। 'রাম্যযবন' রামা নামক কোন মুসলমান ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন। পরবর্তীকালে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বাল্মীক মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থটি বল্মীক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি রামায়ণ

নামে খ্যাত হইয়াছে।[১] সমালোচকের উর্বর মস্তিষ্ক আরও কল্পনা করেছে যে কোন যুদ্ধ ঘটনা নাই বলে রামায়ণের একটি কাণ্ডের নাম হইয়াছে 'অযোধা কাণ্ড' বা অশুদ্ধ সংস্কৃতে অযোধ্যা কাণ্ড।

বঙ্কিমের রামায়ণ বিষয়ক সমালোচনা নিবন্ধ ভবভূতির উত্তর রামচরিত। উত্তর রাম চরিতের উপাখ্যান রামায়ণ অবলম্বনে লেখা হলেও রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল নেই। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতার বাল্মীকির আশ্রমে বাস, লব, কুশের জন্ম, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সীতার শপথ বাক্য উচ্চারণ ও পাতাল প্রবেশ বর্ণিত হয়েছে। আর উত্তর চরিতে লব, কুশের জন্মের পর সীতার রসাতলে বাস, লক্ষ্মণ পুত্র চন্দ্রকেতুর সঙ্গে লবের যুদ্ধ এবং সীতার সঙ্গে রামের সপুত্র পুনর্মিলন বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমের মতে বাল্মীকি বহির্ভূত এরূপ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে ভবভূতি আত্মশক্তি এবং রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। ভবভূতি ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের অনুমোদনে সীতার পাতাল প্রবেশ ও তজ্জনিত শোকাবহ ঘটনা বর্ণনা করেন নাই।

উত্তর চরিতের প্রথমাঙ্কের চিত্রদর্শন উপলক্ষ্যে রামসীতার পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করে লেখক উভয়ের প্রগাঢ় অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ করেছেন। এরূপ প্রগাঢ় প্রণয়ী স্বামীর পক্ষে পতিব্রতা পত্নীকে লোকমনোরঞ্জনার্থে পরিত্যাগ করা যে কি কঠিন কি মর্মঘাতী লেখক তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সীতা বিসর্জনের সময় বাল্মীকির রামচন্দ্র কখনো কাঁদেন নাই। রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্বিত ভাব "আমি ইক্ষাকু বংশীয় রাজা শ্রীরামচন্দ্র, লোকেরা আমার মহিষীর অপবাদ করে, আমি এই অপকীর্তি সহিব না। যে স্ত্রীর লোকাপবাদ আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।[২]

ভবভূতির রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু দুর্মুখের কাছে সীতার অপবাদ শুনে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন—

"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহ পবিত্রিত বসুন্ধরে! হা নিমিজনক বংশ নন্দিনী! হা! পাবক বশিষ্ঠারুন্ধতী প্রশস্ত শীল শালিনী!

১, ২। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃ, ৩৬, ২০০।

হা রামময় জীবিতে। হা মহারণ্যবাস প্রিয়সখী। হা। প্রিয় স্তোক বাদিনী। কথমেবংবিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ" ।১

ভবভূতির উত্তর রামচরিতে রামচন্দ্রের করুণ বিলাপ সম্বন্ধে বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন— নাট্যকারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিতের রামবিলাপ মনোহর নহে— সে কথাগুলি বীর কাব্য নহে—নব প্রেম মুগ্ধ সাধারণ যুবকের কথা।২ বলাবাহুল্য এই নবযুবক বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কটাক্ষ করেছেন।

উত্তর রামচরিতে ভবভূতির কল্পনা আকাশচারী। ঘটনা, পরিবেশ, চরিত্র সৃষ্টি ও বনপ্রকৃতির বর্ণনায় ভবভূতির প্রতিভা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। বনদেবী বাসন্তী, ঋষি পত্নী আত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, মানবীরূপিনী নদী তমসা ও মুরলা প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে রামসীতার বিরহ মিলনের সামিল হয়েছেন। বনদেবী বাসন্তী বিরহিনী সীতার সখী। ঋষি পত্নীরা ও সমগ্র বনপ্রকৃতি সীতার দুঃখে কাতর। সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন ঘটানোর জন্য এঁরাই পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করেছেন। এঁরা সীতার বিরহে কাতর রামচন্দ্রের সেবায় নিযুক্তা আবার কখনো বা পতি বিরহিনী কৃশাঙ্গী সীতার আর্ত হৃদয়ের সন্তাপ হরণে ব্যাপৃতা। যেমন তৃতীয় অঙ্কে সীতা সহবাসের চিহ্ন পরিপূর্ণ জনস্থানে শোকসন্তপ্ত রামচন্দ্র পরিভ্রমণ রত। পূর্বস্মৃতি চারণ করতে করতে তিনি মনে মনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছেন। রঘুকুলদেবী ভাগীরথী তখন মানবী মূর্তি ধারণ করে সব সন্তাপ হারিণী ছায়ারূপিণী সীতাকে রামের কাছে পাঠালেন। রামচন্দ্র পরমপরিতৃপ্তি লাভ করলেন। ছায়াসীতা রামচন্দ্রের অদর্শনীয়া হয়ে রইলেন। তৃতীয় অঙ্কে ছায়াসীতার সৃষ্টি করে নাট্যকার নাটকীয় পরিবেশ ও নাট্যরস আরও ঘনীভূত করে তুলেছেন। নাটকের মধ্যে নাটক অভিনয়ে ভবভূতির আর একটি কৃতিত্ব। সীতার বনবাস অংশটি অভিনীত হতে দেখে দর্শকচিত্ত যখন করুণরসে দ্রবীভূত হয়ে উঠে সেইসময়ে সশরীরে সীতার আবির্ভাব ও রামসীতার মিলন দৃশ্য দর্শক বা পাঠক মাত্রকেই আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

১, ২। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ২০০, ২০৬।

বঙ্কিম প্রতিভা বাল্মীকির অমর মহাকাব্য রামায়ণের পরিবর্তে উত্তর রামচরিত কেন অবলম্বন করেছিলেন এ বিষয়ে বঙ্কিম সাহিত্যের সমালোচকরা নীরব। সম্ভবতঃ মনে হয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভবভূতির উত্তর রামচরিত বাঙালী পাঠকের অজ্ঞাত ছিল; বঙ্কিম উত্তর চরিত প্রবন্ধ রচনা করে ভবভূতির উত্তর রামচরিতের প্রতি বাঙ্গালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'বাল্মীকি ও তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণ ও রামায়ণের সমসাময়িক যুগে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকির সমসাময়িক যুগে ভারতে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক রাজা নিজ দেশে স্বাধীন ছিলেন। খুব কম রাজা রাজচক্রবর্তী হওয়ার আশা পোষণ করতেন। অন্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ মহাভারতের তুলনায় রামায়ণের যুগে কম ছিল। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। রামায়ণের যুগে পররাজ্য আক্রমণ করার কথা মোটেই শোনা যায়না। ভারতের আর্য রাজারা ইউরোপের ফিউডাল প্রভুদের মত নিত্য নূতন রক্ত স্নান করতেন না। তাঁরা পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

আভ্যন্তরীন রাজনীতির ব্যাপারে রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তবে রাজাকে বিভিন্ন সদগুনের দ্বারা ভূষিত হতে হতো। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময় দশরথ রামচন্দ্রকে যে উপদেশ দেন, ভরত চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্রকে আনতে গেলে রামচন্দ্র ভরতকে যে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিলেন তাতে সে যুগের রাজধর্ম এবং রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাজার উপর দেবত্ব আরোপ করা হতো বা প্রজাদের চেয়ে রাজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হতো। অরাজক রাজ্যের যে কি অবস্থা তা দশরথের মৃত্যুর পর বশিষ্ঠকে প্রজাপুঞ্জের অনুরোধের মধ্যে ধরা পড়ে। রাজারা নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হতেন। রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সীতার সঙ্গে যে কথা বলেছিল তা থেকে সীতা তাকে বুঝতে পারেনি। হনুমান রামলক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছিলেন। রাজারা বহু বিবাহ করতেন। তাঁদের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই তিন জাতীয়া পত্নী মহিষী, বাবাতা, পরিবৃত্তি নামে পরিচিতা ছিলেন। রাজাদিগের বীর্যবত্তার গৌরব ছিল সবচেয়ে অধিক। রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করেছিলেন বীর্যবত্তার পরীক্ষা দিয়ে, পরশুরামকেও রামচন্দ্র বীর্যবত্তার দ্বারা পরাজিত করেছিলেন।

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে হত। রামচন্দ্রকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাবণসহ বহু রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু রামায়ণে বর্ণিত যুদ্ধ বর্ণনা লেখক সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ, "বাল্মীকি ঋষি যুদ্ধ স্বচক্ষে কখন দেখিয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই জানেন, বোধ হয় জনশ্রুতি, অথবা কল্পনাই তাঁহার যুদ্ধ বর্ণনের মূলমন্ত্র। বাল্মীকি বর্ণিত সংগ্রাম ক্রিয়ার উপর আমি একবিন্দুও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তাঁহা কর্তৃক বর্ণিত অস্ত্র শস্ত্র মাত্র ও সেনানিবেশ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বোধে বিশ্বাস করিব।[১] কিন্তু কেবল চাক্ষুষ জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান নহে। তার প্রমান মহাভারতের কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ। ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিন সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের খবর পেয়েছেন। অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননা অথচ যুদ্ধের সমস্ত খবর রাখেন। বাল্মীকি যিনি মহাকাব্যের লেখক তাঁকেও যুদ্ধের সমস্ত জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয়েছিল বলেই মনে হয়।

রামায়ণ ও তৎসমসাময়িক যুগে বৃহৎ যুদ্ধাদির সময় রথারোহী, গজারোহী অশ্বারোহী ও পদাতিক এই চার রকমের সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করে শিরস্ত্রান বর্ম প্রভৃতির দ্বারা শরীর আবৃত করে সাজান হত। সমকক্ষ প্রতিযোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ হত। সেনাপতির পরাজয়ে যুদ্ধাবসান ঘোষণা কয়া হতো। দৈহিক বলের প্রাধান্য ছিল। বীরত্বের সম্মান ছিল। দুই বীরের মধ্যে পরস্পর মল্ল যুদ্ধ হতো। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি ও তাদের বন্ধুরা রথের সারথ্য করতো। প্রত্যেক রাজার ধ্বজ বা পতাকা থাকতো। রঘুবংশীয়দের ধ্বজের নাম কোবিদার ধ্বজ, গুহের ধবজের নাম স্বস্তিকা। যুদ্ধের জন্য জলপথ সম্ভতঃ ব্যবহার হতোনা। এক মাত্র গুহক ছাড়া কারও নৌ সৈন্য ছিল না।

রামায়ণ ও তৎসমসাময়িক যুগে ভারতীয় আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই এই চার বর্ণের প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের শীর্ষ-স্থানীয়। জ্ঞানের সাধনা ছিল ব্রাহ্মণদের প্রধান কর্তব্য কর্ম। এছাড়া রাজ্য চালান সম্পর্কে তাঁরা রাজার প্রধান মন্ত্রী রূপেও কাজ করতেন। তাঁদের বুদ্ধি ও পরামর্শ দ্বারা রাজ্য পরিচালিত হত। যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য পরিচালনা

১। বঙ্গদর্শন, শ্রাঃ ১২৮২, পৃ, ১৭৭—৭৮।

হত। যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য পরিচালনা ছিল ক্ষাত্রিয়দের কাজ। বৈশ্যরা কৃষিকার্য ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করত। সমাজে কৃষি কার্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। প্রয়োজন বোধে রাজারা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা হল চালনা করতেন। রাজারা কৃষি কার্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। ভরত চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্রকে নিতে এলে রামচন্দ্র ভরতকে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিলেন তাতে রাজারা কৃষি কার্যের প্রতি কিরূপ নজর রাখতেন তা সহজে বোঝা যায়—'সীমন্তে ক্ষেত্রসকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর যথা নদীজলে কৃষি-কার্য সুসম্পন্ন হইতেছে ত? সেই সুসমৃদ্ধ জনপদত এক্ষণে উপদ্রবশূন্যত? কৃষক ও পশুপালকেরা তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে ত এবং উঁহারা স্ব স্ব কার্যে রত থাকিয়া সুখ স্বাচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে ত? ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ করিয়া তুমি উঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক ত'? কৃষির পক্ষে ইহা অপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? কৃষির ন্যায় পশুপালনও একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা ছিল। রাজারা স্বয়ং লোকদ্বারা পশুপাল রক্ষা এবং কৃষিকার্য করতে ত্রুটি করতেন না। রামায়ণ থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে লেখক কৃষি ও কৃষকের কিছু কিছু দুরবস্থার কথাও বর্ণনা করেছেন। কৃষিকার্যে জনপ্রথা প্রচলিত ছিল। বড় বড় কৃষকের অধীনে দিনমজুরেরা কাজ করতো, উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজকর দিতে হত। তারা তাদের ধন কিছু মাত্র সঞ্চয় করতে পারলেই ভূগর্ভে প্রোথিত করতো। রাম বনে গমন করছেন বলে অযোধ্যার হতভাগ্য প্রজারা আশংকা করছে যদি ধন সঞ্চিত হয় তা মাটিতে প্রোথিত করলেও কৈকেয়ী পুত্র ভরত হস্তগত করিবে। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করতো।

কৃষি অপেক্ষা ব্যবসায়ীদের আয় বেশী ছিল। ৫০ টাকা আয় করে তাদের ১ টাকা কর দিতে হত। ক্ষুদ্র শিল্প ও ছোটখাট ব্যবসায়ীদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। রাজার জন্য বেগার খাটার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দেশের মধ্যে অন্তর বাণিজ্য ও বাহির্বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। যে কোন বাণিজ্যের উপযোগী রাজপথ, খাল, ঋণদান ব্যবস্থা বা ব্যাংক প্রথা চালু ছিল। কৃত্রিম সরিৎ প্রভৃতির উল্লেখ দেখে খাল খনন করা হত বলে মনে হয়। বহুদূরগামী বাণিজ্য কেবল স্থলপথে নহে জলে পথেও প্রচলিত ছিল। 'নাব সমুদ্রিয়' শব্দের দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজকেই বোঝাত। মনুসংহিতার নারদীরা সূত্রে সমুদ্রগামী জাহাজের উল্লেখ আছে।

লেখকের মতে প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা জলপথে সমুদ্রে গমন করে ব্যবসা বাণিজ্য করত না। কিন্তু দূরদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দেশের লোকেরা ভারতবর্ষে আগমন করে ভারতীয় দ্রব্যের সঙ্গে বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী করতো। বাইবেলের একজায়গায় বলা হয়েছে ইউফেটিশ নদীই পৃথীবীর পূর্বদেশের সীমা। ভারতের কোন উল্লেখ নাই। আবার ঐ বাইবেলেই পূর্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নেওয়ার জন্য বণিকদিগের যাতায়তের পথের উল্লেখ আছে। লেখক মনে করেন—"এই পথ নিঃসন্দেহেই বহু পূর্বতর দেশে প্রধাবিত এবং ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ বাল্মীকির পূর্ব হইতে স্থাপিত ও পরেও প্রচলিত, অতএব উহা বাল্মীকির সময়ের উপরেও বর্তে।"[১]

এই প্রবন্ধে লেখক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে গমনাগমন পথের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সে যুগে ভারতবর্ষ এত জনবহুল ছিল না। বিস্তীর্ণ ভূভাগ গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। দেশের প্রচুর নদনদী শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছিল। রামচন্দ্র মিথিলায় যাওয়ার সময় গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমে অঙ্গদেশ পার হয়েও ভীষণ অরণ্য প্রদেশ অতিক্রম করলেন এই অরণ্য প্রদেশে পূর্বে মলদ ও করূষ নামে দুই জনপদ ছিল। তাড়কা ও তার বংশাবলীর দ্বারা উহা জনশূন্য হয়ে অরণ্য প্রদেশে পরিণত হয়েছে। তারপর বিভিন্ন নদী পার হয়ে ঋষিদিগের আশ্রম অতিক্রম করে বিশালা থেকে জনকের রাজ্য মিথিলায় এসে উপস্থিত হন।

পিতৃসত্য পালনার্থ রামের অযোধ্যা থেকে চিত্রকূট পর্যন্ত পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে বাল্মীকি কেবল নিষাদরাজের শৃঙ্গবের পুর, বৎস দেশ, প্রয়াগ প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলের নাম করেই চিত্রকূটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্থানে স্থানে প্রচুর বনভূমি আছে কিন্তু সেগুলির নাম উল্লেখ করেন নি। তারপর ভয়ংকর জন্তু ও রাক্ষস সংকুল অরণ্য পথের মধ্যে দিয়ে রামকে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে গেছেন। সেখানে অনার্যদের বসতি। আর্যধর্ম প্রচারক কয়েকজন ব্রাহ্মণ তপস্বী সেখানে আশ্রম করে বাস করেন। আদিম আদিবাসীরা তাঁদের নানা ভাবে উৎপাত ও হিংসা করে।

১। বঙ্গদর্শন, ১২৮২,

মাতুলালয় থেকে ভরতের অযোধ্যা আগমনের পথে ও বিভিন্ন দেশ নদনদী ও বনভূমির পরিচয় রয়েছে। মাতুলালয় থেকে বের হয়ে ভরত পূর্বমুখে সুদামা নদী, পশ্চিম মুখে হ্রাদি নদী পার হয়ে ঐলধান গ্রাম, শতদ্রু, শিলা ও আকুবর্তী নদী পার হয়ে অগ্নি কোণে শলাকর্ষণ দেশ, তারপর শিলাবহা নদী পার হয়ে অনেক বনভূমি পার্বত্য পথ অতিক্রম করে চৈত্ররথ কাননে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে গঙ্গা ও সরস্বতী সঙ্গম অতিক্রম করে বীরমৎস্য দেশের উপর দিয়ে ভারুণ্ড বন হয়ে কুণ্ডলিকা নদী পার হয়ে আশুবান গ্রামের সন্নিকটে গঙ্গা পার হলেন। তারপর কোটেকষ্টি নদী পার হয়ে ধর্মবর্ধন গ্রামে এসে উপস্থিত হন। গেরন গ্রামের মধ্যে দিয়া জম্বু প্রস্হে, সেখান থেকে উজ্জিবান গ্রাম হয়ে উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হলেন। লোহিত্য গ্রামে কপিতবতী নদী প্রকশাল গ্রামে স্হানুমতী নদী, বিনত গ্রামে গোমতী নদী তারপর কুলিঙ্গ নগরে শালবন অতিক্রম করে ভরত স্বরাজ্য অযোধ্যা নগরে এসে উপস্হিত হলেন। ভরতের মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় আগমনের পথ বর্ণনায় লেখক বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণ করেছেন।

মহামহোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার বিরাট সাহিত্যভাণ্ডারে রামায়ণ বিষয়ক বাল্মীবির জয় ও ভারত মহিলা নামে দুটি নিবন্ধ পুস্তক রচনা করেছেন। বাল্মীকির জয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত একটি অনন্য সাধারণ গদ্য-কাব্য। এই নিবন্ধটিতে তিনি বাল্মীকির অসাধারণ মানবপ্রেম বর্ণনা প্রসঙ্গে অপর দুই মহাপুরুষ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কর্মধারার তুলনা মূলক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির দুটি অংশ; একটি অংশে তিনি বাল্মীকির সমসাময়িক যুগে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক আরও দেখিয়েছেন নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, আর্য-অনার্য বিরোধ কি গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল, সবলের অত্যাচারে দুর্বলের হয়েছিল কি অসহনীয় অবস্হা। অপর অংশটি অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। দস্যু তস্করের ভয়ে জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত। শুধু ভারতে নয়, ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতেও শান্তি ছিল না। ভারতীয় প্রবল প্রতাপ ক্ষত্রিয় নরপতিগণ দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকেও পদানত করতেন। ক্ষত্রিয় রাজাদের মনে পৃথিবী জয় করে রাজচক্রবর্তী হওয়ার বাসনা ছিল প্রবল। ব্রাহ্মণেরা চাইতেন ক্ষত্রিয়দের উপর প্রভুত্ব করে ব্রাহ্মণ্য অধিকার বজায় রাখতে

আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিভিন্ন গোষ্ঠি ছিল, এদের মধ্যেও সম্ভাব ছিল না। তবে ভারতবর্ষে তখন জাগতিক হীন স্বার্থের ঊর্ধ্বে বিচরণকারী বহু গুণ যুক্ত পুরুষও ছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্টে মানুষের মধ্যে হীন স্বার্থের হানাহানি দেখে তাঁদের অন্তর বিগলিত হতো। তাঁরা মানুষকে হিংসা দ্বেষ ভুলে শান্তিতে বাস করতে বলতেন। তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠে ছিল মানবতার জয়গান,—মানুষে মানুষে শত্রু নহে, মানুষে মানুষে ভাই ভাই।

প্রবন্ধের প্রথমে দেখা যায় তিনজন অমিত শক্তিধর মহাপুরুষের তিন রূপ। ঋভুদের কণ্ঠ নিঃসৃত মানুষে মানুষে ভাই ভাই গান শুনে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র বাহু বলে পৃথিবী জয় করে মানুষকে এক রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন করে মানুষের মনে ভ্রাতৃভাব জাগাতে চাইলেন—'আমার সংস্কার এই, দিগ্বিজয়—ভিন্ন অন্য কিছুতেই পৃথিবীতে ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যবন্ধন হইতে পারে না। দিগ্বিজয়ী রাজা পিতার ন্যায় : সমস্ত প্রজাকে সন্তানেয় ন্যায় : প্রতিপালন করেন, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই হইয়া উঠে।[১]

বশিষ্ঠ চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণের বুদ্ধি বলে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে তার বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে সব মানুষকে এক করবেন,—"বুদ্ধি বলে কিনা হয়? আমি বাল্যকাল হইতে তাহাদের মন অন্যপথে ফিরাইয়া দিব। ভোগ সুখে রত করাইব। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা জন্মিতে দিব না। একবারে গ্রন্থাদিপাঠ হইতে বঞ্চিত করিব। এইরূপে এক পুরুষে না পারি, অন্ততঃ দশ পুরুষেও মনুষ্যে মনুষ্যে দূরে থাকুক, মনুষ্যে পশুতেও ভ্রাতৃভাব জন্মাইয়া দিব।"[২] দু'টি নীতিই ভ্রান্ত নীতি। এতে মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্র জাগে না। কিন্তু যিনি কবি, যাঁর অন্তর মানুষের ব্যথায় ব্যথিত, দুঃখে বিগলিত, তিনি মানুষকে হিংসা দ্বেষ ভুলিয়ে মানুষকে প্রেমের বন্ধনে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।—"বাল্মীকি ভাবিতেছেন, কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি। মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই? এই যে ঋতু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম।

১। হরপ্রসাদ রচনাবলী—১ম সম্ভার, ১৩৬৩, বুকস্ এ্যাণ্ড পাবলিকেসন, পৃ, ৩০৬, ৩০৭।

২। হরপ্রসাদ রচনাবলী—১ম সম্ভার, ১৩৬৩ বুকস্ অ্যাণ্ড পাবলিকেসন, পৃ, ৩০৭।

তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিন। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতেও পারিলাম না। হায়ঃ কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম? কোথায় সব ভাই ভাই হব, না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এই জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল? আবার যেন বাজিল ভাই, ভাই, ভাই। বাল্মীকির নয়ন জলে বুক ভাসিয়া গেল।"[১]

প্রেমের টান বড় টান, এ টানে বহু পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। বাল্মীকির গানে ও বীণা বাদনে দস্যুরাজ গুহক দস্যু বৃত্তি ছেড়ে হলেন বাল্মীকির সহায়ক। বাল্মীকি বীণা বাজাতে বাজাতে একদিন নগরের মধ্যে কোলাহল শুনতে পেলেন। তিনি দেখলেন দস্যুদল নগর আক্রমণ করেছে, সেখানে গিয়ে তিনি গানের দ্বারা দস্যুদের মন ফিরাতে চেষ্টা করলেন। দলপতিকে বললেন. "তোমরা একর্ম ছাড়।......একবার পরের জন্য কাঁদ দেখি, সকলেই তোমার সঙ্গে কাঁদিবে, বাল্মীকির রোদনে ও ভাই, ভাই গানে দলপতি মুগ্ধ হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লুঠতরাজ ছেড়ে দিতে বললেন। তাঁর নিজের দল সঙ্গে সঙ্গে লুঠতরাজ ছেড়ে দিল। কিন্তু তাঁর দলের সঙ্গে ছিল যবন, রাক্ষস ও বানররা। তারা নগর লুঠ করতে না পেরে দস্যু শিবির আক্রমণ করল। দস্যুরা প্রতি আক্রমণ করল না। যতই মারধর খায় ততই তারা বাল্মীকির সঙ্গে "ভাই ভাই এক হও গানে" যোগ দিল আর অঝোরে কাঁদতে লাগল। বাল্মীকি গানে রাক্ষসদের কাছে যবনদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। তাঁর গান উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠল। মানব দুঃখ বর্ণনায় পূর্ণ হল। হৃদয় মুগ্ধ হল। রাক্ষসগণও ক্রমে মোহিত হল। গানের সুরে যেন বলা হল—"ভাইরে, যা করেছিস করেছিস, আর করিসনে। দেখ দেখি, তোর যদি এমন হয়, তুই কি করিস? সকলেই মানুষ তো? তোর শরীর যেমন রক্ত মাংসময়, সবারই তেমনি। মনে কর যদি তোর লাগে, কত দরদ হয়, কিন্তু আপনার একটু লাগিলে অস্থির হয়, আর অন্যের মস্তকে তরবারির আঘাত করিস। আহা! একবার মনে কর দেখিরে, তাদের তখন কি হয়। পরের ছেলের মাথা অনায়াসে কাটিস, কিন্তু একবার মনে কর দেখিরে তোর নিজের ছেলের ওরকম হলে কি হয়?"[৩] আক্রমণকারী দস্যুরা কেঁদে ভাসাল। প্রেমের টানে সব হিংস্রতা ভেসে গেল।

১, ২, ৩। হরপ্রসাদ রচনাবলী—প্রাগুক্ত, পৃ, ৩০৪, ৩৫৪, ৩৫৫

বাল্মীকির জয় প্রবন্ধে ত্যাগ প্রেম ও করুণার কাছে হিংসা দ্বেষ আর একবার হার মানল। কোশাম্বী নাথের যজ্ঞ সভা। বশিষ্ঠ পুরোহিত; বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের দল যজ্ঞে বাধা দেবেন। দুই পক্ষ প্রচুর সৈন্যবাহিনী ও যোদ্ধা প্রতি যোদ্ধা নিয়ে প্রস্তুত। এখানে বাল্মীকিও গুহক বিবাদ মিটাতে চাইলেন। কিন্তু এসব স্বার্থপর পাষান হৃদয়ে করুণার লেশ মাত্র নাই। মহা অনর্থ হয় হয় এমন সময় ভূপাতিত বিশ্বামিত্রের দরাবগলিত অশ্রু ধারার দুই ফোঁটা ব্রাহ্মণদের গায়ে পড়ল। দেহ অশুদ্ধ হয়েছে ভেবে স্নান করে আবার যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হল। এসময় আকাশ থেকে এক বিরাটকায় পুরুষ যজ্ঞকুণ্ড মধ্যে পতিত হলেন। বিবদমান দুই পক্ষই ভয় পেল। বাল্মীকি দেখলেন এই বিরাট পুরুষ বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মর্ষিগণের কাছ থেকে ব্রাহ্মণত্ব না পেয়ে তিনি কঠিন তপস্যা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর তপোবল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীও ধংস হল।—"তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি সকল আরও বিশিলষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে গদা যত ঘুরিতে লাগিল, বিশ্বামিত্রের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নীহারিকারূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নীহারিকা সমূহ যে দিক হইতে আসিয়াছিল, ভীম বেগে সেই দিকে চলিয়া গেল। অনন্ত—গর্ভ গহ্বর যেমন ক্ষীণালোকময় ছিল, তেমন ক্ষীণালোকময়ই রহিল। আর নীহারিকাকুল যে সকল নক্ষত্রাদি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত মধ্যে নূতন পৃথিবী জলের বিম্ব জলের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া গেল।"[১] মহাশূন্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি নিজে পৃথিবীতে এসে পড়লেন, ব্রহ্মার অনুগ্রহে তিনি জীবিত মাত্র রইলেন। তাঁর মত্ততার হল শেষ। বিশ্বামিত্রের পরিণতি দেখে বাল্মীকির বীণা আবার করুণ সুরে মোহিত হল। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব দান করলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে যজ্ঞোপবীত পরিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সব জাতি হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে এক হল। বাল্মীকি গান এক হল। বাল্মীকি গান গাইতে গাইতে ব্রহ্মাকে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন। ব্রহ্মা তাঁকে পুনরায় আলিঙ্গণ করে বললেন, বাল্মীকি আজ তোমারই জয়। বশিষ্ঠ তাঁকে আরও দৃঢ় আলিঙ্গণ করে বললেন, "বাল্মীকি আজ তোমারই জয়।" বিশ্বামিত্র আলিঙ্গণ করে বললেন, "বাল্মীকি আজ তোমারই জয়।"

১। হরপ্রসাদ রচনাবলী—১ম খণ্ড, পৃ, ৩৫৮।

গুহকের লোক চিৎকার করে উঠল জয় বাল্মীকির জয়—দিকদিগন্ত বাল্মীকির জয় ধ্বনির প্রতিধ্বনি হল।' তারপর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ক্ষমা, ক্ষত্রিয়ের বীর্য, কবি হৃদয়ের বিশাল উদারতা নিয়ে সর্বমানব কল্যাণের মহানব্রত গ্রহণ করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থে ব্রহ্মসনাতন নারায়ণ নররূপে আবির্ভূত হলেন। আদর্শ মানবের চরিত্র মহিমায় জগতের অকল্যাণ দূর হল। বাল্মীকিরই জয় হল। বাল্মীকির অমর মহাকাব্য রামায়ণ জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। এই হল বাল্মীকির জয় প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার। বাল্মীকির জয় প্রবন্ধে লেখক বিশ্বামিত্রের বিজয় বাহিনীকে পৃথিবী জয়ে বের করেছেন—অদ্য হিমালয় দ্বারে শিবির সংস্থাপন করিয়াছি। পূর্বাঞ্চলে চীন, হূন, সান্মান, শ্যাম, মগ, নাগাদি, রাজ্য—মধ্যে বিশৃংখলা সমুৎপাদনের জন্য ভেদক্ষম সুচতুর বিশ্বস্ত মন্ত্রীবর্গকে প্রেরণ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলে শক যবন পারদ দরদ,আরব,পারস, ম্লেচ্ছও কিরাতাদি জাতি সমূহকে উচ্ছৃংখল করিবার মানসে নব নবতি অক্ষোহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছি। সকল স্থান হইতে সুসমাচার আসিয়াছে। হিমালয় জয়ের পর একবার সসৈন্যে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই আমার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হয়।''[১] কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতীয় বাহিনীর ভারতের বাইরে রাজ্য বিস্তারের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ভারতের বাইরে ভারতবাসীর রাজ্য জয় অনেকটা অনৈতিহাসিক। একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে কাবুল, কান্দাহার, হীরাট, মাকরাণ, বাকট্রিয়া প্রভৃতি ভারতের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আর কণিষ্কের সময় কাশগড়, ইয়ারখাদ, খোটান কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। অবশ্য সে সময়ে এসমস্ত রাজ্যগুলি বৃহত্তর ভারত নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে পররাজ্য আক্রমণের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতীয়েরা ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য ভারতের বাইরে যাতায়াত করতেন এবং সে সব দেশে ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। তাছাড়া বাল্মীকির রামায়ণে বিশ্বামিত্রের বা অন্য কোন ভারতীয় নরপতির উক্ত রূপ দিগ্বিজয়ের কোন উল্লেখ নাই। A. V, Keith-এর মতানুযায়ী রামায়ণ যদি খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে

১। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৬।

রচিত হয়ে থাকে[১] তবে সে সময়ে কোন ভারতীয় নরপতি ভারতে বাইরে দিগ্বিজয় করেন নাই। অবশ্য অশোকলিপি ও সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ কিম্বদন্তী অনুযায়ী সে সময়ে ভারতের বাইরে ভারতীয়দের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল।

'ভারত মহিলা' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রথম প্রবন্ধ পুস্তিকা। এতে তিনি রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির বিশিষ্ট নারী চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। সীতা চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সীতাকে সুশীলা শান্ত স্বভাবা বালিকা বলেছেন। কিন্তু কার্যকালে তিনি দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, রামের বনগমন সময়ে রামচন্দ্র তাঁকে কিছুতেই বন-গমনে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেন নি। তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে রামচন্দ্র তাঁকে বনবাসসঙ্গিনী করেন। অশোকবনে বন্দিনী সীতাকে রাবণ স্ববশে আনার জন্য নানাভাবে স্তবস্তুতি করলে তিনি সত্যিকারের ক্ষত্রিয় রমণীর তেজ প্রদর্শণ করেছেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় তাকে সিংহের পাশে শৃগাল বলে ডেকেছেন। রাবণবধের পর তাঁকে রামচন্দ্রের কাছে আনা হয়। রামচন্দ্র হঠাৎ তাঁর উপর বিরূপ হয়ে উঠলেন। নানারূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করে তাঁকে অপমান করলেন। এবারও তিনি ক্ষাত্র রমণীর স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রদর্শণ করে লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন। লোকাপবাদ ভীত রামচন্দ্র তাঁকে বনবাসে পাঠালে তিনি স্বামী রামচন্দ্রকে এতটুকু দোষারোপ করেন নি। নিজের অদৃষ্টকেই তিনি দায়ী করেছেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাস যাপনের পর ঋষিরা রামচন্দ্রকে সীতা পরিগ্রহ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রামচন্দ্র সর্বসমক্ষে সীতাকে আবার শপথ গ্রহণ করতে বললেন। এবারের অপমান সীতার সহ্য হল না। অত্যধিক মনকষ্টে তিনি ধরিত্রী গর্ভে অন্তর্ধান করলেন।

'ভারত মহিলা' পুস্তকের অন্যত্র তিনি ভারতের দুই মহিয়সী মহিলা সীতা

---

১ "Valmiki and those who improved on him probably in the period 400—200 B. C."—
History of Sanskrit Literature—A, V, Keith, Oxford University Press, page—43,

ও সাবিত্রীর চরিত্রাঙ্কন করেছেন। উভয়ে প্রায় সমজাতীয়া রমণী হলেও লেখকের মতে সীতা ধীর স্বভাবা স্নেহপরায়ণা, সাবিত্রী কর্মকুশলা পরিশ্রমী। "কর্ম ক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহ প্রবৃত্তি সম্যক প্রকাশিত হয় নাই।"[১] সীতা ও সাবিত্রী স্ব স্ব ক্ষেত্রে উভয়ে সমান স্নেহশালিনী ও সমান তেজস্বিনী বলে মনে হয়। সীতা যেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সেখানে কেউ তাঁকে টলাতে পারেনি। তাঁর মধ্যে স্নেহ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা যুগপৎ সমানভাবে বিকশিত হয়েছে। সাবিত্রীর স্নেহ প্রবৃত্তি বিকাশের বিশেষ সুযোগ ছিলনা, যতটা ছিল দৃঢ়তা প্রকাশের।

দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণী কথা বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামায়ণ বিষয়ক প্রথম চরিত্রচিত্রন ও সমালোচনামূলক গ্রন্থ। এতে তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে রামায়ণের প্রতিটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং যুক্তি ও তথ্য সহকারে প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। তাই তিনি দশরথ, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা, হনুমান বালী প্রভৃতি প্রতিটি চরিত্র দোষেগুণে নিখুঁতভাবে অঙ্কন করতে পেরেছেন।

রামায়ণে দশরথ চরিত্রের উপর স্বৈরন ও কামাসক্ত বলে দোষারোপ করা হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন দশরথ চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে দশরথের চরিত্রের দোষস্খালন করে তাঁর এই প্রতিজ্ঞার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কৈকেয়ীকে বিবাহ করার সময় তিনি কৈকেয়ী পুত্রকে ভবিষ্যতে রাজ্য দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।[২] কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রধানা মহিষী কৌশল্যা পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করা হয়েছে। লেখকের মতে অপুত্রক দশরথ পুত্র কামনায় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "প্রধানা মহিষী অপুত্রক হইলে কিংবা কৈকেয়ীর পুত্র জ্যেষ্ঠ হইলে, তাঁহার সিংহাসনের দাবী অগ্রাহ্য হইবে না।"[৩] লেখকের

১। হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫০।

২। "ভাই' পূর্বে আমাদের পিতা যখন তোমার মাতাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি এই রাজ্য শুল্ক দিবেন বলিয়া পিতামহের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন—অর্থাৎ তাঁহার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে এই রাজ্য দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন'—বাল্মীকি রামায়ণ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৭৫।

৩। রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ, ২।

এই যুক্তি অত্যন্ত তথ্যানিষ্ঠ। কারণ দশরথের মত সত্যনিষ্ঠ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাজার পক্ষে রূপজ মোহে জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে যে বঞ্চিত করবেন একথা ভাবা যায় না।

বাল্মীকির নরচন্দ্রমা রামচরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে দীনেশ চন্দ্র সেন রাম চরিত্রের ভালমন্দ দোষগুণ সুখদুঃখ সব কিছুকে গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। রামচন্দ্রের আসন্ন বনগমন সংবাদে অযোধ্যার রাজগৃহে সকলেই শোকসন্তপ্ত, একমাত্র রামচন্দ্র ধীর স্থির সংকল্পে অবিচলিত। উপস্থিত পুরোহিত, মন্ত্রী, অমাত্য সকলে যখন কৈকেয়ীকে দোষারোপ করছেন তখন কৃতাঞ্জলিবদ্ধ রামচন্দ্র কৈকেয়ীকে অনুরোধ করলেন শীঘ্র মাতুলালয় থেকে ভরতকে এনে যেন রাজ্যাভিষিক্ত করা হয়। অথচ এই দৃঢ় চরিত্র বীর, মাতা কৌশল্যা ও পত্নী সীতার কাছে এসে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন, "রামের মানসিক দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গেল, সৌম্য অবিকৃত ভাব নাই, তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল। তাঁহার সুন্দর শ্যামল ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল।"[১] লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দ্বারা রামের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন। এতক্ষণ তিনি ধৈর্য্য ধরে ছিলেন। কিন্তু আপন জনের কাছে এসে হৃদয়ের বেদনা আর চেপে রাখতে পারলেন না।

রামচন্দ্র তাঁর বনবাস দুঃখের জন্য পিতা ও বিমাতা কাকেও দায়ী করেননি বরং লক্ষ্মণ কৌশল্যা ও ভরতকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাঁর এই ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য দৈবকেই তিনি দায়ী করেছেন ঠিকই, তথাপি লক্ষ্মণের কাছে তাঁর অন্তরের ক্ষোভ দু' একবার প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম রাত্রির কষ্ট, জনিত ব্যথিত চিত্ত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন—রাজা অবশ্য অত্যন্ত মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম ত্যাগ করিয়া কাম সেবা করে, তাহাদিগের দশরথ রাজার ন্যায় দুঃখ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আমার মন্দ ভাগ্যা জননী আজ শোকসাগরে পতিত হইয়াছেন। এরূপ কোথাও কি শোনা যায় লক্ষ্মণ, যে বিনা অপরাধে প্রমদার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ আমার ন্যায় ছন্দানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন?[২]

রামচন্দ্রের বালীবধ অনেকে সমর্থণ করেন না। লেখক গভীর সহানুভূতির

১, ২। রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ: ২৯, ৩৭

সঙ্গে রামচন্দ্রের বালীবধের পিছনে কি মানসিকতা কাজ করেছে তা দেখিয়েছেন রামচন্দ্র ও সুগ্রীব উভয়েরই পত্নী অপহৃতা, পত্নী বিরহে উভয়েই সমব্যথী। এই দুই জনের মধ্যে তাই সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। সুগ্রীবের শত্রু তাঁরও শত্রু, বালীবধ করে তিনি বন্ধুর রাজ্য ও পত্নী উদ্ধার করলেন। রামচন্দ্রের বালীবধের সপক্ষে লেখক আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে পত্নী বিরহে বিরহী রামচন্দ্র তখন পত্নী অপহারক মাত্রেরই উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিলেন। বালীর দোষগুণ বিচার করার মত মানসিকতা তাঁর ছিল না। তাঁকে দণ্ড দেওয়ায় তখন তাঁর একমাত্র কাম্য। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে বালীকে বধ না করে কেন যে তিনি বৃক্ষান্তরাল থেকে বধ করলেন তার কোন সদুত্তর লেখকও দিতে পারেন নি। অবশ্য এসব ছোটখাট ত্রুটিগুলির দ্বারাই রাম চরিত্র মনুষ্য স্বভাবানু-গামী হয়েছে বলে লেখক মন্তব্য করেছেন,—"রাম চরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায় উহা কথঞ্চিৎ নমিত হইয়া ভূ স্পর্শ করিতেও সেই অবনয়ন তাহার নভস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুন্ন করে না। পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিকে আশ্বস্ত করে মাত্র।"[১]

রামায়ণের প্রতিটি চরিত্রে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। একমাত্র ভরতের চরিত্র নির্দোষ ত্রুটিহীন। অথচ সকলেই ভরতকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। পিতা দশরথ, জেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র,কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ,অযোধ্যার প্রজাসাধারণ এমন কি সর্বজ্ঞ ঋষি ভরদ্বাজ পর্যন্ত ভরতকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাছাড়া রামচন্দ্রের বালীবধ,সাগরপারে সীতার প্রতি কটূক্তি, সীতার লক্ষ্মণের প্রতি এবং কৌশল্যার দশরথের প্রতি কটূক্তি প্রভৃতি প্রতিটি চরিত্রের কিছু না কিছু দোষত্রুটির পাশে ভরত চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভরতের মত এমন নিষ্কলুষ চরিত্র কোন দেশের কোন কবি, কোন কাব্যে এমন মহৎ চরিত্র আজও সৃষ্টি করতে পারেন নি।

রামায়ণের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র লক্ষ্মণ। লেখক বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে লক্ষ্মণ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। রামায়ণে ভাগ্য বিড়ম্বনায় ভরত সকলের সন্দেহভাজন হয়েছিলেন আর লক্ষ্মণের ভাগ্যে জুটেছিল সকলের উপেক্ষা: পিতা দশরথ, মাতা সুমিত্রা, পত্নী ঊর্মিলা ও অযোধ্যার জনসাধারণ কেহই জেষ্ঠ্যের অনুগামী স্বেচ্ছাতাপসী রাজকুমারের

১। রামায়ণী কথা, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৭

জন্য একবিন্দু অশ্রুবিসর্জন করেন নাই। রামের যেমন সহিষ্ণুতা ও আত্ম-ত্যাগ, লক্ষ্মণেরও তেমন শৌর্য্যবীর্য ও আত্মবিলুপ্তি অসাধারণ। তিনি কখনো কোন অন্যায় সহ্য করেন নি। রামের বনগমনের সময়ে, বনবাসে সীতার সঙ্গে (মায়ামৃগ প্রসঙ্গ) তাঁর উক্তির প্রত্যুক্তি অত্যন্ত বীরোচিত। লক্ষ্মণ অতি সহজে যেমন বালকোচিত ক্রোধে অধীর হয়ে উঠেন তেমন বিপদে তিনি সবসময় ধৈর্য ধারণ করেন। সীতা হরণের পর রামচন্দ্র যখন অস্থির এবং অর্ধোন্মাদ তখন তিনি রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং কর্মে প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন। লক্ষ্মণের সব চেয়ে বড়গুন তাঁর আত্মসংযম। বনবাস যাপনের সময় তিনি অহর্নিশি রামসীতার প্রেম মহোৎব প্রত্যক্ষ করেছেন, কুটীরাভ্যন্তরে নবপরিণীতা প্রেমিকযুগল আর কুটীর দ্বারে স্বেচ্ছাব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে অতন্দ্র প্রহরী। কখনো তাঁর মনে এতটুকু দ্বিধা এতটুকু সংশয় আসেনি। এত সংযম এত আত্মত্যাগ জগতে দুর্লভ। অথচ দীনেশ চন্দ্র যেন লক্ষ্মণ চরিত্রের এই দিকটির প্রতি উপেক্ষা করেছেন।

কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা প্রভৃতি রামায়ণের প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি লেখক বিভিন্ন দিক থেকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্ম পরায়ণা কৌশল্যা চরিত্রের মধ্যে লেখক একদিকে আদর্শ পত্নী ও আদর্শ জননীর চিত্রাঙ্কন করেছেন। নানাভাবে তিনি রামকে বনগমনে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু যখন ধর্মপরায়ণ পুত্রের বনগমনে দৃঢ় সংকল্প দেখলেন তখন আর বাধা না দিয়ে পুত্রের মঙ্গল কামনায় দেবার্চনা করেছেন। পুত্রকে বনে পাঠিয়ে তিনি পতি সেবায় নিরত হলেন।

রামের রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রাপ্তির পর রামের বনগমন ও ভরতের রামকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাল্মীকি কৈকেয়ী চরিত্রের একমুখী বিকাশ দেখিয়েছেন। এ পর্যন্ত কৈকেয়ী প্রচণ্ড স্বার্থ ও প্রতিহিংসাবশে পরিচালিত হয়েছেন। সংকল্পে তিনি অচল অটল। কোন যুক্তি কোন তর্ক তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। সম্রাজ্ঞীর অটল গাম্ভীর্য নিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত কার্য সাধনে তৎপর হয়েছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এই স্বার্থান্ধ কঠিন অনমনীয় চরিত্রটির প্রতি শ্রদ্ধাহীন পাঠক চিত্তের কিছুটা সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। তিনি কৈকেয়ীর এই স্বেচ্ছাচারী স্বভাবের জন্য রাজা দশরথ, কৌশল্যা এমন কি রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলকে কিছু না কিছু পরিমাণে দায়ী করেছেন। রাজা দশরথ সুন্দরী তরুণী ভার্যা কৈকেয়ীর কাছে

নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন কৌশল্যা, কৈকেয়ীর সমস্ত নির্যাতন নীরবে সহ্য করে তাঁকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেছেন। কৈকেয়ীর দুর্ব্যবহারের কথা রাজাকে কখনো বলেন নি। রামচন্দ্র কৌশল্যা অপেক্ষা ও কৈকেয়ীকে অধিক সেবা ও ভক্তি করেন বলে কৈকেয়ীর মুখেই শোনা যায়। এভাবে সকলের আদর যত্ন ও ক্ষমাশীলতায় বর্ধিতা কৈকেয়ী চিত্তের অসংযম বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাছাড়া দশরথ ভরত মাতুলালয়ে থাকতে থাকতে রামাভিষেকরূপ এত বড় কাজ সারতে যাওয়ায় কৈকেয়ীর মনের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার উপর মন্থরার কুমন্ত্রনা ও তার খল স্বভাব কৈকেয়ী চরিত্রকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

ভারতের নারী জাতিরআদর্শ স্থানীয়া, সর্বজনপূজ্যা সীতা বাল্মীকির মানস দুহিতা। তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে দিয়ে সীতা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাই এই চরিত্রটি কোন বিচার কোন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। দীনেশ চন্দ্র সেনও এই চরিত্রটির উপর কোন নূতন রেখাপাত করতে পারেন নি।

রামায়ণের মহাবীর হনুমান চরিত্রের বিশেষ গুণগুলির প্রতি দীনেশচন্দ্র সেন পাঠকের দৃষ্টি অকর্ষণ করেছেন। হনুমান কেবল চঞ্চল স্বভাব বানর জাতি নহে। সে ধীর স্থির কর্তব্য কর্মে অবিচলিত ও সংস্কৃতজ্ঞ। অনার্য বীর হয়েও আর্যোচিত বহু গুনে হনুমান চরিত্র বিভূষিত।

রামায়ণে বালীবধের জন্য রামচন্দ্রের স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়েছে দীনেশচন্দ্র সেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যালোচনা দ্বারা তা খণ্ডন করেছেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের পক্ষ হয়ে কন্যাস্থানীয়া ভ্রাতৃবধূ গ্রহণকারী বালীকে বধ করেছেন কিন্তু তাঁর আশ্রিত ও পক্ষাবলম্বী সুগ্রীবও যে মাতৃস্থানীয়া ভ্রাতৃবধূকে ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে গ্রহণ করে সমান নিন্দার্হ ও শাস্তি যোগ্য হয়েছিল বালীর রুচিও পারিবারিক সম্ভ্রমবোধ রামচন্দ্রকে সে কথা জানাতে দ্বিধাবোধ করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত যাত্রা, পালাগান, পাঁচালীগান ও নাটগীতাভিনয় ছিল বাঙ্গালীর নাটকাভিনয়ের পূর্বাবস্থা বা প্রথম যুগ। ভাড়ামী, প্রহসন ও আদিরস পরিবেশনই ছিল এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর রুচি ও সংস্কৃতি বাংলা রঙ্গমঞ্চকে ভাড়ামী, প্রহসন ও আদিরসের প্রভাব মুক্ত করার

জন্য রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচনা শুরু করেন। রামায়ণ বিষয়ক নাটকগুলিতে মূল কাহিনী অংশটুকু মাত্র রামায়ণ থেকে গ্রহণ করে নাট্যকার স্বীয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেও এ যুগের নাট্যকাররা কেবল ভক্তিরস পরিবেশন করেন নি, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাতীয়তাবোধ ও মানবতা বোধের দ্বারাও তাঁরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন! তাই তাঁদের নাটকে যেমন একদিকে পুরাণাশ্রিত ভারতীয় ভক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা যায় তেমনই বস্তুতান্ত্রিক আধুনিক জীবনবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এ যুগের নাট্যকারদের কাছে রাবণ কেবল লম্পট, পরস্ত্রী অপহারক নহে। রাবণের সীতাহরণের স্বপক্ষে তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে রাম-লক্ষ্মণের অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য সে সীতাকে চুরি করেছিল। আবার কেউ কেউ রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেও তার মধ্যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহও ঘোষণা করেছেন। রামায়ণের অনেক অলৌকিক কাহিনী তাঁদের নাটকে বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে পরিবেশিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় নাটক রচয়িতাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, তিনকড়ি বিশ্বাস, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু নাট্যকার রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা করে যুগ চাহিদা পূর্ণ করতে পেরেছিলেন বলে তাঁদের নাটক তখন বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কাছে ও বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের অধিকাংশ রামায়ণ বিষয়ক নাটক কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করে লেখা। সীতার বিবাহ নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাড়কা বধ, অহল্যা উদ্ধার ও রামসীতার বিবাহ বর্ণনায় কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। তাড়কা বধের সময় বিশ্বামিত্র তাড়কার বাসস্থানের কাছে এসে জানতে পারলেন দশরথ রামলক্ষ্মণকে না দিয়ে ভরত ও শত্রুঘ্নকে দিয়েছেন। বিশ্বামিত্র ভরতকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে বললে ভরত অযোধ্যায় ফিরে যেতে অস্বীকার করে। কারণ তা হলে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে।" ব্যাঘ্রে মম নাহি ডর, যাইতে নারিব আমি পিতৃ-সন্নিধানে, পিতৃ-আজ্ঞা হইবে লঙ্ঘন।"[১]

ভরত দশরথের মিথ্যা শিক্ষানুযায়ী একবার নিজেকে রাম আবার ভরত বলে পরিচয় দিয়েছে। নাট্যমঞ্চে দর্শকদের প্রীতি উৎপাদনের জন্য তিনি বিশ্বামিত্রকে ভীরু, কাপুরুষ ও হাস্যাস্পদ করে চিত্রিত করেছেন। রাম ও তাড়কার যুদ্ধের সময় বিশ্বামিত্র ভয়ে পর্বতের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন এবং দেহে পত্রাচ্ছাদন, কর্ণে অঙ্গুরীয় ও দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করেছিলেন।

নাটকের মধ্যে রামসীতার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর রাজা মহারাজারা যে ধনু নড়াতে পারেন নি সীতা অবহেলে তা উঠাতে পারতেন। আর খেলার ছলে অন্ন তৈরী করে বহু লোক খাওয়াতে পারতেন। জনক রাজার রাণী সীতার হাবভাব দেখে ভয় পান—

"কথার আভাষে তরাসে কাঁপে মা কায়া। আনিলে গোলোক হইতে ভূলোকে ঠেলিতে পায়। দয়াময়, দেহ দেখা, কতদিন রব একা আর।'[১] হরধনু ভঙ্গের সময় ক্ষত্রিয় কুমার লক্ষ্মণের শৌর্য বীর্য প্রকাশ পেয়েছে।"— দাদা উপহাস করে সভাস্থলে, কি ছার এই শরাসন, শৃঙ্গ ভঙ্গ রঘুমণি। না সহে ক্ষত্রির প্রাণে আর।"[২] পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় কুমারেরা বীর্যহীন হয়েছে একথা বীর লক্ষ্মণ সহ্য করতে পারে না।

অহিংসায় ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব। হিংসা ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বভাব বিরোধী। হিংসাপ্রবৃত্তির জন্য পরশুরামের ব্রহ্ম তেজ নষ্ট হয়ে গেছিল।

"ধর্ম নষ্ট হিংসায় তোমার,
হিংসার প্রভাবে—
বিপ্রতেজ ক্ষুন্ন তব দেহে"[৩]

রামের বনবাস নাটকটিতে স্বপত্নী দ্বন্দ্ব ও নারীর ঈর্ষাপরায়ণতা প্রভৃতি কৈকেয়ী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য দশরথের বিরুদ্ধে কৈকেয়ীর অভিযোগও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। রাম ও ভরত একদিনে জন্মেছে। কিন্তু রাজা ছল করে রামের জন্ম আগে বলে ঘোষণা করেছেন। রামকে কাছে রেখে সর্ববিদ্যা শিক্ষা দিয়ে রাজা হওয়ার উপযুক্ত করেছেন আর ভরতকে মাতুলালয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

রাজকুমারদের[২] প্রতি পিতা দশরথের অসম আচরণ রামের রাজ্যাভিষেকের সময় ভরতের অনুপস্থিতি সর্বোপরি দুষ্টা মন্থরার কুপরামর্শ সবকিছু মিলে কৈকেয়ীকে সপত্নী পুত্রের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলেছিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ অংশটি অবলম্বন করে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যোগ্য করে 'সীতাহরণ' নাটক লিখেছেন। অভিনয়ের প্রয়োজনে তিনি দুর্গা, মহাদেব, সাগর, সাগরের স্ত্রী, রত্নবালা, নদী প্রভৃতি রামায়ণ বহির্ভূত বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীর অনুকরণে তিনি এই নাটিটতে হর পার্বতীর কোন্দল বর্ণনা করে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন—

দুর্গা—"জানি চিরদিন, কুটিল, তুমি
সে কথা রেখেছ তুলে।
ভোলানাথ কে বলে তোমারে?
আশুতোষ, সদাশিব তুমি!"

মহাদেব—"চাহ কি কোন্দল আজি,
তাই নামে কর দোষারোপ?
দুর্গতি নাশিনী নাম তব
দুর্গতি করনা দূর।"[১]

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনে নিজে যেমন অজস্র নাটক লিখেছেন তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীন সেন ও মধুসূদন প্রভৃতির বহু উপন্যাস ও কাব্যের নাট্যরূপ দিয়েছেন। 'মেঘনাদ বধ' নাটকে মাইকেলের ভাষা ব্যবহার করলেও অভিনয় যোগ্য করার জন্য সংলাপ অনেক সময় পাল্টে দিয়েছেন এবং কিছু কিছু নূতন চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। কাহিনী অংশে তিনি মেঘনাদ বধ কাব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র গ্রহণ করেছেন। তথাপি একথা বলা যায় নাট্যকার মূলের সঙ্গে যথসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করে তাঁর নাটক রচনা করেছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের অকাল বোধন নাটকটি সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণ করে লেখা। রাবণ বধের সংকল্প করে রামচন্দ্র অষ্টোত্তর শত নীলোৎপলে দুর্গা পূজা করবেন। হনুমানকে নীলপদ্ম আনার জন্য

১। গিরীশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭ (সাহিত্য সংসদ)

পাঠালেন। রামচন্দ্র পূজা করতে বসে যখন একটি পদ্ম কম দেখলেন তখন হনুমানকে ডেকে পাঠালেন। রামচন্দ্রের ইচ্ছা হনু আবার নীলোৎপল নিয়ে আসুক। কিন্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নীলোৎপল কোথাও নেই বলে হনু যেতে চাইল না। "রঘুনাথ সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করে এগুলো সংগ্রহ করেছি। জগতে আর নীলোৎপল নেই। আমি নিশ্চয় বলছি অষ্টোত্তর শত গণনা করে এনেছি।"[১] বাকি অংশ কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করে লেখা।

রাবণ বধ পালাটিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে ভক্তিরসের প্রাধান্য ঘটেছে। কৃত্তিবাসী রাময়ণের মত এখানেও রাবণ প্রচ্ছন্ন ভক্ত। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাক্ষস রাবণের অন্তরালে রামভক্ত রাবণকে পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু রাবণের নিষ্ঠুরতা লালসা এক এক সময় চরমে উঠেছে। রাবণ ভাবে জগদম্বার সহায়তায় অনায়াসে রামচন্দ্রকে বধ করতে পারে কিন্তু শত্রুকে সে মৃত্যুদান করবে না। রামচন্দ্রের সামনে জানকীকে নিয়ে বিহার করে রামচন্দ্রের হৃদয় দগ্ধ করবে, মৃত্যুর অধিক যন্ত্রনা দেবে।

রাবণের এই পৈশাচিক প্রবৃত্তি দেখে রাণী মন্দোদরী তাকে তীব্র ভাষার তিরস্কার করেছেন। মহাভারতের গান্ধারী চরিত্রের মতই তিনি অধার্মিক স্বীয় পক্ষের পরাজয় ও ধার্ম্মিক প্রতিপক্ষের জয় কামনা করেছেন—

"বোধহীনা আমি।
ভেবেছ কি মনে, সুবোধ লঙ্কার ভূপ,
দুর্বল তাড়নে হইবেন প্রীত
দীন-জন-গতি জগদম্বে ?
জানিলু-নিশ্চয় লঙ্কার ক্ষয়"।[২]

সীতার বনবাস অংশটিতে মন্দোদরী, তারা, নিকষা ও অন্যান্য বিধবা রাক্ষস রমনীরা রামচন্দ্রকে স্বপ্নে সীতা নির্বাসনে প্ররোচিত করেছেন।

এছাড়া রামচন্দ্র নিদ্রিতা সীতার পাশে রাবণের ছবি দেখে প্রজাদের সীতার সম্বন্ধে অপবাদ সত্য বলে মনে করেন এবং দুষ্টা নারী সীতাকে নির্বাসিত করার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দেন—

১। গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২
২। গিরিশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪, ৮৫

শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
দুষ্টা নারী সীতা,
চিত্রি রাবণের অবয়ব
হানি বাজ লাজে, অশোক-কানন মাঝে,
স্বচক্ষে দেখিয়াছি সীতা ঢালিয়াছে কায়,
রাক্ষস ছবির পরে।[১]

সীতার সম্বন্ধে রামচন্দ্রের এরূপ মনোভাব কোন রামায়ণে নেই। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নাট্যকারের নিজস্ব। প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র সীতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন কিন্তু অন্তরে জানতেন সীতা শুদ্ধ স্বভাবা ও রামময় জীবিতা। আবার নাটকের মাঝামাঝিতে এসে সীতার প্রতি রামচন্দ্রের একনিষ্ঠ প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় রামচন্দ্র দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ না করে সীতার স্বর্ণপ্রতিমা তৈরী করেছিলেন। এভাবে দেখা যায় নাট্যকার রামচরিত্রের পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও দৃঢ়তা রক্ষা করতে পারেন নি।

রণস্থলে রাবণ জননী নিকষার আবির্ভাব ও লবকুশকে রামনিধনে উৎসাহিত করার দৃশ্যে রণক্ষেত্রের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গিরিশ চন্দ্রের লক্ষ্মণ বর্জন নাটকটি রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে মহাবীর লক্ষ্মণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে! লক্ষ্মণ কেবল বীর নহেন, পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের এক জ্বলন্ত মূর্তিও বটে। সীতা রামচন্দ্রের আদেশে নির্বাসিতা হয়েছিলেন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমণ করলেন আর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সত্যরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

"সেবামম পূর্ণ এতদিনে,
আত্ম বিসর্জন পূজা করি সংপূরণ।
ত্যাগ শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপন বর্জন।"[২]

১। গিরিশ রচনাবলী, ১ম খঃ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯-১০, ১৪

১। গিরিশ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। জ্যোতি প্রকাশন। দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ১৪৭ – ১৪৮

এই রচনাটিতে রামচন্দ্রের দেহত্যাগের সময় কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রভৃতি জননীরা জীবিত ছিলেন, কিন্তু রামায়ণে সীতার পাতাল প্রবেশের পর একে একে রাম-জননীরা দেহত্যাগ করেন। এখানে রামচন্দ্র তাঁর জননীদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে সরযূ নদীতে আত্ম বিসর্জ্জন দেন—

"মাগো। অশেষ যন্ত্রনা পেয়েছ জননী তুমি,
গর্ভে ধরে এসন্তানে, চিরঋনী জননী তোমার আমি,
এপরম কালে কহি জনস্থলে
মাতৃঋণ নাহি যায় শোধ,
লয়ে কোলে সবযু সলিলে রেখনা অভয়া পায়।"[১]

আরও দেখাযায় রামচন্দ্র মহাপ্রস্থানে যাওয়ার সময় কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে তাঁর দুই শিশুপুত্র লব-কুশকে দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং লব-কুশকে বংশের মর্যাদা রক্ষা করে চলার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালেব পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে সীতা অন্যতম, এতে বাল্মীকির মহাকাব্যে যাদের নাম মাত্র উল্লেখ আছে, যাদের বথা আভাসে ইঙ্গিতে আছে সেসব চরিত্রকে তিনি সক্রিয় করে তুলেছেন। ঊর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি, শান্তা প্রভৃতি প্রতিটি চরিত্র স্বল্প পরিসরের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি এঁরা পরিহাস রসিকা, ঊর্মিলা গাম্ভীর্যময়ী। সুর্পনখাকে নিয়ে মাণ্ডবী লক্ষ্মণকে পরিহাস করেছেন। কিন্তু লক্ষ্মণের বীরত্বে, মহত্বে সীতাদেবী মুগ্ধ। আর ভোগবিলাসপ্রিয়া শ্রুতকীর্ত্তি বুঝতে পারেনা সীতা কেন রাজপ্রাসাদের ভোগ ঐশ্বর্যের প্রতি এত উদাসীন। তাই সে মনে করে সীতার কপালে অনেক কষ্ট আছে—

তোর ভাল লাগিলনা দিদি, এ প্রাসাদ,
আত্মীয় স্বজন, এত আমোদ আহলাদ,
আমাদের ভালবাসা, এ সেবা শুশ্রূষা,
মিষ্টান্ন পায়স এত, এত বেশভূষা?
পঞ্চবটী বন হল ভাল এর কাছে।
দিদি তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে।"[২]

১। গিরিশ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৯

২। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত। হরফ প্রকাশনী, ১৩৮১, পৃঃ ৩৬৯।

শ্রুতকীর্ত্তির মুখ দিয়ে সীতার নিয়তি যেন এখানে কথা বলে উঠেছে। এর পরেই রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু ভবভূতির রামচন্দ্রের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের রামচন্দ্র ও সীতার আসন্ন বিরহে ব্যাকুল। তিনি সীতার সঙ্গে আর দেখা করতেও পারলেন না। নির্বাসন প্রত্যাহার করার জন্য লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতারা, ভগিনী শান্তা ও সবশেষে মাতা কৌশল্যা রামচন্দ্রের কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলে রামচন্দ্র মাতাকে সীতা নির্বাসন প্রত্যাহার করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

"জননী আমার।
সত্য ভঙ্গ হোক, ভষ্ম হোক রাম,
মা তোমার হোক পূর্ণ মনস্কাম।"[১]

মাতৃ আজ্ঞাপালন করতে গিয়ে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে প্রজানুরঞ্জন করতে না পেরে রামচন্দ্র আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতে লাগলেন। পতিপরায়ণা সীতা তখন পতিসত্য পালনের জন্য স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করলেন।

"পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু
আমি ও রাখিব পতি সত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্য রশ্মি
সীতার কারণে। উঠ হে যশস্বী।
এইবক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে,
তুমি দলি তাহে চলে যাও সুখে
যশের মন্দিরে। তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা। সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের। চিন্তা কর দূর,
ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর।"[২]

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের খবর পেয়ে বনবাসিনী সীতার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। কারণ এতদিন পর্যন্ত তিনি অসপত্ন পতি প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সময় দার পরিগ্রহ করবেন ভেবে সীতার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। তিনি শয্যাশায়িনী হলেন। বাল্মীকির মানস কন্যা দেবীরূপিনী সীতা এখানে রক্তমাংসের মানবীতে পরিণত হয়েছেন।

১, ২। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২, ৩৭৩

সীতা নাটকের শেষাংশে দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকি ও ভবভূতি এই দুই মহাকবির ছায়ামাত্র অবলম্বন করে স্বকীয় পথে সীতা জীবনের শেষ পরিণতি বর্ণনা করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় বাল্মীকির কাছে সীতার খবর পেয়ে রামচন্দ্র মৃত্যু শয্যাশায়িনী সীতার পাশে এসে উপস্থিত হলেন। রামচন্দ্রকে দেখার পর সীতা দেহমনে আশ্বস্ত হলেন। স্বামী যে আবার তাঁকে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইলনা। কিন্তু রামসীতার মিলনে রামায়ণের সার্থকতা নহে। চির বিচ্ছেদেই উভয়ের প্রেমানুভূতির সার্থকতা। কৃত্তিবাস ও কৃত্তিবাসানুসারী কবিকুল আদিকবির অনুসরণে সীতার পাতাল প্রবেশ বর্ণনা করেছেন। সীতার পাতাল প্রবেশের মধ্যে আছে অলৌকিকতা, চিত্তচমৎকারিত্ব। আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বর্ণিত ভূমিকম্পের ফলে সীতার মৃত্যুর মধ্যে আছে দৈব বিড়ম্বনা। রামসীতার মিলনমুহূর্তে হঠাৎ ভূমিকম্পের ফলে সীতার ধরিত্রী গর্ভে অন্তর্ধাণ বাল্মীকি বর্ণিত পাতাল প্রবেশেরই রূপান্তর মাত্র। বরং বলা যায় এ ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সীতার স্বাভাবিক মৃত্যু বর্ণনা করেছেন।

সীতা নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ গোঁড়া ব্রাহ্মণ। রাম রাজত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম রক্ষার জন্য তিনি রামচন্দ্রকে সীতা নির্বাসন ও নির্দোষ শম্বুক হত্যায় বাধ্য করেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রামচন্দ্রকে বশিষ্ঠের দ্বারা পরিচালিত করে নাট্যকার স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিষয়ে নিজেই স্পষ্ট বলেছেন, "আমি সীতার চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া রামের চরিত্র মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছি। আমার বিশ্বাস আমি তাহা করি নাই। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে ভগবান রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে রামচন্দ্র শুদ্ধ বংশ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সীতার বনবাস দিয়াছিলেন। তাহার উপরে লক্ষ্মণের প্রতি তপোবন দর্শন-ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আসিবার আজ্ঞায়, একটা নিষ্ঠুর ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতি এই দুইটির একটি স্থলেও মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। আমি বনবাস আখ্যান সম্বন্ধে ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছি। এরূপ করায়, আমার বিবেচনায়, রামের চরিত্র বাল্মীকির চিত্রিত চরিত্র হইতে হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।" দ্বিজেন্দ্রলালের রামচন্দ্র কেবল বাল্মীকির রাম নয়, ভবভূতির রামের চেয়েও

মহৎ হয়েছে।* ভবভূতির রাম ও সীতাকে মুনিপত্নীদের কাছে পাঠানোর ছল করে বনে পরিত্যাগ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা স্বেচ্ছা বনবাসিনী।

ভরত চরিত্র অংকনেও নাট্যকার রামায়ণী ভাবকল্পনা থেকে দূরে সরে গেছেন। সীতা নির্বাসনের পর ভরত ও মাণ্ডবী অযোধ্যা ত্যাগ করে কৈকেয় রাজ্যে প্রস্থান করেন। রামচন্দ্র তাঁদের ডেকে পাঠালেও তাঁরা আসেন না। এখানে নাট্যকার ভরতকে স্ত্রৈন করে চিত্রিত করেছেন। মাণ্ডবীর নির্দেশেই যেন ভরত পরিচালিত হয়। মাণ্ডবী পত্নীঘাতী রাঘবের রাজত্বে যাবেনা। সঙ্গে সঙ্গে ভরতের মত ভ্রাতৃভক্তও পত্নীর অনুগামী হল।

"তুমি যাইবেনা যদি—অনুগামী
স্বতঃতই তোমার এ সম্বন্ধে আমি।
লিখে দেই তবে অযোধ্যাপতিরে,
যাইবনা। মোরা অযোধ্যায় ফিরে।"[২]

ভরত চরিত্রকে এভাবে চিত্রিত করে নাট্যকার রামায়ণী ভাবধারা ও সিদ্ধরসের ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। অথচ ভরত ও মাণ্ডবীর ভূমিকা সীতা নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়।

রামায়ণের অহল্যা উপাখ্যান অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল 'পাষাণী' নাটক রচনা করেন। এতে তিনি নারীর ভোগ-লিপ্সা ও রূপযৌবন যে কতদূর আত্মঘাতী হতে পারে তা দেখিয়েছেন। অনিন্দ্য সুন্দরী অহল্যার রূপযৌবন ঋষি গৌতমের কাছে ছিল অবহেলিত। অহল্যার ভরা যৌবনের কামনা বাসনা অপূর্ণ রয়ে গেল। সে চাই যৌবন সম্ভোগ। বৃদ্ধ তাপস গৌতম তপস্যায় যাওয়ার সময় তাই সে বলে—

"আমার জীবন চাহে সম্ভোগ। তোমার
জীবনের ব্রত পুণ্য সঞ্চয়, আমার কার্য্য
ব্যয়। ভিন্নরূপ গতি দুজনার
ভিন্নদিকে। এজীবনে হইবনা মোরা

১, ২। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃঃ ৩৫৫, ৩৭৬

কণ্ঠ সম্মিলিত। যাও, বাড়িবেনা তাহে
আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ।"১

শাস্ত্রবাক্য, নীতিবাক্য সে বিশ্বাস করেনা। প্রচলিত রীতি, নীতি ও সমাজবিধির সে বিদ্রোহী; তাই ইন্দ্রের লালসায় সহজেই সে আত্মসমর্পণ করতে পারল—

"আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর"২

এ উন্মাদ যৌবন, এ আসঙ্গলিপ্সা পুত্র স্নেহকেও করল প্রতিনিবৃত্ত। মাতৃস্নেহ হল পিশাচীর নিষ্ঠুরতায় পরিণত। রোরুদ্যমান পুত্র সতানন্দের গলা টিপে দিয়ে অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে স্বেচ্ছা বিহারিনী হল। ইন্দ্র তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেই অহল্যাকে ত্যাগ করল।

এইবার অহল্যার অপমানিত নারীত্ব জেগে উঠল। অপমানিতা অবহেলিতা উন্মাদিনী অহল্যা নগরের পর নগর পরিভ্রমণ করে মিথিলায় এসে উপস্থিত হল। পথে রামচন্দ্র সহ বিশ্বামিত্র অহল্যার মুখে তার জীবনের শোচনীয় পরিণতির কথা শুনতে পান। রামচন্দ্র তখন অহল্যাকে ঋষি গৌতমের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর মিথিলার জনক সভায় ক্ষমার অবতার বৃদ্ধ তাপস গৌতম তাঁর অনুতাপানলে দগ্ধা সুচিস্নাতা পত্নীকে গ্রহণ করলেন। এই নাটকে নাট্যকার রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার মানবী রূপধারণের অবাস্তব চিত্র বর্জন করেছেন। রামের পাদস্পর্শের পরিবর্তে রামের উপদেশে অহল্যা পতির কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

মাধুরী ও চিরঞ্জীবের চরিত্র পরিকল্পনা করে নাট্যকার একদিকে যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তেমনই অপরদিকে অহল্যার অতৃপ্ত কামনা বাসনার পাশে মাধুরীর একনিষ্ঠ প্রেমের শুচিশুভ্ররূপের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছেন।

মহর্ষি গৌতমের মধ্যে আছে ব্রাহ্মণসুলভ সহজাত বিনয়, নম্রতা ও ক্ষমা। গৌতম নিজের আত্ম পরিচয় দিয়েছেন—

'ভৃত্যের নাম গৌতম' আর উদ্ধত ক্ষত্র ঋষি বিশ্বামিত্র নিজের পরিচয় দিলেন—'আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্র।"

এইভাবে দেখা যায় পাষাণী নাটকের মত রামায়ণের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী গ্রহণ করে নাট্যকার স্বীয় কল্পনার পক্ষ বিস্তার করেছেন।

১, ২। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২-১৩,

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনকড়ি বিশ্বাস রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে 'রাম বনবাস', 'সীতার বনবাস', 'সীতার পাতাল প্রবেশ', 'ভরত বিলাপ' প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। এই নাটক গুলির মধ্যে লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও ভরত বিলাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকটিতে রাবণের আসুরিক শক্তির বিরাট দম্ভ ও ক্ষমতার পরিচয় প্রকাশ পেলেও ভিতরে ভিতরে সে শক্তিতে ফাটল ধরেছে। রাবণ মেঘনাদের শোকে কাতর হয়ে অনুশোচনা করেছে—

'কেন আমি কাল রূপিনী সীতাকে লঙ্কার এনেছিলাম? কেন আমি সীতার প্রতি লুব্ধ হয়েছিলাম? এখন যে সেই সীতার জন্য আমার সর্ব্বসান্ত হল। সেই সীতার জন্য আমি ধনে প্রাণে মজলেম।''[১] এই অনুশোচনার মধ্যে অনুতপ্ত অসহায় রাবণের মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা বাইরে প্রকাশ করেতে পারে না। সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাণী মন্দোদরীর বার বার অনুরোধ সত্বেও সে রামচন্দ্রকে সীতা ফিরিয়ে দিতে পারে নাই। কারণ তা হলে দেবগণ, ভাই বিভীষণ এবং জগৎবাসী তাকে উপহাস করবে। তিনকড়ি বিশ্বাস কৃত 'সীতার পাতাল প্রবেশ' নাটকে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সীতার যমজ পুত্র লব কুশের সঙ্গে রামচন্দ্রের পরিচয় হয়। তাদের গলায় সীতার শতনরী হার দেখে রামচন্দ্র তাদের সীতার পুত্র বলে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু লবকুশ সরাসরি নিজেদের পরিচয় না দিয়ে একটুখানি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা বলে যে তাদের রামায়ণ গান শুনে এক অলোক-সামান্যা নারী তাদের এই হার উপহার দেন। তারপর তারা সেই রমণীকে বহুবার খোঁজ করেছে। কিন্তু আর তাঁকে দেখতে পায়নি। অবশেষে লবকুশের সঙ্গে রামচন্দ্রের পরিচয় হলে তারা তাঁকে মৃদু তিরস্কার করেছে—

"আমরা যদি আপনার ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিতাম তবে কি আমাদের এতদুর দুরদৃষ্ট হতো। আমরা পিতার নাম কখনই শুনি নাই, মাতার মুখে শ্রবণ করেছি যে আমার পিতার নাম শ্রবণ করলে যদি অশেষ পাপের পাপী হয়, তার মুক্তি লাভ হয়?"[২]

নাটকটিতে যজ্ঞ সভায় রামসীতার কথোপকথনের মধ্যে সীতার অনমনীয়

১, ২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল. তিনকড়ি বিশ্বাস, ১২৮৭, পৃঃ ১২, ৬৮।

দৃঢ়তা ও তেজস্বীতা প্রকাশ পেয়েছে। সীতা সভা সমক্ষে পুনরায় পরীক্ষা-দানে কিছুতেই সম্মত নহেন। রামচন্দ্রও বিনা পরীক্ষায় সীতাকে গ্রহণ করবেন না—"কিন্তু আজ পরীক্ষা ব্যতীত কিছুতেই এই অযোধ্যায় স্থান পাবেনা।"[১] সীতা পরীক্ষা দানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বললেন—'নাথ, আমি পরীক্ষা দানে কখনই সম্মত হব না'[২] এবার রামচন্দ্র সীতার প্রতি চরম নিষ্ঠুর ও অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করলেন—"দেখ তুমি যদি বারবার আমার বাক্যের অন্যথাচরণ কর তবে যথা ইচ্ছা গমন কর। আমি তোমার মুখাবলোকন করতে চাইনা।"[৩]

বার বার পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা তিনি মৃত্যুকেই অধিক শ্রেয় মনে করলেন। ধরিত্রীজাতা সীতা ধরিত্রী গর্ভে অন্তর্ধান করলেন।

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদের 'রামলীলা' নাটকে বিশ্বামিত্রের রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে তাড়কা বধ, যজ্ঞ রক্ষা করা, পাষানী অহল্যা উদ্ধার, নাবিকের নৌকা সোনায় পরিণত করা, হরধনু ভঙ্গ করে জনকগৃহে চারিভ্রাতার সঙ্গে চারি কন্যার বিবাহ ও পরশুরামের দর্প চূর্ণ পর্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। নাট্যকার অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বন করে রামচন্দ্রের নৌকা পার হওয়ার দৃশ্যটি চিত্রিত করেছেন। এতে নাট্যকারের কল্পনাশক্তিও পক্ষ বিস্তার করেছে। এই নাটকে তিনি বিভিন্ন কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টি করে একদিকে যেমন হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তেমন অন্যদিকে বিভিন্ন গল্পাংশের মধ্যে রামচন্দ্রকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করার একটা সচেতন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিতে এলে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরস্পরকে নমস্কার করণ দেখে বিদূষক ব্যঙ্গোক্তি করেছে—

"এই রে। দাড়ীতে দাড়ীতে জড়িয়ে যায় বুঝি। টেনে ছাড়াতে রক্তারক্তি হবে দেখছি।"[৪] বিশ্বামিত্র নদীতে স্নান আহ্নিক করতে গেলে সে মনে মনে বিশ্বামিত্রের নিধন কমনা করেছে—

১, ২, ৩। সীতার পাতাল প্রবেশ, তিনকড়ি বিশ্বাস, পৃঃ ৬৮, ৬৯।
৪। রামলীলা, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১১, ১৭।

"হে হরি। আর যেন পাষণ্ড বেঠাকে ফিরতে না হয়, নদীর গর্ভেই যেন তলিয় যায়। মহারাজ, সিংহদ্বার বন্ধ করে দিয়ে আসতে বলব"?[১]

সিদ্ধাশ্রমে অত্রি; যাবালি ও আত্মসিদ্ধের কথোপকথন এবং রামচন্দ্রের নৌকা পার হওয়ার ঘটনার মধ্যে দিয়েও হাস্য রস পরিবেশন করা হয়েছে। দুর্ধর্ষ রাক্ষস বধ করার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র কিশোর রামলক্ষ্মণকে এনেছেন দেখে মুনিরা উপহাস করেছেন। আত্মসিদ্ধ রামলক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন — "বিধাতার সৃষ্টি নদী, সমুদ্রের জল.ওর সৃষ্টি গাছে জল। বিধাতার নিয়ম বীরপুরুষে দৈত্য রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করবে, ও'র নিয়মে দুগ্ধ পোষ্য শিশু সে কাজ সাধবে।"[২]

গোবিন্দ মাঝি ও তার দাঁড়ী ভুতোর রামলক্ষ্মণের কাছ থেকে পলায়ণের প্রচেষ্টার মধ্যে গ্রাম্য মানুষের সরল বিশ্বাস ও হাস্যরস প্রকাশ পেয়েছে। দাঁড়ি ও মাঝি জ্বর হয়েছে বলে ছলনা করে রামচন্দ্রকে ভোলাতে চেয়েছে। গোবিন্দ মাঝি রামচন্দ্রকে বলেছে—"তোমার কথাগুলো মিষ্ট হলে কি হবে মশায়, তোমর যে সর্বনাশা পা, ও পা সুদ্ধুতো কখনোই পার করবোনা।"[৩] গোবিন্দ মাঝির নৌকা সোনা হয়ে যাওয়ার পর মাঝি ও মাঝি পত্নীর পরিকল্পনার মধ্যে দরিদ্র বাঙ্গালী জীবনের অসম্পূর্ণ সাধ আহ্লাদ প্রকাশ পেয়েছে। "তোর ছেঁড়া ক্যাতাখানা সোনার সুতোয় সিভিয়ে ওড় বসাব। আর আমার শোবার মাচানের দু'একখানা খোতো বাস বদলে সোনার গোঁজামেল দোবো।" ·····তোর একছড়া দানার সাধ আছে নয়? হ্যা, দ্যাক, তুই এক কম্মোকর, মোড়লের বড় গিন্নির কাছে গয়নার নামগুলো সব জেনে আয়।"[৪] এখানে দরিদ্রতম বাঙ্গালী পরিবার ছেঁড়া কাঁথার পরিবর্তে লেপ তোষকের কথা ভাবতে পারেনা। জীর্ণ কুটীরের পরিবর্তে যে দালান বাড়ী করা যায় তাও তার মাথায় আসে না। সে দু'এক খানা পুরোনো বাঁশ পাল্টে সোনার গোঁজা ঢুকিয়ে দেবে। দরিদ্র বধু সোনার গহনা পরবে কি, গহনার নামও সে জানেনা। আর দরিদ্র গোবিন্দ মাঝি তার চেয়ে গরীব বা তার অধীন ভুতোকে ঠকানোর জন্য ছলনার আশ্রয় করছে।

১, ২, ৩, ৪। রামলীলা, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৭, ৩৬, ৭০, ৭৪।

নৌকাখানাকে লুকিয়ে নিয়ে যেয়ে তাদের পুকুরে বেঁধে রাখবে। আর ভূতো এলে বলবে ওটা মানুষ হয়ে গেছে। "আর সোনার নৌকা খানা মদনা মোনের ভেতর দে আমাদের পুকুরে ভেড়োনো যাক। আর দ্যাক ভূতোকে বলা যাবে, লাখনা মানিষ্যি হোয়ে গাও পেরিয়ে বড় রাজার মুনীতিরি হয়েছে।[১]

গোবিন্দ মাঝি নির্বোধ হলেও তার পত্নী অন্তরের শুদ্ধা সরল ভক্তির জোরে রামচন্দ্রকে পরম ব্রহ্ম সনাতন বলে চিনতে পেরেছে ও স্তবস্তুতি করেছে আর বিশ্বামিত্র প্রথম থেকেই রামকে পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করেছেন।

রাম সীতার বিবাহ বাসরে তাঁরা পরস্পরকে বৈকুণ্ঠেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বরী বলে চিনতে পেরেছেন। নাটকটিতে একদিকে রয়েছে ভক্তি রসের প্রাধান্য আর একদিকে আছে রামায়ণ বর্ণিত ক্ষাত্র শক্তির প্রসারণ ও কৃষি সভ্যতা বিস্তারের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। পরশুরামের বলবীর্য হরণ করে তিনি ক্ষাত্র শক্তিকে নিঃশঙ্ক করেছেন এবং হরধনুভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করা ও প্রবাসী অহল্যা উদ্ধার প্রভৃতি কাহিনী অনুর্বরা ভূমিকে উর্বরা বা কর্ষণযোগ্য করার রূপান্তর মাত্র।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামোদ্বাহ' নাটকে তারকা বধ, অহল্যা উদ্ধার নাবিকের নৌকা সোনা করা এবং হরধনু ভঙ্গ করে রামলক্ষ্মণ প্রভৃতি চারি ভ্রাতার চারি কন্যার পাণিগ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকে রাম সীতার বিবাহ সভার পরিপূর্ণ বর্ণনা আছে। সীতা রামচন্দ্রের রূপ স্বপ্নে দেখে রামচন্দ্রকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন। ইন্দ্র বশিষ্ঠ নির্ধারিত রামসীতার বিবাহের লগ্ন ভ্রষ্ট করে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য মেনকা ও উর্বশীকে বিবাহ সভায় নৃত্য করতে পাঠালেন। বিবাহ সভায় নাপিত, ধোপা, ছাদন তলা, গায়ে হলুদ, যজ্ঞে পূর্ণ পাত্র সমর্পণ প্রভৃতি খুটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে নাট্যকার মিথিলার বিবাহ সভাকে বাঙ্গালীর বিবাহ সভায় পরিণত করেছেন। মধুপর্কের বাটী কটা যে বরের নাপ্তে পাবে তা দেখাতে নাট্যকার ভুল করেন নি। দশরথের নাপ্তে তিনকড়ি মধুপর্কের বাটী ছোট দেখে তা নিতে অস্বীকার করে বলছে—আমি ও বাটীকটা নেবোনা। ········ ইকি আপনার বিবেচনা। আপনিও যদিদান

১। রামলীলা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫, ৪৯।

পর্যন্ত পুরুত আমরাও তদ্দিন পর্যন্ত রাজবাড়ীর নাপ্তে। এ বাটীকি রাজার মেয়ের বিয়েতে আমাদের নেওয়া পোষায় ?[১] রাম সীতার শুভ দৃষ্টির সময় কন্যা পক্ষের ভজা নাপ্তা ছাউনী টাঙ্গিয়ে ধরে ছাউনীতে বর কন্যার অমঙ্গল নাশক ছাউনী টাঙ্গানো ফুল গুজে দিয়েছে। এসব স্ত্রীআচার ও বিবাহ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালীর বিবাহ সংস্কারের পরিচয় মেলে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারেরর 'রাবণ বধ' নাটকটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত হলেও আঙ্গিকের মধ্যে নাট্যকার পুরাতন প্রথার অনুবর্তন করেছেন। আধুনিক যুগের নাট্যকারদের মত তিনি রামায়ণের কোন খণ্ডাংশ মাত্র রাবণ বধ পর্যন্ত অবলম্বন করেন নাই। রামের যৌব রাজ্যে অভিষেক থেকে শুরু করে মহাকাব্যের সমস্ত বিষয়বস্তু তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে এই ক্ষুদ্র নাটকে পরিবেশন করেছেন। নাটকটিতে তিনি একদিকে যেমন প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন করেছেন তেমনই আর একদিকে সঙ্কেত প্রধান প্রণালীর উদ্ভাবন করে বিশেষ কৃতিত্ব ও আধুনিক প্রথার বিস্ময়কর পূর্বসূচনা করেছেন। আধুনিক ছায়ানাট্যে যেমন পূর্বস্মৃতির রোমন্থন অতীত দৃশ্যের চাক্ষুষ পুনরাভিনয়ের সাহায্যে সূচিত হয় তেমনই রাবণের সীতা হরণের পূর্বে মারীচ রামের হরধনু ভঙ্গ ও রাক্ষস নিধনের ছদ্ম অভিনয় করে রাবণের মনে রামের অসাধারণ বীরত্বের ধারণা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এরূপ কলাকৌশল প্রয়োগ নাট্যপ্রযোজনার এক অভিনব উৎকর্ষ সূচনা করে।

নাটকের শেষ দৃশ্যে সমাধিভূমিতে অসাধারণ দম্ভ ও শক্তির প্রতীক রাবণের শেষ পরিণতি রাণী মন্দোদরী বিশ্বাস করতে পারেন না —

"দেখিনা আমি তাঁর পদযুগলে ক্রন্দন কোরে তাঁকে প্রতিরুদ্ধ করতে পারি কিনা ? না পার্বো কেন ? অবশ্যই পার্বো ? তাঁর কখনোই মৃত্যু হয় নাই। তিনি কেবল আমার প্রতারণা স্মরণে অচেতন হয়ে পড়ে আছেন।"[২] রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হওয়ার সময় রাণী মন্দেদরীর মত পাঠকও রাবণের মৃত্যু সহজে বিশ্বাস করতে পারেননা।

১। রামোদ্বাহ নাটক, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর, ১২৮১, পৃঃ ৯৬।

২। রাবণ বধ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ১ম সংস্করণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, অ্যাণ্ড সন্স, পৃঃ ১২৮।

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভরত বিলাপ' নাটকটিতে কৈকেয়ীর কুমন্ত্রনায় অভিষেকোন্মখু রাজপুত্র রামচন্দ্রের নির্বাসন, দশরথের মৃত্যু, ভরতের অযোধ্যায় আগমন ও অযোধ্যার প্রজাগণ সহ রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনগমন ও রামের পাদুকাসহ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। নাট্যাবর কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বনে ভরত বিলাপ নাটক রচনা করলেও এতে রামায়ণের গুরু গম্ভীর পরিবেশ রক্ষা করতে পারেন নি।

কুব্জীর মুখে গ্রাম্য গালাগালি দিয়ে তিনি তাকে গ্রাম্য ঝগড়াটে রমণীতে পরিণত করেছেন, এমন কোন গালাগালি নেই যা তার মুখে আটকায়না। শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারধর করলে সে বলেছে – "ওরে হতভাগারে, তোকে চুলোয় রেখে আসি, তোর মা বাছা, বাছা করে কাঁদুক।"[১]

আর তাকে কাল সূর্যোদয়ের পর নাক কেটে দেশের বার করে দেবে বললে সে ভরতকে নিপাত দিয়ে বলেছে—"তোকে আগে চুলোর ঘাটে রেখে আসি, তারপর আমি বেরুব। অল্পেয়ে! হাড় হাবাতে। চল কৈকেয়ী আমরা এখান হতে যাই।"[২] মন্থরা কেবল কৈকেয়ীর দাসী নহে— সে গ্রাম্য দজ্জাল রমণীও বটে। কথায় কথায় লোককে সে ঘাটে পাঠায়।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রমীলা বিলাপ গীতিনাট্যটিতে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ, রাবণের শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, হনুমানের বিশল্যকরণী ঔষধ এনে লক্ষ্মণকে জীবন দান, মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য রাবণের রামচন্দ্রের নিকট সাতদিন যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা এবং প্রমীলার মেঘনাদের সঙ্গে চিতাসজ্জায় আরোহন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। নাটকটিতে রাবণ মন্ত্রী সারন, বিভীষণ ও প্রমীলা পর্যন্ত সকলেই রামচন্দ্রকে বৈকুন্ঠেশ্বর বলে বন্দনা করেছে। মেঘনাদ বধ কাব্যের অনুসরণে নাট্যকার বিভিন্ন দেবদেবীর পক্ষাবলম্বন বর্ণনা করেছেন। মেঘনাদ বধ কাব্যের মতই এখানে প্রমীলার সখী বাসন্তীর একটি বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের মত বীর রস সৃষ্টির দিকে না গিয়ে তিনি নাটকটিতে ভক্তিরসের প্রাধান্য ঘটিয়েছেন। রাবণ থেকে আরম্ভ করে রাক্ষসবধূ প্রমীলা পর্যন্ত সকলে রামচন্দ্রকে বৈকুন্ঠেশ্বর বলে জানে এবং অন্তিম সময়ে রামপদ প্রার্থনা করে—

১, ২। ভরত বিলাপ, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪, ২৫।

'শ্রীরাম মানব নয় ভগবান তিনি।
জানকী জনক কন্যা লক্ষ্মীরূপিনী ।।
তাঁর সহ রণ করা কভু কি সম্ভবে ?
নতুবা আমি কি ডরি সমান্য মানবে ?

o o o o

"প্রাণ ভরে রাম নাম বলরে কাতরে।
অনায়াসে তরে যাব ভব পারাবারে ।।"[১]

'শ্রীরাম নবমী' নাটকে কুঞ্জবিহারী বসু রামচন্দ্রের জন্মের পূর্বে দশরথের সিন্দুবধ, অন্ধমুনির কাছ থেকে শাপচ্ছলে বর লাভ অযোধ্যার বীরাঙ্গনাদের ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে অযোধ্যায় আনতে যাওয়া, দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, দশরথের কৌশল্যা ও কৈকেয়ী রাণীকে চরু দান, কৌশল্যা ও কৈকেয়ী কর্তৃক সুমিত্রাকে তাদের স্ব স্ব চরুর ভাগ দান, দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণুর রামরূপে জন্মগ্রহণ করার সংকল্প গ্রহণ করা প্রভৃতি ঘটনা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণে বর্ণনা বরা হয়েছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে বারাঙ্গনা আনতে গেলে তাদের ছলনা ও অপূর্ব রূপলাবণ্য দেখে মুনিকুমার মুগ্ধ হয়েছেন। মুগ্ধ ঋষিকুমার তাদের স্বর্গবাসী মহাশয় বলে সম্বোধন করেছেন। পুরুষ এবং নারীর প্রভেদ এই ঋষিকুমারের বোধ হয়নি। রমণীর অলক্ত পদযুগল দেখে তিনি বলেছেন—

"মহাপুরুষগণ। আপনাদের চরণতলে নভোদিত অরুণকিরণের ন্যায় যে আভা বিকশিত হচ্ছে ইহার কারণ জানবার জন্য বড় কৌতুহল হচ্ছে, কেননা আমাদের তপোবনস্থ ঋষিমন্ডলীর চরণতল তো এমন সুন্দর কান্তি বিশিষ্ট নয়। ... .আপনাদের স্বর্গীয় জ্যোতিঃবিশিষ্ট কমনীয় কান্তিতে হৃদয়ে অপূর্ব শান্তি সঞ্চার হচ্ছে এবং আপনাদের স্বর্গীয় পুরুষ বলে ভ্রান্তি হচ্ছে।"[২]

রামায়ণে দশরথের সিন্ধু বধ অংশটি 'দশরথের মৃগয়া নাটকের আখ্যানবস্তু। নাটিকাটির আরম্ভেই রাণীর স্বপ্ন বৃত্তান্তের মধ্যে ভাবী অমঙ্গলের সূত্রপাত হয়েছে। রাণী দুঃস্বপ্ন দেখে রাজাকে মৃগয়া গমনে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন—

১। প্রমীলা বিলাপ, শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১২৯৭, পৃঃ ৩৪।

'এ দাসীর কথা রাখ, মৃগয়ায় ক্ষান্ত দাও,
ধরি দুটি পায়, তব কাছে গোপন রাখায়
হয় প্রভু অধর্ম সঞ্চার।
হেরিলাম ভীষণ স্বপন—
বসুমতী কাঁপিছে সঘনে,
রুষিয়া পবনদেব
গিরি চূড়া ফেলিছে সুদূরে।"[১]

অনুরূপ ভাবে সিন্ধু জননীর মাতৃহৃদয় পুত্র সিন্ধুকে সরযূ নদীতে জল আনতে পাঠানোর সময় আসন্ন অমঙ্গল আশংকায় শংকিত হয়ে উঠেছে। পুত্রকে জল আনতে পাঠিয়ে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন।

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'রামবনবাস' তিন অঙ্কের একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। এতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বনে দশরথের সিন্ধুবধ, রামচন্দ্রের তাড়কাবধ, জনকসভায় হরধনু ভঙ্গ করে রামচন্দ্রের বিবাহ এবং অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহনের সময় কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে বনগমন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। নাটিকাটিতে রামচন্দ্র বনগমনের সময় জন্মভূমি অযোধ্যার বন্দনা করেছেন—

"জননী জন্মভূমি অযোধ্যা নগরী,
দেগো মাতা বিদায় সন্তানে
চৌদ্দবৎসর তরে—
পুত্র আজি বনবাসে চলেছে কাঁদিয়া,
যদি মা বাঁচিয়া থাকি আশীসে তোমার
ফিরিব আবার।
মা, মা বলি ডাকিব তোমারে।"[২]

বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামচন্দ্রের এই স্বদেশ বন্দনা নেই। নাট্যকার স্বদেশীযুগের আবহাওয়ায় রামচন্দ্রকে দিয়ে স্বদেশ বন্দনা করিয়েছেন।

নাটিকাটির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে কৈকেয়ী রমাচন্দ্রকে

১। দশরথের মৃগয়া, অনুকূলচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ৮-৯।
২। রামবনবাস, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, জেনারেল লাইব্রেরী, পৃঃ ৩১।

বনবাসে পাঠিয়েছিলেন ভরতকে রাজ্য দেওয়ার জন্য নয়—রামচন্দ্রের আদর্শ রাজনীতি ও রাজ্যপালনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। তাই রামের বনগমনের পর দশরথ রাম রাম বলে বিলাপ করলে কৈকেয়ী বলেছেন—

"বনবাসে—বনবাসে গিয়াছে চলিয়া…………করিয়াছি ধরার মঙ্গল। চৌদ্দবৎসর থাকি বনবাসে শিখিয়া আসুক রাম রাজনীতি আদর্শ নৃপতির।"১

বেণীমাধব চাকী 'সীতা নির্বাসন' নাটকে রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা পরিত্যাগ, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি করুণ রস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার সুকৌশলে হাস্যরসও পরিবেশন করেছেন। সীতা লক্ষ্মণকে নির্বিঘ্নে শত্রুনাশ করে রাজ্যপালন করতে আশীর্বাদ করলে ঊর্মিলা পরিহাস করে বলেছেন রাজ্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ নিরস্ত্রা রমণীর নাসাকর্ণও ছেদ করবে—

'আর ছেদি নাশাকর্ণ নিরস্ত্রা রমণীর
যথা পাও কাননে কন্দরে।'২

সীতা লক্ষ্মণও ঊর্মিলাকে সঙ্গে নিয়ে তপোবন দর্শনে যাবে বললে সে বলেছে—

"বীরত্বের পরিচয় দেবরের তব,
কেমনে পাইব বল নাহি থাকে যদি?
o o o
বলহে চরিত্রবান, বল দেখি শুনি,
জিতেন্দ্রিয় ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ যে জন, কি করিতে
পারে তারে, সহস্র কুলটা নারী সহস্র
বৎসর, যায় যদি গড়াগড়ি চরণে তাহার।৩

ঊর্মিলার মতে অন্য কোন উপায়ে সুর্পণখাকে নিরস্ত করা উচিত ছিল। কারণ আর্যনারীর পক্ষে যা ঘৃণ্য, অনার্য নারীর পক্ষে, তা ঘৃণ্য নয়। সুর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদ করে লক্ষ্মণ অন্যায় করেছেন। ইহা অবলা নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারেরই সামিল—

১। রামবনবাস, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, জেনারেল লাইব্রেরী, পৃঃ ৩১।

২, ৩। সীতা নির্বাসন, বেণীমাধব চাকী, ১৩২০ সন, পৃঃ ৫৫, ৫৮।

'বল মোরে বুঝাইয়া হে বীর প্রধান,
কোন অধিকার বলে নাসাকর্ণ তার—
তুমি করিলে ছেদন ?'[১]

নট্যকারের কল্পনায় রামায়ণ মহাকাব্যের উপেক্ষিতা ঊর্মিলা এখানে হাস্য পরিহাসে সজীব হয়ে উঠেছেন।

সীতা নির্বাসন উপলক্ষ্যে সমাজে নির্যাতীতা নিপীড়িতা রমণীর একটি নিখুঁত চিত্র অংকনে নাট্যকার সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষ শাসিত সমাজের যে কাজ পুরযের পক্ষে স্বাভাবিক নারীর পক্ষে তা গুরুতর অপরাধ। সতীত্বের দোহায় দিয়ে বাঙ্গালী মেয়েদের লোহশৃংখলে বরা হয়েছে আবদ্ধ। অতি নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গেও মেলামেশা করার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত—

"ও মা! এ বলে কি গো। নিজের বোনের স্বামী, তার সঙ্গে দুটো কথা কয়েছে. তাতেই সব অশুদ্ধ হয়ে গেল? আর তোমরা বাছা যে দিনরাত কত কি কর। তাতে বুঝি আর দোষ হয় না? না—তোমরা পুরুষ সবই কর্ত্তে পার আর মেয়েছেলের বেলা, একটু কথা কইলেই সব অশুদ্ধ হয়ে যায়।"[২]

গঙ্গেশ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' গীতিনাট্যখানিতে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধের পর রাবণের হাতে শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণের মূর্ছা যাওয়া এবং হনুমান কর্তৃক বিশল্যকরণী সহ গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন করে লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকে রাবণকে কেবল পরস্ত্রী অপহরণকারী দুর্বৃত্ত লম্পট করে দেখান হয়নি। সে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচারী রামলক্ষ্মণকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সীতাকে হরণ করেছে। রাণী মন্দোদরীর বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে রামচন্দ্রকে সীতা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়নি, "তা হলে ভাই বিভীষণ মনে করবে, আমি সহোদর অপেক্ষা স্ত্রীবাধ্য বেশী। বিভীষণকে শত্রু উপাসনা কারী বলে পদাঘাতে বিতাড়িত করেছি। হৃদয়টা পাষানে বেঁধে ভ্রাতৃ বর্জন করেছি। সীতার জন্য সব দেব, কিন্তু সীতা দিতে পারবোনা। তা হলে রাবণের বীরত্বের ইতিহাসে একটা কলঙ্ক থেকে যাবে।[৩]

১, ২। সীতা নির্বাসন, বেণীমাধব চাকী, ১৩২০, সন, পৃ: ৫৬, ৩২।
৩। লক্ষ্মণের শক্তিশেল, গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩০৪ সন, পৃঃ ৬২

এই গীতি নাটকটিতে অদ্ভুত রামায়ণের অনুসরণে সীতাকে মন্দোদরীর গর্ভজাত কন্যারূপে দেখান হয়েছে। ব্রাহ্মণ রক্ত পান করে মন্দোদরীর যে গর্ভ সঞ্চার হয় সেই গর্ভে এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মায়। সীতার মুখচ্ছবি সেই কন্যারই মুখচ্ছবি। সীতাই আমার সেই কন্যা।"[১]

এখানে মহাবাহু রামচন্দ্র ভ্রাতৃ স্নেহে ভীরু দুর্বল। রাবণ রণক্ষেত্রে এলে তিনি লক্ষ্মণকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ শৌর্যে বীর্যে সাহসিকতায় প্রকৃত ক্ষাত্র বীর। শত্রুর রণহুঙ্কারে সে ভয় পায় না বরং তার ক্ষত্রিয় রক্তে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগে। শত্রুর সিংহনাদ শুনে বীর হৃদয় ভয়ে কাঁপেনা দাদা! উল্লাসে মেতে উঠে, শত্রুর তপ্ত রক্ত দেখে কর তালি দিয়ে নৃত্য করে।"[২]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা নাটকের ছায়া অবলম্বনে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যোগ্য করে 'সীতা' নাটক রচনা করেন। এই নাটকটিতে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্রের সীতা নির্বাসন, অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সীতার আগমন ও আবার পরীক্ষা দিতে বলায় পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্র লালের রামচন্দ্রের ন্যায় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর রামচন্দ্র ছলনার আশ্রয় করে সীতাকে পরিত্যাগ করেন নি। পতিসত্য পালনের জন্য সীতা স্বেচ্ছায় বণবাসিনী হয়েছিলেন।

"তোমার কিছুই দোষ নাই
আমি কি জানিনে নাথ?
কত তুমি ভালবাস দাসীরে তোমার?"[৩]

শূদ্র তপস্বী শম্বুকের তপস্যা জনিত অনাচারের ফলে ব্রাহ্মণ কুমারের মৃত্যু এবং রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও শস্য হানি হয়েছে এই যুক্তি দেখিয়ে রামচন্দ্র শম্বুক হত্যায় উদ্যত হলে সে রামচন্দ্রকে বাতুল সত্যভ্রষ্ট এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের ক্রীড়নক পুতুল বলে অভিযোগ করেছে এবং রামচন্দ্রের মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে শম্বুক তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে—

১, ২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল, গঙ্গেশকুমার চট্টোধাধ্যায়, ১৩৩৪ সন, পৃঃ ৫৮, ১৪৩।

৩। সীতা, শ্রী যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, পৃঃ ৩৯।

"ভূমি শস্যহীনা, রাজ্যে অকাল মরণ
এসকল মম অনাচারে ঠিক জান তুমি ?
হেন যুক্তি হীন বাণী মুখে তুমি উচ্চারণ
করিলে কেমনে নরেশ্বর। এই কিগো ন্যায় নিষ্ঠা তব ?"১

০ ০ ০ ০

শম্বুকের মতে রামচন্দ্র যতদিন সিংহাসনে আরোহন করেননি ততদিন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়ে তিনি সত্যভ্রষ্ট হয়েছেন। তাই বিনা অপারাধে নির-পরাধিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন এবং নির্দোষ শম্বুককে হত্যা করতে এসেছেন।

এইভাবে নাট্যকার শম্বুকের মুখ দিয়ে রামচরিত্রের, দুর্বলতা ও ত্রুটি-গুলির প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত নাটককে বাংলা নাটকে রূপান্তরিত করে বাংলা নাট্য সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর রামায়ণ বিষয়ক সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদগুলির মধ্যে ভবভূতির উত্তর রামচরিত ও মহাবীর চরিত নাটকই প্রধান। সংস্কৃত হুবহু অনুবাদ হলেও নাট্যকারের প্রতিভাগুণে এগুলি মৌলিক রচনায় পরিণত হয়েছে এবং স্বাভাবিকতা কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি।

উত্তর রামচরিতের আলেখ্য দর্শন অংশে দেবর-ভাদ্র বধুর সহজ সরল মধুর সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকারের সূক্ষ্মদর্শিতায় অনেক ছোটখাট বিষয়ও নাটকের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। সীতাকে বনে পাঠানোর সময় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—"তা দেখ, যাতে ঝাঁকনি না লাগে, আর বেশ আরামে যাওয়া যায়, এইরূপ একটি রথ সাজিয়ে শীঘ্র আনতে বল দিকি। সীতা যে আসন্ন প্রসবা তা তাঁর হাঁটা চলার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে—"আমার গর্ভভার যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠছে—একটু আস্তে আস্তে যাই।"২ সীতা জননী বসুন্ধরার মধ্যে সন্তান স্নেহাতুরা জননী

১, ২। জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর অনুবাদিত, ১ম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ৬৭, ১০৪।

হৃদয়ের করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। সীতার দুর্দশা তাঁর মায়ের প্রাণ সহ্য করতে পারেনা। "সীতাকে যখন প্রসব করেছি, তখন আর কি করে শান্ত হব। একে তো অনেকদিন রাক্ষসের মধ্যে বাস। তাতে আবার পতি এঁকে ত্যাগ করেছেন। মায়ের প্রাণে একি সহ্য হয়?[১] সন্তান প্রতিপালনই মায়ের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। সীতাকে মায়ের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন—"বাছা! আমার অনুরোধ রাখো, যতদিন না এরা স্তন ত্যাগ করে ততদিন তুমি এদের প্রতিপালন কর। তারপর তোমার যা অভিরুচি, তাই কর।"[২]

সেকালে ছেলেদের মত মেয়েরাও গুরুগৃহে বাস করে বিদ্যা চর্চা করতো। ঋষি কন্যা আত্রেয়ী সীতার যমজ পুত্র লবকুশের জন্য বাল্মীকির আশ্রম ত্যাগ করে অন্যত্র গুরুর সন্ধানে গমন করেছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে লবকুশ পিতা রামচন্দ্রও পিতৃব্যদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন, উত্তর রামচরিতে লবের সঙ্গে লক্ষ্মণ পুত্র চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ ও যুদ্ধাবসানে বন্ধুত্ব হয়েছিল। নাট্যকার এই দুই বীর শিশুর পরস্পরের যুদ্ধ ও বন্ধুত্ব বর্ণনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের আর একখানি উৎকৃষ্ট নাট্যানুবাদ মহাবীর চরিত। নাটক খানিতে রামের বীরত্ব ও মহত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণে বর্ণিত চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। রামায়ণে রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এসে প্রথমে তাড়কা নিধন করেন তারপর মুনিদিগের আশ্রমে যজ্ঞ রক্ষা করে জনকরাজসভায় হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করেন। মহাবীর চরিতে তাড়কা মিথিলার রাজসভায় এসে রামচন্দ্রকে তাড়া করতে শুরু করলে বালিকা সীতা ও উর্মিলা ভয় পান—"ও মা। চলে গেলেন যে। কি সর্বনাশ। প্রলয় ঝড়ের মত রাক্ষসটা ওকে তাড়া করছে দেখ।"[৩] বিশ্বামিত্রও তাড়কাবধের জন্য রামচন্দ্রকে ত্বরান্বিত করেন। "বৎস! শীঘ্র বধ কর। দেখছনা, সম্মুখে ব্রাহ্মণগণের জনতা হয়েছে।"[৪]

১, ২, ৩ ৪। জ্যোতিরিন্দ্র, গ্রন্থাবলী প্রাগুক্ত পৃঃ ৬৭, ১০৪, ১০৬, ২৬৩।

এই নাটকটিতে নাট্যকার সূর্পনখা চরিত্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছেন। সে কেবল কামুকা রাক্ষসী নহে—একজন কূট রাজনীতিজ্ঞ মহিলাও বটে। রাবণের সঙ্গে সীতার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে জনকের রাজসভা থেকে দূত ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে রামচন্দ্রের হাতে রাক্ষস বধের খবর পেয়ে সূর্পণখা রাবণের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কাকুল হয়ে ওঠে। তাই সে মাতামহ প্রধান মন্ত্রী মাল্যবানের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে বসে। সূর্পণখা ভেবেচিন্তে ঠিক করল, ক্ষত্রিয় নিধনকারী পরশুরাম যদি রামের হাতে পরাজিত হন এবং রাম যদি তাঁকে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভেবে বধ না করেন তবে পরশুরাম আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবেন। আর পরশুরাম যদি রামকে বধ করেন তবে রাবণের শত্রু নাশ হবে। রামচন্দ্র জয়লাভ করলে দেবতারা, ব্রাহ্মণেরা রামচন্দ্রের পক্ষাবলম্বী হবেন। আর বালী রাবণের মিত্র। তাকে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে হবে। সুতরাং পরশুরাম ও বালীকে উত্তেজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল—

এখন বালী ও পরশুরামকে উত্তেজিত করাই কর্তব্য।"[১] রাবণের অনুরোধে বালী রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিল। পরশুরাম রামচন্দ্রের অযোধ্যায় গমন পথ অবরুদ্ধ করলে রামচন্দ্র তাঁর তেজ অপহরণ করেন।

অতঃপর সূর্পনখার কূট বুদ্ধি রামচন্দ্রকে পরাস্ত করার জন্য নূতন পথ ধরল। মায়াবলে সে মন্থরার শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে মন্থরাকে দিয়ে কৈকেয়ীকে রামের বনবাস, ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা করার জন্য প্ররোচিত করল। স্বজন ও বান্ধবহীন অরণ্যচারী রামচন্দ্রকে তা হলে সহজেই বধ করা যাবে। রাজ্যাভিষেকের পূর্বে মন্থরা শরীরে প্রবিষ্টা সূর্পণখা রামচন্দ্রের হাতে কৈকেয়ীর চিঠি পৌঁছে দিল—'তোমার স্নেহময়ী মধ্যমা মাতা তোমাকে আলিঙ্গন করে এই আজ্ঞা করেছেন দেখ বৎস!...পূর্বে মহারাজ আমাকে দু'টি বর দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—তোমার পিতার এই পত্রখানিই এই বিষয়ে বার্তাবাহক স্বরূপ।"[২] সত্যনিষ্ঠ রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য কৈকেয়ীর নির্দেশে বনবাসী হন। কৈকেয়ী দশরথের কাছে রামের বন-গমন ও ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করেন নাই। রামের বনবাস ও ভরতকে রাজ্যদান করার কথা রামচন্দ্রই দশরথকে জানিয়েছিলেন। অভিষেকের পূর্বে দশরথ মুক্ত হস্তে দান করতে শুরু করলে রামচন্দ্র প্রার্থীরূপে এসে দাঁড়িয়ে বলেন—

১, ২। জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ., ২৮৯, ২৯০।

"যে দুটি বর পূর্বে তব প্রতিজ্ঞাত
মেঝ-মাতা তাহা আজি চাহিছেন তাত।
সে বিষয়ে মোরা তাই করি এই প্রার্থনা
অনুগ্রহ করি তাঁর পুরাও বাসনা।"[১]

রামায়ণে রামচন্দ্রের বনগমনের সময় ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। এখানে ভরত ও তাঁর মাতুল যুধাজিৎ তখন অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন এবং ভরত রামচন্দ্রের সঙ্গে বনগমন করতে চাইলেন—"আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আপনার সঙ্গে যাই।"[২] নাট্যকারের অসাধারণ রচনা কৌশলে অনুবাদ না হয়ে নাটকটি মৌলিক রচনায় পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বিশ্ব মননের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় যোগ। কিন্তু বিশ্ব কবি হয়েও তিনি ভারতের কবি। তাই ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাটি তাঁর কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাসে সহস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত যা ভারতের চিরন্তন সম্পদ যার মধ্যে ভারতবর্ষ যুগে যুগে নিজেকে প্রতিফলিত করেছে কবির লেখনীতে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে সসম্ভ্রমে সশ্রদ্ধ বিচরণ করেছেন। অনুপম সৌন্দর্যের আকর গ্রন্থ হিসাবে এই দুই মহাকাব্যকে দেখেছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এক দেশদর্শী নয়। রামায়ণ-মহাভারতকে তিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদি গ্রন্থ হিসাবে দেখেছেন সুগভীর সমবেদনা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে রামায়ণ—মহাভারতের কাহিনীও বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য-নাটক-গল্প এবং প্রবন্ধও রচনা করেছেন। যখন যে কেউ রামায়ণের মাহাত্ম্য খর্ব করেছেন, বাল্মীকির নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রকে হীন দৃষ্টিতে চিহ্নিত করেছেন তখনই তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাই তাঁর লেখনী মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। তিনি আদি কবি বাল্মীকির উপেক্ষিতা অবহেলিতা ঊর্মিলাকে সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখেছেন, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনা তিনি নিছক পৌরাণিক কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর মধ্যে

১, ২। জ্যোতিরিন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯০, ২৯১।

তিনি ভারতের বিপুল ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। দুর্ধর্ষ রাক্ষস রাবণের শক্তির দম্ভের মধ্যে তিনি যান্ত্রিক সভ্যতার সর্বগ্রাসী রূপ দেখেছেন। সর্বোপরি রামায়ণ কাহিনীকে তিনি ত্রেতাযুগের বিষ্ণু অবতার রামচন্দ্রের জীবনালেখ্য রূপে গ্রহণ না করে যুগ যুগ সঞ্চিত রাম কাহিনীর সংহত সংযত বাণীরূপ হিসাবেই দেখেছেন।

প্রবন্ধ : 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'মেঘনাব বধ কাব্যের সমালোচনা', 'যাভাযাত্রীর পত্র', 'কাদম্বরী', 'ধর্মপদ', 'কবি জীবনী', 'স্পষ্ট ও অস্পষ্ট', প্রভৃতি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কাহিনী ও ভাবাদর্শকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আর্য ও অনার্য জাতির সংগ্রাম, আর্য ও অনার্যদের মধ্যে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বন্ধন, আর্য জাতি কর্তৃক অনার্য জাতিদের মধ্যে আর্য সভ্যতা বিস্তার প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আর্যশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্য জয় কৃষি সভ্যতার বিস্তার ও ভারতের আদিম অধিবাসী, নাগ, বানর, ভাল্লুক ও রাক্ষস প্রভৃতি জাতিগুলিকে প্রেমের দ্বারা ভালবাসার দ্বারা জয় করার ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রাধান্য স্থাপন নিয়ে যে রেষারেষি চলছিল তাও উল্লেখ করেছেন। কবিগুরুর দৃষ্টিতে রামায়ণ মহাকাব্য প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সভ্যতা ও সমাজের বিবর্তন কাহিনী, রামায়ণে বর্ণিত সুসভ্য আর্য জাতিরা অনার্যদের ধ্বংস করে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেনি। অধিকন্তু তারা প্রেম ভালবাসার দ্বারা অনার্যদের মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। তাই রামচন্দ্র অনার্য বানর, ভাল্লুক, পক্ষী, নাগ, রাক্ষস প্রভৃতি জাতিকে সহজেই মিত্র জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন। গুহক চণ্ডাল, রাক্ষস বিভীষণ, বানর রাজ সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতি রামচন্দ্রের সহকারী ও অনুগত। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে এই মিলন সাধনের কাজে বিশ্বামিত্র ও জনক ছিলেন রামচন্দ্রের সহায়। "রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা—এবং বিশ্বামিত্র রাম চন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলন।[১]

১। রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩ দশ খণ্ড), প্রাগুক্ত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা পৃঃ ১৪০।

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়' তিনি রামায়ণ মহাভারতকে ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের আকর গ্রন্থ হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। রামায়ণে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিরোধে রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তার প্রমাণ, "তিনি তাঁদের বংশের কুলোপুরোহিত বশিষ্ঠের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় বিরোধী পরশুরামকেও নিজ বশে আনিয়াছিলেন।"[১] রামচন্দ্র যে ক্ষত্রিয় পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উভয় কাব্যে পরশুরামের তেজ রামচন্দ্র নিজ দেহে ধারণ করেছিলেন, অর্থাৎ পরশুরামের শক্তিকে রামচন্দ্র স্ববশে আনলেন। ক্ষত্রিয় বিরোধী ব্রাহ্মণ পরশুরামের গর্ব তিনি খর্ব করলেন।

রামচন্দ্র জনক রাজার রাজসভায় হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করলেন। অর্থাৎ অনার্যদের স্ববসে এনে কৃষি সভ্যতা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করলেন। জনক হলেন তাঁর সহায়ক। আর বিশ্বামিত্র তাঁকে পূর্বেই এ কাজে ব্রতী করেছেন। রাবণের সীতা হরণ ও রামচন্দ্রের রাবণকে পরাভূত করে সীতা উদ্ধার দক্ষিণ ভারতে কৃষি সভ্যতা বিস্তারের রূপক। কারণ রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ অনার্য রাক্ষসগণ কর্তৃক কৃষি সভ্যতাকে ধ্বংসের চেষ্টা করা। কিন্তু আর্যকুলগৌরব রামচন্দ্র দশাননকে বধ করে সীতা অর্থাৎ কৃষি সভ্যতাকে পুনরুদ্ধার করেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্য : 'আর্যরা প্রথমে পূর্বভারতে ও পরে দক্ষিণ ভারতে অনার্য শক্তিকে প্রতিহত করে কৃষি নির্ভর নব সভ্যতার বিস্তার করেন।'[১]

কবি গুরু আরও দেখাতে চেয়েছেন রামচন্দ্র যাগ-যজ্ঞ বিরোধী অনার্যদের মধ্যে একেশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথে যুগ যুগান্তরের পথ বেয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে ভক্তি ধর্ম ও ব্রাহ্মবিদ্যা সমগ্র ভারত ভূমি প্লাবিত করেছিল। ভারতবর্ষ কখনো বিচ্ছেদের পথ ধরে নাই ধর্মকে আশ্রয় করে সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ মিলনের পথ ধরেছিল। রামচন্দ্রের প্রেমধর্মের কাছে আর্য অনার্য সকলে মিলিত হয়েছিলেন। রামচন্দ্র প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত কোন জাতি, কোন ধর্মকে দূরে

১। রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, প্রবোধ চন্দ্র সেন, পৃঃ ১৯

ঠেলে রাখেনি। তাই শক, হূন, পাঠান, মোগল, ইংরাজ এক দেহে লীন হতে পেরেছে। ইহাই ভারতীয় সভ্যতার মূলগত আদর্শ।

প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত 'কাদম্বরী' চিত্রে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস তার রাজারাজড়ার ইতিহাস, যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ঘটনাপঞ্জীর ইতিহাস নহে। ভারতের জাতীয় মাহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে ভারত-বাসীর জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের ছয়টি কাণ্ড ও মহাভারতের আঠারটি পর্বে বহু বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনার বর্ণনা দিতে দিতে হঠাৎ আনন্দে পরিপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে চরম বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্যের দিকে চলে গেলেন, রামায়ণে রামসীতার মিলণোৎসবের মধ্যে সীতা নির্বাসনরূপ চরম ঔদ্যসীন্য ও পরম ত্যাগ বরণ করা হল। মহাভারতও একই ভাবে ভোগবিলাস বিমুখ বৈরাগ্য প্রিয় ভারতবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। "যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। ... ... রাক্ষস যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল তখন গল্পের উপর অত বড়ো একটা জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিষ্ণু ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা করিতে পারে। কেনই বা সে মার্জনা করে? কারণ, গল্পের শেষ শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। চিন্তা করিতে করিতে, প্রশ্ন করিতে করিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে ভারতবর্ষ সাতটি প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং আঠারোটি বিপুলায়তন পর্ব অকাতর চিত্তে মৃদু মন্দ গতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছু মাত্র ক্লান্তি বোধ করেনা।"[১]

রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় ধর্মপদেও রবীন্দ্রনাথ ভারবর্ষের ইতিহাসের একটি সত্য পরিচয় লাভ করেছেন। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক যুগে যে চিন্তা, যে ভাব ধারা চারিদিকে বিরাজমান ছিল বুদ্ধদেব সেগুলিকে সংহত সংযত মূর্তিদান করেছেন। ভারতবাসীর কাছে তার জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য-গুলির মধ্যেই জাতির প্রকৃত ইতিহাস চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান আছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই উপাদানগুলি অতীত ও বর্তমান ভারতকে

১। রবীন্দ্ররচনাবলী (১৩শ খণ্ড) প্রাচীন সাহিত্য. পৃঃ ৬৬২ (৩০)।

এক ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করেছে। এই যোগ ও ঐক্যের ইতিহাস ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। রবীন্দ্র ভাবনায় "ভাতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন কোনদিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাঁধিয়া তুলিতে পারে নাই। সুতরাং এদেশে কে কবে রাজা হইল, কতদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবদ্ধভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোন আগ্রহ জন্মে নাই।"১

প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'রামায়ণ' প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণী কথার ভূমিকারূপে লিখিত। কবি তাঁর লেখা ভূমিকাটিতে দীনেশচন্দ্র সেনের 'পূজারতির' মধ্যে 'ঘণ্টাধ্বনি' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি মহাকাব্যের স্বরূপ এবং ভারতবর্ষীয় মহাকাব্য রামায়ণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষ এই দুই মহাকাব্যে যুগে যুগে নিজেকে প্রকাশ করে আসছে। মুদির দোকান থেকে শুরু করে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই এই দুই মহাকাব্যের সমান আদর। ভারতবাসীর কাছে রামায়ণী কথা কখনো পুরাতন হয়নি, হবেও না। রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণ স্বপ্রকাশিত। কবির ভাষায়—"ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্য হর্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।২ এক কথায় রামায়ণ প্রবাহ ভারতবর্ষে কখনো পুরাতন হয়নি, কারণ রামায়ণের যুদ্ধ জয়ের কথা, রাজ্য জয়ের কথা বড় নহে। মানবহৃদয়ের চিরন্তন সুকুমার বৃত্তি স্নেহ, প্রেম ভালবাসার কথাই বড়। মানুষের মহত্বকেই রামায়ণ বড় করে দেখিয়েছে, "রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজ গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।৩

ভারতীয় জনজীবনে রামায়ণের অক্ষুন্ন আবেদনের মূলে কবি কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন (১) রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষ নিজেকে প্রকাশ করেছে, (২) গৃহধর্মকে রামায়ণ শ্রেষ্ঠধর্ম বলে ঘোষণা করেছে আর ভারতবর্ষ সবার উপরে গৃহধর্মকে স্থান দিয়েছে—রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য—স্নেহ প্রেম, ভালবাসা, কর্তব্য নিষ্ঠা এই গৃহাশ্রমের

১, ২। রবীন্দ্ররচনাবলী (১৩শ খণ্ড), প্রাচীন সাহিত্য, পৃঃ ৬৬২ (৪৫), ৬৬২ (৩০)।

আদর্শ, (৩) রামায়ণের রাম দেবতা নহেন তিনি মানব শ্রেষ্ঠ। (৪) রামায়ণের মধ্যে ভারতবাসী যুগ যুগ ধরে তার চিত্ত বিকাশের উপাদান খুঁজে পেয়েছে। ভোগের মধ্যে ভারতবর্ষ কখনো আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকতে চায়নি। একটি নিরাসক্ত বৈরাগ্য ভারতীয় মনন ধারার বৈশিষ্ট্য। রামায়ণ, মহাভারতের সেই পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে পরম ত্যাগ, চরম বৈরাগ্যকে পরমা প্রাপ্তি বলে গ্রহণ করেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্যে উপেক্ষিতা প্রবন্ধে মহাকবি বাল্মীকির উপেক্ষিতা অনাদৃতা রঘুকুলবধূ ঊর্মিলার প্রতি সমবেদনায় কবি হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠেছে। রামায়ণে সীতার দুঃখ অপরিসীম কিন্তু সীতার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মিলার দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার কিছুমাত্র কম নয়। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ঊর্মিলার মস্তকোপরি রাজান্তঃপুরের অবরোধের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলেন। আদি কবির করুণ দৃষ্টি যাকে উপেক্ষা করল, আধুনিক কবির মমতার স্পর্শে সে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ম্লানমুখী ঊর্মিলার অপরিসীম দুঃখের প্রতি কবি বেদনার্দ্র চিত্তে সমবেদনা আকর্ষণ করলেন। "লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকার আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু সীতার জন্য ঊর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসার নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ঊর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।"[১]

রামায়ণের কবি ও কবির সৃজনী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কাছে কবির দৈনন্দিন জীবন চরিতটাই মুখ্য নয়। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা বেঁচে থাকেন। বাল্মীকির অমর মহাকাব্য রামায়ণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে পূর্ণাঙ্গ করে পেয়েছেন, আর কোন পরিচয়ই তাঁর কাছে বড় নয়।—

"বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবন চরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য।"[২]

রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে আত্মমগ্ন হয়েছিলেন।

১, ২। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩ দশ খণ্ড, পৃ, ৬৬২ (৪০), ৮২২

তাই যে কোন প্রসঙ্গকেই রামায়ণী কথার আধারে পরিবেশন করতে পারতেন। স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রবন্ধে কাব্যের ভাষা কি হবে তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উত্তর রামচরিতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে ভাবের আবেগে ভাষার অস্পষ্টতা জন্মায়। সীতার স্পর্শ সুখে রামচন্দ্র যখন বলেন, 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা তখন ভাষার এই অস্পষ্টতার মধ্যে ভাবব্যঞ্জনা কিছুমাত্র কম আত্মপ্রকাশ করেনা অথচ ভাষায় স্পষ্ট করে কিছু বলা হলনা।

রামায়ণের এক একটি কাহিনী কবি হৃদয়কে বিশেষভাকে মুগ্ধ করেছে। তাই ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে ইন্দুমতী কর্তৃক রাজন্যবর্গের প্রত্যাখ্যান অপূর্ব ছন্দোময় ভাষায় ব্যক্ত করতে পেরেছেন। বালিকা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভা। মহাপরাক্রমশালী রাজন্যবর্গ উপস্থিত। ইন্দুমতী একে একে রাজন্যবর্গকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। বালিকা তাঁদের পতিত্বে বরণ করছেন না। কিন্তু তাঁদের প্রতি বালিকার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অভাব নেই। ইন্দুমতী রাজকন্যা রাজোচিত উচ্চ মর্যাদাসহকারে এক একটি নম্র নমস্কারে তিনি তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন।

লিপিকার "পুনরাবৃত্তি" গল্পটি রামায়ণী প্রসঙ্গের অবতারণ করে পরিকল্পিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র গল্পটির মধ্যে তিনি রাম-সীতা ও রাবণকে সন্নিবেশিত করেছেন। মন্ত্রীকন্যা রুচিরা ও ব্রাহ্মণ পুত্র কৌশিক প্রাচীরের কাছে গাছপালায় "রামসীতার বনবাস" খেলছিল। রামরূপী কৌশিক ভাঙ্গা ডালপালা নিয়ে দণ্ডকবনে কুটির বাঁধছিল। আর সীতাদেবী রূপিনী রুচিরা শাকপাতা দিয়ে খেলার হাঁড়িতে রামের জন্য রান্না করছিল। রাজা তাদের খেলার সাথী হয়ে রাক্ষস সেজে বার বার মৃত্যু বরণ করলেন। কাহিনীর শেষাংশে মন্ত্রীও অধ্যাপকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজার আগ্রহাতিশয্যে রুচিরার সঙ্গে কৌশিকের 'রামের বনবাস' খেলার পুনরাভিনয় হল। কৌশিক ও রুচিরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হল।

'লোক সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লোক সাহিত্যের উপাদান হিসাবে হর গৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অপেক্ষা রামসীতার কাহিনী অধিকতর উন্নত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে মানুষকে মানুষ করে তোলার, মানুষের সামনে উচ্চনৈতিক আদর্শ তুলে ধরে লোকশিক্ষা প্রদানের এমন উপাদান আর কোথাও নেই। অথচ আমাদের লোক সাহিত্য সমূহে রামসীতার কাহিনী বহুল প্রচারিত নহে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের

কথায় সৌন্দর্য বৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয় বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রকৃতির অবতারণা হয় নাই। তাহার বীরত্ব, মহত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগ স্বীকারের আদর্শ নহে। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ। তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণ—কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত।"[১]

'মেঘনাদ বধ কাব্য' ও 'মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা' এই দুইটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্য ও কাব্যের আঙ্গিকের তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রথম নিবন্ধটিতে তিনি মেঘনাদ বধ কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে মেঘনাদ বধ কাব্যটির ত্রুটি সমূহ ব্যক্ত করেছেন। কবির মতে কেবল যুদ্ধ বর্ণনা থাকলে এপিক বা মহাকাব্য হয়না। কবির কাব্যে যখন একটি মহৎ ভাবের, মহৎ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তখনই মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়। মহাকাব্যের নায়ক হবেন সর্বজনপূজ্য। তাঁর চরিত্র মাধুর্যকে কেন্দ্র করে একটি মহান আদর্শ মহান ভাব ধারা বিকশিত হবে। "মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরম পুরুষ কবিদিগের কল্পনা রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্যচরিত্রের উদার মহত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষায় মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন। সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাক, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সে মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্যকিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য।"[২]

রবীন্দ্রনাথের উপরি উক্ত সংজ্ঞানুযায়ী মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য হতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ আরও মন্তব্য করেছেন যে তিনি

১, ২। রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩ দশ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩৪-৭৩৫, ৬০০।

হোমারের অন্ধ অনুকরণ করেছেন বলেই তাঁর কাব্যে মহাকাব্যের পরিবেশ থাকা সত্বেও মহাকাব্য হতে পারেনি। পর পদচিহ্ন অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁর কাব্যে কবির অন্তর্লোক অনুভূত সহজভাবের সহজ প্রকাশ অনুপস্থিত।

মেঘনাদ বধ কাব্য বীর রসাত্মক কাব্য হলেও মাইকেল এতে মহাকাব্যের উপযোগী ভাব গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন নি। রাময়ণের মহা-ভয়ংকর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাবণের চরিত্র অংকন করতে গিয়ে রাবণকে ভীরু কাপুরুষ ও দুর্বল করে ফেলেছেন। রাবণের চরিত্র যেন পুত্র শোকাতুরা রোরুদ্যমানা মন্দোদরী। রাবণের রাজসভাটিকেও মাইকেল শৌর্যবীর্য ও ভাব-গম্ভীর পরিবেশের পরিবর্তে রাজা-রাজড়ার প্রমোদ উদ্যানে পরিণত করেছেন। সমুদ্রের বিশাল বিরাট রূপের সঙ্গে বর্ষার জলধারার তুলনা করে লেখক আর একবার গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেললেন, বীরবাহুর শোকে সবাই কাঁদছে, কিন্তু বীরশোক যে অশ্রু নহে মাইকেল তা ভুলে গেলেন। রামায়ণের মহাবীর রামকে মাইকেল ভিখারী রাঘবে পরিণত করেছেন। যে সমস্ত দেবদেবীর চরিত্র অংকন করেছেন তাদের মধ্যে কোথাও দেব ভাব নেই। লক্ষ্মী, মায়াদেবী, শচী-ইন্দ্র, মহাদেব-পার্বতী সবাই যেন মর্ত্যের মানবমানবী। পার্বতীর সঙ্গে মদনের আলাপে, পার্বতীর সঙ্গীসহ মহাদেবের নিকট আসার অসম্মতি জ্ঞাপনে চিরাচরিত নিয়ম ও প্রচলিত বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'পতি পরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতিসমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা কোন ধর্মশাস্ত্রে পড়ি নাই।''[১] কার্তিকের দেহে রক্ত ধারা দেখে শক্তিরূপিনী, অসুর মর্দ্দিনী দুর্গার কাতর হওয়ার দৃশ্যটিতেও মাইকেল বীরভাবের বিরোধিতা করেছেন।

রঘুকুলবধূ উর্মিলার মত ঋষিবধূ অহল্যার প্রতিও রবীন্দ্রনাথের ছিল গভীর সমবেদনা। অহল্যা গৌতম ঋষির অভিশাপে দীর্ঘদীন ধরিত্রীতলে পাষাণস্তূপে পরিণত হয়েছিলেন। রামচন্দ্রের স্পর্শে তিনি আবার পূর্বের মানবী রূপ ফিরে পান। রামায়ণের এই আখ্যায়িকাটিকে রবীন্দ্রনাথ 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় অপূর্বসুন্দর বাণীরূপ দিয়েছেন। অহল্যা পাষাণী হয়ে ধরিত্রীর বুকে মিশেছিল। অহল্যার কাছে কবির প্রশ্ন সে যে এতকাল বসুন্ধরার

১। রক্তকরবী, রবীন্দ্রচনাবলী. ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪

দেহে লীন হয়েছিল তখন কি তার দেহে চেতনা ছিল? সে কি বসুন্ধরার অপার মাতৃস্নেহ অনুভব করতে পেরেছিল?

"কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবা নিশি,
অহল্যা পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,
নির্বাপিত হোম অগ্নি তাপস বিহীন
শূন্যতপোবনচ্ছায়ে? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বির সাথে হয়ে এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ?
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা?"[১]

রামচন্দ্রের স্পর্শে রামায়ণের অহল্যার মত রবীন্দ্রনাথের অহল্যাও অভিশাপান্তে এক কলুষলেশশূন্য নব জীবন লাভ করে নব নব সম্ভাবনাময় রহস্যময়ী ও অপার বিস্ময়ের বস্তুরূপে দেখা দিয়েছেন—

সেথায় স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপরেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা। দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর, সরল, শুভ্র, হয়ে বাক্যাহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।[২]

ভাষা ও ছন্দ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির কবি প্রতিভা উন্মেষের প্রচলিত কাহিনীর বাণীরূপ দিয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণে ক্রৌঞ্চ বধূর শোকে বাল্মীকির অন্তর হতে প্রথম ছন্দোময় অব্যক্ত বেদনার প্রকাশ শোকগাথা বা শ্লোক—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকম অবধী কাম মোহিতম্‌॥"[৩]

কবির হৃদয় নিঃসারী এই শ্লোক উৎসারিত হওয়ার পর বাল্মীকি আনন্দ বেদনা ও বিস্ময়ে হতবাক হলেন। বিস্ময় বিমূঢ় কবি চিত্তের প্রকাশ 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়—

১, ২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩২৫, ৩২৬।
৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (৩য়) পৃ, ০১৪।

"গভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ, বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত
তারে লয়ে কি করিবে, ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ," [১]

আদি কবিকে বেশীক্ষণ ভাবতে হয়নি। আদি কবি নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রের জীবনালেখ্য রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করলেন। দেবতার স্তবগীত আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, তারায় ঘোষণা করছে। তাদের ভাষা অন্তহীন। মানুষের ভাষা মানুষের চারিধারে সীমাবদ্ধ। কবি মানুষের ভাষাকে অমরত্ব দান করে মানুষকে বড় করে তুলতে চান।

"তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে,
গাবে যুগ যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,
ক্ষণস্থায়ী নবজন্মে মহৎ মর্যাদা করি দান।
হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ পায়ে
স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়োনা ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানবেরে মোর ছন্দগানে।" [২]

রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান অবলম্বনে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতাটিতে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অযোধ্যায় আনার জন্য বারাঙ্গনাদের প্রেরণ করা হয়েছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ কখনো লোকালয় বা নারীমুখ দেখেন নাই। নারীর ছলাকলা এই ঋষি কুমারের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। তিনি তাঁহার সহজাত বনপ্রকৃতির সরলতায় মনোমোহিনী বারাঙ্গনাদের দেখেছিলেন! তাদের মধ্যে একটি নারীর হৃদয়ে ঋষিকুমারের সরলতা ও মুগ্ধতায় নারীত্ব-মাতৃত্ব জেগে উঠল। কুমারের পবিত্র দৃষ্টিতে পতিতা হয়ে গেল দেবী। তার সকল কলুষ ধুয়ে মুছে গেল। পতিতার উদ্দেশ্যে বালক ঋষি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করল—

"আনন্দময়ী মুরতি তোমার,
কোন, দেব তুমি আনিলে দিবা।

১। বাল্মীকি রামায়ণম্, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (৩য়) ভাষা ও ছন্দ, পৃ, ৯১৬।

অমৃতসরল তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"[১]

চিরদিনের অবহেলিতা, ঘৃণিতা নারী তার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করল—

"দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার,
সরল নয়ন করেনি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।"[২]

'অহল্যার প্রতি' কবিতার মত এখানেও কবি নাম মাত্র ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান অবলম্বন করে নারী জীবনের সহজাত পবিত্রতা, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রকাশ করেছেন। আদি কবি বাল্মীকি পতিতা নারীদের এই মহত্ব এই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। সংবেদনশীল উদার হৃদয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম এদের মহত্বের আসনে, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

"পুরস্কার" কবিতায় রামায়ণ মহাভারতের প্রতি মানব হৃদয়ের আবেদন যে কতখানি কবি তা ব্যক্ত কারেছেন। কবি রাজসভায় এসে প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে যান। তারপর মনে মনে দেবী ভারতীর চরণ বন্দনা করে কবিকণ্ঠ বাঙময় হয়ে উঠল। প্রথমেই কবি বাল্মীকির অমর মহাকাব্যের মধ্যে যে মহান দুঃখ, যে অপারিসীম বেদনা করুণ রাগিণীতে বেজেছিল কবি সজল কণ্ঠে তা ব্যক্ত করেছেন। রাজকুমার ও রাজবধূ সীতার জীবনের দুঃখ অপারিসীম। কোথায় রাজ্যাভিষেক? আর কোথায় বনবাস। তারপর শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করে রাবণের সীতা হরণ, সীতার বনবাস ও সীতার পাতাল প্রবেশ সমেত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী মহাকালের যাত্রা পথে ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু সেদিনের সে করুণ রাগিনী কালের সীমাকে অতিক্রম করে আজও মানব হৃদয়ে অনুরণিত হয়—

"শুধু সে দিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,

১, ২। রবীন্দ্ররচনাবলী (৩য়) ভাষা ও ছন্দ, পৃঃ ৯১৩।

সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিনী আছিল ধ্বনিতে,
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে ॥''১

রামায়ণ কাহিনীর অক্ষুন্ন আবেদন কেবল ভারতীয় কবিচিত্ত ও গনমানসে নয়, ভারতীয় শিশু চিত্তও রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে সুদূরে পক্ষ বিস্তার করেছে। সাধারণতঃ রামের বনবাস, রাম রাবণের যুদ্ধ, দুর্ধর্ষ রাক্ষস ও আকাশচুম্বি হনুমানের বিরাট দেহ শিশু মনের উপর গভীর রেখা পাত করে। শিশু রবীন্দ্রনাথের মনেও রামায়ণের কাহিনী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার সেই শিশুমনের কল্পনারই ফল শ্রুতি 'বনবাস' 'হনুচরিত্র', চিত্রকূট প্রভৃতি কবিতা।

'বনবাস' কবিতায় শিশুটি লক্ষ্মণের মত একটি ভাই সঙ্গী পেলে বনবাসে, যেতে প্রস্তুত আছে। অবশ্য রামের মত বনবাসে গিয়ে রাবণের সঙ্গে সে যুদ্ধ করবেনা। কারণ তার সঙ্গে ত সীতা নেই। কাজে কাজেই রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধের কোন কারণও নেই—

রাক্ষসেরে ভয় করিনে,
আছে গুহক মিতা—
রাবণ আমার কি করবে মা,
নেইতো আমার সীতা।২

'চিত্রকূট' কবিতায় রান্না ঘরের পাশে, ছাদের গাদার কাছে একটুখানি নিরিবিলি জায়গা শিশুর কল্পনা রাজ্যে রাক্ষস সংকুল 'চিত্রকুটের' স্থান নিয়েছে। এখানে বৃদ্ধ ও লম্বা দাড়িওয়ালা বাস করেন—

চিত্রকুটের পাহাড় তলা সে হল ঘোর বন।
কেউ জানেনা সেথায় থাকেন অষ্টাবক্র মুনি—
মাটির পরে দাড়ি গড়ায়, কথা কননা উনি।
রাত্রে শুয়ে বিছানাতে শুনতে পেতাম কানে
রক্ষসেরা পেঁচার মত চেঁচাত সেইখানে।''৩

১। রবীন্দ্র রচনাবলী (১ম খণ্ড), পৃঃ ৪২৭।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (২য়) শিশু, পৃঃ ৩৬।
৩। তদেব (৪র্থ) বিচিত্র চিত্রকূট, পৃঃ ৯৫৭।

'হনুচরিত' কবিতায় রামায়ণের বীর হনুমানের প্রতি শিশু মনের অপরিসীম কৌতূহল বর্ণনা করা হয়েছে। গন্ধমাদন পর্বতবাহী হনুর যেমন বীরত্ব ও কার্যকুশলতা তেমনই অসাধারণ দাপট। হনুর বিপুলকায় দেহ ও লেজের দাপটে সূর্য ঢাকা পড়ে গেল। শালের গুঁড়ি ভাঙল। দশটি আঙুলে দশটা পাহাড়ও ঠেকে গেল। নদীর স্রোতের মাঝে মোটা লেজ বাঁধের সৃষ্টি করল। পাহাড়ের চূড়া খসে পড়ল। গাছে গাছে ঠোকাঠুকি হয়ে আগুন জ্বলে উঠল। ডালে পাখীরা আর্তরবে চিৎকার করে উঠল। গন্ধমাদন হনুর পিঠে উড়ে চলল। হনুর পদভারে পৃথিবী কেঁপে উঠল। চারদিকে ঘূর্ণিধুলো পৃথিবী ও আকাশ পরিব্যাপ্ত করল—

উপুড় হয়ে গন্ধমাদন পড়ল লুটে,
বসুন্ধরার পাষাণ বাঁধন যায় যে টুটে।
ভীষণ শব্দে দিগ্‌দিগন্ত থরথরিয়ে
ঘূর্ণি ধুলো নৃত্য করে অম্বরেতে,
ঝঞ্ঝাহাওয়া হুংকারিয়া বেড়ায় মেতে,
ধূসর রাত্রি লাগল যেন দিগ্বিদিকে।
গন্ধমাদন উড়ল হনুর পিঠে চেপে,
লাগল হনুর লেজের ঝাপট আকাশ ব্যেপে
অন্ধকারে দন্ত তাহার ঝিকিমিকে।''১

রামায়ণী ভাব, বিষয় ও আখ্যান বস্তু অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'রক্ত করবী' নাটক রচনা করেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নৃত্য নাট্যে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বাল্মীকি রামায়ণ, বিহারী লালের সারদামঙ্গল ও মহাকবি কালিদাসের জীবন কাহিনী দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করে কবি বাল্মীকিকে দস্যুদলের রাজা করেছেন। দস্যু মাত্রেই নৃমুণ্ডমালিনী ভয়ংকরী কালীর উপাসক। কৃত্তিবাসের দস্যু রত্নাকর সদল বলে বন পথে পথিকের সর্বস্ব

১। রবীন্দ্ররচনাবলী (৪র্থ খণ্ড) বিচিত্র, পৃঃ ৯৬০—৯৬১, পঃ বঃ সঃ জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ।

কেড়ে নিত। নারদ ও ব্রহ্মা পথচারী সন্ন্যাসী। তাঁরা বাল্মীকিকে এই পাপ পঙ্কিল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিরও মানস পরিবর্তন হয়েছিল বলিদানের নিমিত্ত আনীত বালিকার কাতর আর্তনাদ শ্রবণে। কৃত্তিবাসের বাল্মীকি যেমন দস্যুবৃত্তিকে পাপ বলে পরিত্যাগ করেছেন ঠিক তেমন ভাবেই রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি দস্যুবৃত্তিকে পাপ বলে পরিত্যাগ করেছেন—

"এসব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ······ ত্রাহি—সব ছাড়িনু।"[১]

অনুরূপভাবে কৃত্তিবাসের বাল্মীকিও পাপ ব্যবসা পরিত্যাগ করতে চান—

"আপনি করিয়া কৃপা দিলা দিব্য জ্ঞান।
এসব পাপে কিসে পাব পরিত্রাণ।"[২]

বীণাপাণি ভারতীর আবির্ভাব ও বাল্মীকিকে বর দানের ঘটনা বর্ণনায় কবি রামায়ণ অপেক্ষা কালিদাসের জীবন চিত্র দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়েছেন। কালিদাস ভারতীর বর লাভ করে অসাধারণ কবি প্রতিভার অধিকারী হন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিকেও দেবী সরস্বতী অমর বর দান করেন—

"যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে,
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য স্রোত রবে।"[৩]

বাল্মীকির অমর রামায়ণ কাব্য যুগ যুগ ধরে ভারতের অমর কবি-কুলকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

"বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।"[৪]

১, ৩, ৪। বাল্মীকি প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃঃ ১০, ২০।

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৪

এর সঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণের নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি তুলনীয়—

(ক) "যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয় সরিতশ্চ মহীতলে ।।[১]
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ।"

(খ) অপর শ্লোকটি—
"আশ্চর্যমিদমাখ্যানং মুনীনাং সম্প্রকীর্তিতম ।
পরং কবিনামাধারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্ ।।
অভিগীতমিদং গীতং সর্ব্বগীতেষু কোবিদো ।"[২]

রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধুবধের উপাখ্যান অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'কালমৃগয়া' রচনা করেন। 'বাল্মীকি প্রতিভার দ্বিতীয়' সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়াকে' ভেঙ্গে এক করে বাল্মীকি প্রতিভার নবরূপ দান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক সমূহের মধ্যে 'রক্তকরবী' অন্যতম। 'রক্তকরবী' নাটকের রূপকার্থের মধ্যে কবি রামায়ণী সভ্যতার ভাববস্তুর সন্নিবেশ করেছেন। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার রাজা রাবণ যেমন অত্যাচারী তেমনই দাম্ভিক। রাবণের শক্তির দম্ভ সকলকে পরাস্ত করেছে। এমনকি দেবতাদেরও নিজের প্রাসাদে এনে আত্মসেবায় নিযুক্ত করেছে। রক্তকরবীর রাজা, অধ্যাপক, বিশুপাগলা, রঞ্জন প্রভৃতিকে তার স্বর্ণপুরীর তাল তাল স্বর্ণ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করেছে। রামায়ণের সীতা হরণের ফলে রাবণের শক্তির দম্ভ ধূলায় লুণ্ঠিত। রক্তকরবীতেও মানবকন্যা নন্দিনীর আবির্ভাবে রাজার মানসিক পরিবর্তন শুরু হল। রাজা নিজের ধ্বজা নিজের পতাকা নিজেই ভাঙ্গতে শুরু করলেন। রাজা নন্দিনীকে বলে, আমাকে তোমার সাথী করে নাও।

রক্ত করবীতে কর্ষণজীবি ও আকর্ষণজীবি সভ্যতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। রামায়ণেও সীতা শব্দের মূল অর্থ হল চালনরেখা' অর্থাৎ কৃষিবিদ্যা। রাবণ

১, ২। বাল্মীকি রামায়ণম্, পৃঃ ৮, ১২

আকর্ষণজীবি সভ্যতার প্রতীক; রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের অর্থ কৃষিসভ্যতাকে ধ্বংস করে যন্ত্র সভ্যতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। রাম রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করলেন অর্থাৎ আকর্ষণজীবি সভ্যতা বিনষ্ট করে কর্ষণজীবি সভ্যতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হল।

রবীন্দ্রনাথ রক্ত করবীর রাজার সঙ্গে রামায়ণের রাবণ ও বিভীষণ উভয়ের তুলনা করেছেন। "আদি কবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিলনা, এই কারণে লংকাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই। তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে"। রাবণ ও বিভীষণের বাসস্থল স্বর্ণলংকা ধনের প্রাচুর্য ও ঔজ্জ্বল্যে শক্তির দম্ভে পরিণত হয়েছে, আর কবির নাটকের ঘটনাস্থল যক্ষপুরীতে ক্রমাগত ধন সংগৃহীত হতে হতে ভার বা বোঝায় পরিণত হয়েছে। স্বর্ণলংকার মতই সে বোঝা আপনার ভারে আপনাকেই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করেছে।

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১৫শ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৬

গ্রন্থপঞ্জী

অজিত কুমার ঘোষ, সম্পাদিত — দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

অনুকূল চন্দ্র গোস্বামী — দশরথের মৃগয়া

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ভারত শিল্পে মূর্ত্তি : ভারতশিল্পের গড়ন

অভেদানন্দ স্বামী — ভারতীয় সংস্কৃতি

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত — শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত — চণ্ডীমঙ্গল

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১ম-৪ খণ্ড ; ঊনবিংশ শতাব্দী প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ঊনিশ-বিশ ; বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর

অসিতকুমার হালদার — ভারতের শিল্প কথা

আনন্দময় মুখোপাধ্যায় — রামায়ণের যুগে ভারতসভ্যতা

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ — বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড

আবদুল আজীজ আল্-আমান সম্পাদিত — ঋগ্বেদ সংহিতা

(স্যার) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় — যজুর্ব্বেদ সংহিতা

আশুতোষ ভট্টাচার্য — জাতীয় সাহিত্য

আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড

— বঙ্গীয় লোক সঙ্গীত রত্নাকর, ১ম-৪র্থ খণ্ড ;

— বাংলার লোকনৃত্য ;

— বাংলার লোকশ্রুতি ;

— সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া

আশুতোষ ভট্টাচার্য ও
শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত — বাইশ কবির মনসামঙ্গল

ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ — রামলীলা

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস — ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত, ১ম খণ্ড

কনক চন্দ্র শর্মা কাব্যতীর্থ সম্পাদিত — কন্দলী রামায়ণ

কামিনী রায় — পৌরাণিকী

কালিদাস রায় — প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম-৪র্থ খণ্ড ; বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড

কালিবর দেবশর্মণ — শিবপুরাণম্

কালিপ্রসন্ন সিংহ — বাংলার নবাবী আমল ; মহাভারত

কেদারনাথ মজুমদার — রামায়ণের সমাজ

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — ভরতবিলাপ

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার — রাবণ বধ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ — শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, রাধা গোবিন্দ নাথ সম্পাদিত

কৃত্তিবাসী রামায়ণ — শ্রীরামপুর ছাপাখানা, ১৮০৩

কৃত্তিবাসী রামায়ণ — বঙ্গবাসী সংস্করণ

কৃষ্ণেন্দ্র রায় — সীতাচরিত্র

স্বামী গম্ভীরানন্দ — উপনিষৎ গ্রন্থাবলী

গণেশকুমার চট্টোপাধ্যায় — লক্ষ্মণের শক্তিশেল :

গিরীশ রচনাবলী, ১ম-৪র্থ খণ্ড — সাহিত্য সংসদ

গুরুতারণ মুখোপাধ্যায় — লক্ষ্মণের শক্তিশেল

গোপাল হালদার — বাঙ্গালীর সংস্কৃতির রূপ

গোবিন্দ চন্দ্র দাস — রামলক্ষ্মণ

চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত — পাহাড়পুরের বিবরণ

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী — বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ — শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা

জনৈক বিখ্যাত সাহিত্য সেবী কর্তৃক — রামায়ণ
সম্পাদিত

জনৈকা দুঃখিনী স্ত্রীলোক — অশোকবনে সীতা

জয়ানন্দ — চৈতন্যমঙ্গল, বিনয় খণ্ড

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী — প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর অবদান

জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড — বসুমতী সাহিত্য মন্দির

তমোনাশ দাশগুপ্ত — প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

তিনকড়ি বিশ্বাস — লক্ষ্মণের শক্তিশেল ; সীতার পাতাল প্রবেশ

ত্রৈলোক্যনাথ দাস দে — লক্ষ্মণ ভোজন

দীনেশচন্দ্র সেন — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য :
— রামায়ণী কথা ;
— বৃহৎ-বঙ্গ, ১ম ও ২য় খণ্ড
— পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা
বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত — কৃত্তিবাসী রামায়ণ

দীঘনিকায় ১ম খণ্ড — ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — কালিকা পুরাণম

দেবেন্দ্রনাথ সেন — ঊর্মিলা কাব্য

ধর্মদাস তপস্বী — রামলীলা

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ — মধুস্মৃতি

নগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারী — রামবিলাপ

নগেন্দ্রনাথ বসু — হরপ্রসাদ-সম্বর্ধন লেখমালা :
ঐ — বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ) ৩য় খণ্ড
নটবর চক্রবর্তী সম্পাদিত — ব্রজমোহন গ্রন্থাবলী
নবীন কালী দেবী — মন্দোদরীর রণসজ্জা
নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত — কৃত্তিবাসী রামায়ণ
নারায়ণ দেব তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত — পদ্মাপুরাণ,
নির্মলেন্দু ভৌমিক — বাংলা ছড়ার ভূমিকা
নীহার রঞ্জন রায় — বাঙ্গালীর ইতিহাস
নুলোপঞ্চানন — গোষ্ঠী কথা
পশুপতি চট্টোপাধ্যায় — শ্রীকৃষ্ণের শতনাম
পঞ্চানন মণ্ডল — পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড
পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত — বাল্মীকি রামায়ণম্
— অধ্যাত্ম রামায়ণম্ :
— অদ্ভুত রামায়ণম্
পিঙ্গলাচার্য — প্রাকৃত পৈঙ্গলম, ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী — যুগে যুগে ভারত
প্রবোধচন্দ্র সেন — বাংলার ইতিহাস সাধনা
— রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি
প্রফুল্ল চন্দ্র পাল — প্রাচীন কবিওয়ালার গান
প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত — মাইকেল রচনা সম্ভার
প্রাণশংকর ও কমলাশংকর ত্রিবেদী প্রণীত — ভট্টিকাব্যম্
প্রসন্ন কুমার শর্মা সম্পাদিত — মনুসংহিতা
প্রণব রঞ্জন ঘোষ - ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ
— শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য
— বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য :
বংকিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ — স্বাক্ষরতা প্রকাশন

বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পাণিকর সম্পাদিত — যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড — পঃ বঃ নিঃ দূরীকরণ সমিতি

বিজয় গুপ্ত — পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাশ গুপ্ত সম্পাদিত

বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — রাম বনবাস

বিজয় ঘোষ — বাংলার নবজাগৃতি

বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত — সারদামঙ্গল।

বিমলাচরণ মুখোপাধ্যায় — বাংলার গ্রাম্যছড়া

বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত — চণ্ডীদাসের পদাবলী

— গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ১ম-১০ম খণ্ড — উদ্বোধন কার্যালয়

বেণীমাধব চাকী — সীতা নির্বাসন

বৈদ্যনাথ শীল — বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর — চৈতন্যভাগবত, দেবসাহিত্য কুটীর

মতিলাল রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — রাবণ বধ গীতাভিনয়
সীতাহরণ

ভরতাগমন, ভূপেন্দ্র নারায়ন রায় সম্পাদিত — লক্ষ্মণ ভোজন

মধুসূদন জানা — নিমাই সন্ন্যাস

মন্মথ দত্ত সম্পাদিত — মার্কণ্ডেয় পুরাণম্

মনীন্দ্র মোহন বসু — বাংলা সাহিত্য

মনোমোহন বসু — মনোমোহন গীতাবলী

মানকুমারী বসু — কণকাঞ্জলি : কাব্যকুসুমাঞ্জলি

মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন — হারামণি

মোহিতলাল মজুমদার — কবি শ্রীমধুসূদন

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — স্কন্দপুরাণম্

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী — সীতা

যোগেশচন্দ্র বাগল — ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা

রঘুনন্দন গোস্বামী — শ্রীশ্রীরামরসায়ণ

রাজকৃষ্ণ রায় — রামায়ণ

রাজনারায়ণ বসু — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত — হালের গাথা সপ্তশতী

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় — বাংলা ও বাঙ্গালী

রাম শর্মা আচার্য — কূর্মপুরাণম, দেবীভাগবত

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় — প্রমীলা বিলাপ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম-১৫ দশ খঃ — পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস

লোচন দাস, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত — চৈতন্যমঙ্গল

শশধর রায় — রাঘব বিজয় কাব্য

শশিভূষণ দাশগুপ্ত — বাংলার নবযুগ

শংকরী প্রসাদ বসু — মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শিবরতন মিত্র — বাংলা প্রাচীম পুঁথির বিবরণ

শিবপ্রসাদ ভট্টচার্য — ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

শিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য — অজবিলাপ

শিশিরকুমার নিয়োগী সম্পাদিত, — বাল্মীকি রামায়ণ

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় — ঊনবিংশ শতকের গীতি কবিতা সংকলন

শ্রীম, খণ্ড — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

যতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অনূদিত	—	তুলসী রামায়ণ
সুকুমার সেন	—	রাম কথার প্রাক্‌কথা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খঃ পূর্বার্ধ—৩য় খণ্ড
সুকুমার সেন	—	মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙ্গালী,
	—	প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী
সুকুমার সেন সম্পাদিত	—	চণ্ডীমঙ্গল
সুখময় মুখোপাধ্যায়	—	কৃত্তিবাস পরিচয়, বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়
	—	বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল
	—	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	—	জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য'
	—	রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	রামোদ্বাহ
সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত	—	শ্রীমদভাগবত
সোমেন্দ্রনাথ সরকার	—	বাঙ্গালী জীবনে বিদ্যাসাগর
হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী	—	দশানন বধমহাকাব্য
হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম সম্ভার	—	বুক্‌স অ্যাণ্ড পাবলিকেশন
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত	—	বৃহদ্ধর্মপুরাণম্
হরিশচন্দ্র মিত্র	—	নির্বাসিতা সীতা
হরিপদ চক্রবর্তী	—	দাশরথী রায়ের পাঁচালী
হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ প্রণীত	—	মহাভারতম্
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	—	চণ্ডীদাস পদাবলী
হলায়ুধ মিশ্র, সুকুমার সেন সম্পাদিত।	—	সেক শুভোদয়া,

হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য	—	যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	—	রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ
হারাধন চট্টরাজ	—	উত্তর শ্রীরামরসায়ণ
হিমাংশু ভূষণ সরকার	—	দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য
ক্ষিতিমোহন সেন	—	হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা , ভারতের সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ
ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলি	—	প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংখ্যা	—	৪০, ৫২, ৫৭, ১৮৩, ১৯৬, ২৭০, ২৬৮, ৬৮৭, ১৫১৪, ১৯০৭, ২২৫১, ২২৬০, ২৭০১, ২৭০৬, ৩২৪৩, ৩৪৮১, ৩৯৬২, ৪৮৩১, ৫৯৬১
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংখ্যা	—	৫৩১, ৫৪৭, ৫৬৬, ১০৬১, ১৯৬১, ২৬২৩

পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা	—	১৪।১।৭৬, ১৭।১।৭৬, ১৪।২।৭৬
দেশ	—	মার্চ, ১৯৭৬
বঙ্গদর্শন	—	১২৮০, ১২৮১, ১২৮২
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	—	১৩০২, ১৩০৫, ১৩০৬, ১৩০৯, ১৩১৩, ১৩৮২
সৌরভ	—	২য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা
শ্রমণ	—	১৩৮০, ১৩৮১

A. A. Macdenell — A History of Sanskrit Literature.

A. D. Pusalkar — Studies in the Epics and puranas.

Ananda Koomarswami — Introduction to Indian Art.

Bijan Raj Chatterjee — Indian Influence in Cembodia

Biman Behary Majumdar — Krishna in History and Lagend

B. Rowland — The Art and Architecture of India

Dagobert D Runnes and Harry G. Schrickle — Encyclopedia of the Art.

David J. Mecuntchion — Mediaeval Temples of Bengal

Dinesh Chandra Sen — The Bengali Rāmāyana, Folk Literature in Bengal

E. Hopkins — Epic Mythology
The Creat Epic of India.

Elliot, History of India — Vol-V, Tarikhi Badauni

E. V. Havell — The History of Aryan Rule in India

Fausball Jataka — Vol. IV

F. F. Keay — History of Hindu Literature

F. Maxmuller — A History of Ancient Sanskrit Literature

Hemchandra Roy Choudhuri — Studies In Indian Antiquities

H. Zimmer — The Art of India, Asia

Ishwari Prasad — A Short History of Muslim Rule in India

J. N. Sarkar — History of Bengal, Voll-II

J.R.A.S. January, 1907 — The oldest Record of the Rāmāyana in a Chinese Buddhist writing.

Kamal Krishna Smriti Sastri, Ed — Danda Viveka of Vardhamnaa

Kanak Pal Barua — Early History of Kamarupa

K. V. Saundaraya — Indian Temple Style

K. T. Telang — Was Rāmāyana Copies from Homer

Max-Muller — A History of Ancient Sanskrit Literature

M. Winternitz — A History of Indian Literature

P. U. Kane — History of Dharma Sāstra

Ramesh Chandra Datta — Rāmāyana, The epic of Rama, Prince of India.
History of Civilization In Ancient India

R. G. Bhandarkar — Vaisnavism, Saivism and minor Religious Systems

Ramesh Chandra Datta — Early Hindu Civilization, B. C., 200-320 based on Sanskrit Literature

Ramesh Chandra Majumdar — Hindu Colonies in the far East
History of Bengal Vol. 1, 11

R. A. Dwivedi — Hindi Literature.

Raguvira, Eng Tra — Rāmāyana in China

Sarasi Kumar Swaraswati — A Survey of Indian Sculpture

Sajjad Husain Syed, Ed. Dacca — A descriptive catalogue of Bengali Manuscripts

Sibaram Murti — Indian Art,

S. C. De — Historicity of Rāmāyana and the Indo - Aryan Society in India and Ceylon

S. K. Chatterjee — The Rāmāyana its Character, Genesis, History, Expansion and Exodus a resume, The Cultural History of India

S. N. Ghoshal, Tr — Das Ramayana of H. Jacoby

S. P. Bahadur — Ramayan of Goswami Tulsidasa

Tod — Annals of Rajputana

Vidarbharaja Eng. Tr — Champa Rāmāyana

নির্ঘণ্ট